সংকলন

মৎস্য সপ্তাহ '১৭

২৫-৩১ জুলাই

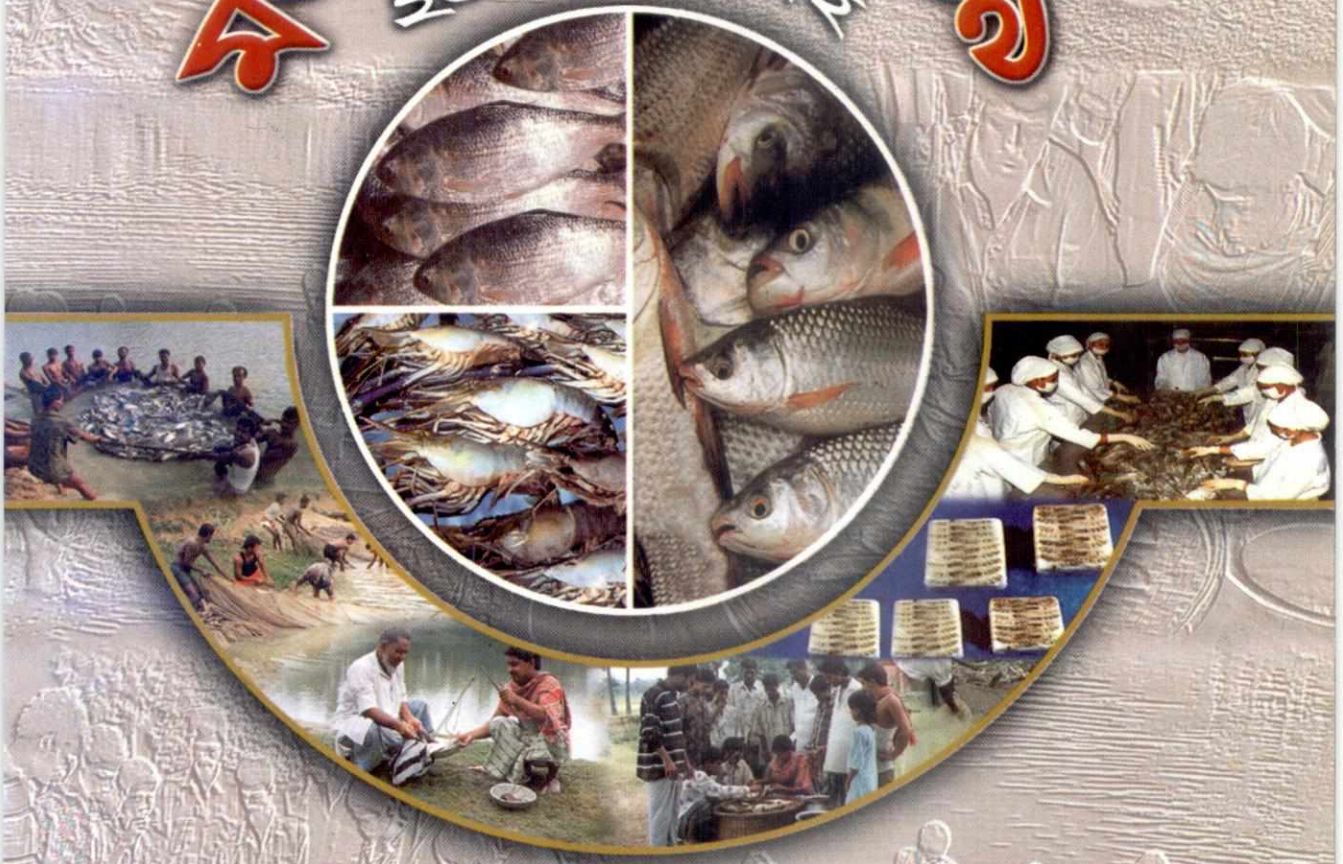

বেকারত্ব যেখানে
মাছ চাষ সেখানে

মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

মৎস্য সপ্তাহ '৯৯ সংকলন

২৫ - ৩১ জুলাই

মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য সপ্তাহ '৯৯ সংকলন

সম্পাদনা পরিষদ

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক	সভাপতি
জনাব মোকাম্মেল হোসেন উপ-পরিচালক	সদস্য
জনাব মমতাজ হোসেন মিয়া উপ-পরিচালক (মৎস্যচাষ)	সদস্য
জনাব মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ উপ-প্রধান	সদস্য
জনাব আব্দুল খালেক উপ-প্রধান	সদস্য
জনাব এস. এম. নাজমুল ইসলাম সহকারী পরিচালক	সদস্য
জনাব অর্জুন চন্দ্র চন্দ সহকারী প্রধান	সদস্য
জনাব নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ূন সহকারী পরিচালক	সদস্য
জনাব আমিনুল ইসলাম মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	সদস্য
জনাব এ. বি. এম. জাহিদ হাবিব গবেষণা কর্মকর্তা	সদস্য
জনাব মোঃ আতিকুর রহমান ভূঁইয়া তথ্য কর্মকর্তা (মৎস্য)	সদস্য
বেগম আনওয়ারী প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

প্রকাশনায়

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

প্রকাশকাল
২৫ জুলাই ১৯৯৯ খ্রিঃ

আর্থিক সহায়তা
বৃটিশ সরকারের ডি এফ আই ডি
এফ টি ই পি/ এন এফ ই পি

প্রচ্ছদ
ধারা এ্যাডভার্টাইজিং
ধানমন্ডি, ঢাকা

কম্পিউটার কম্পোজ
ছবীর প্রোডাক্টস
৩৬ পুরানা পল্টন, ঢাকা

প্রচার সংখ্যা
১৫,০০০
(সৌজন্যমূলক বিতরণের জন্য)

মুদ্রণে
নিউ সোনালী প্রিন্টার্স
২/১ তনুগঞ্জলেন, সুত্রাপুর, ঢাকা

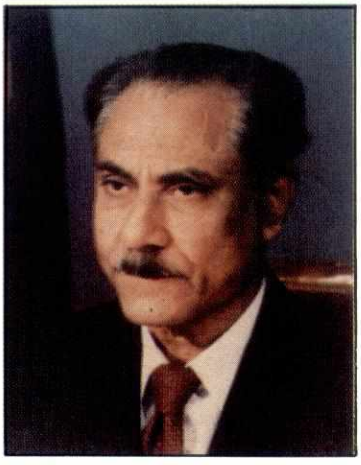

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

১০ শ্রাবণ ১৪০৬ বঃ
২৫ জুলাই ১৯৯৯ খ্রিঃ

বাণী

প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ, আত্ম-কর্মসংস্থান এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় সেক্টর। জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান উৎসাহব্যঞ্জক। দেশের জলাশয়গুলোতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ অতিরিক্ত মৎস্য ও মৎস্যজাত সামগ্রী রপ্তানী সম্ভব। মৎস্য সপ্তাহ '৯৯ এ লক্ষ্যে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

আমি মৎস্য সপ্তাহ '৯৯-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১০ শ্রাবণ ১৪০৬ বঃ
২৫ জুলাই ১৯৯৯ খ্রিঃ

প্রধানমন্ত্রী

বাণী

দেশের আপামর জনগণকে মৎস্য চাষে উদ্বুদ্ধ করে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা ও গণসংযোগের মাধ্যমে মৎস্য সপ্তাহ'৯৯ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

মৎস্য সম্পদ দেশের প্রাণিজ আমিষের অন্যতম প্রধান উৎস। এখাত দেশের বেকার ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান এবং আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতেও অবদান রেখে আসছে। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এ সম্পদের চাষ ,উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং আহরণ করতে হবে। তাহলেই দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়েও মৎস্য রপ্তানি করে এ খাত থেকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। ইতোমধ্যে আমাদের গৃহীত উন্নয়ন ও সংস্কার কর্মসূচীর মাধ্যমে এখাতের উন্নয়ন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মৎস্য খাতের কাঙ্খিত উন্নয়নের জন্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও এর যথোপযুক্ত প্রয়োগের পাশাপাশি প্রয়োজন উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। এজন্য প্রয়োজন ব্যাপক প্রচারণা, প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী। সরকারি উদ্যোগের সহায়ক পদক্ষেপ হিসেবে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোকেও এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে আত্মকর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে মৎস্য উৎপাদন কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে আমাদের আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। জাতির জনকের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে মৎস্য সেক্টর যথাযথ অবদান রাখতে পারবে বলে আমি আশাবাদী।

আমি মৎস্য সপ্তাহ'৯৯-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

১০ শ্রাবণ ১৪০৬ বঃ
২৫ জুলাই ১৯৯৯ খ্রিঃ

বাণী

মাটি, পানি এবং মানব সম্পদ-এ তিনটিই হচ্ছে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এ তিন সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহারের উপরেই নির্ভর করছে বাংলাদেশের ভবিষ্যত আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি।

অভ্যন্তরীণ এবং সামুদ্রিক জলাশয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ উৎপাদন ও উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট জনগনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ও কারিগরি সাহায্যে যদি প্রাপ্ত জলাশয়গুলো মৎস্য সম্পদ উৎপাদন ও উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা যায়, তবে উৎপাদিত মৎস্য দেশের চাহিদা মিটিয়েও বিদেশে রপ্তানি করে হাজার হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। সৃষ্টি হবে লক্ষ লক্ষ বেকার জনগোষ্ঠীর আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ। অর্জিত হবে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্ধারিত প্রায় ২০·৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদনের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা।

মৎস্যচাষী, মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্য শিল্পে বিনিয়োগকারী উদ্যোক্তা এবং সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও এনজিও প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত সার্বিক অংশগ্রহণের সাথে সাথে উন্নত চাষ পদ্ধতি, সংরক্ষণ ব্যবস্থা, বিপনন ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট জনগণের ইতিবাচক মনোভাব নিশ্চিত করা গেলে মৎস্য সম্পদ উৎপাদন ও উন্নয়নের সুযোগকে অবশ্যই সফল সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়া যাবে। এ জন্য প্রয়োজন ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি। আনুষ্ঠানিকভাবে মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন কার্যক্রম সে গণসচেতনতা সৃষ্টির একটি প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল। একই সাথে অংশীদারিত্বমূলক উৎপাদন ও বিপনন ব্যবস্থাপনা এবং মৎস্য চাষের কারিগরী দক্ষতা ও উৎকর্ষকতার ব্যাপক সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণকে একটি সামজিক আন্দোলনে পরিগণিত করারও এটি একটি বার্তাবাহক কার্যসূচী।

মৎস্য সপ্তাহ '৯৯ কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ, সাহায্য ও সহযোগিতা করে রূপালী বিপ্লবের এ সামাজিক আন্দোলনকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল স্তরের জনগণকে উদাত্ত আহবান জানাই এবং এ সপ্তাহের সর্বাঙ্গীন সার্থকতা কামনা করি। **বেকারত্ব যেখানে–মাছ চাষ সেখানে।**

(আ স ম আবদুর রব)

সচিব
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১০ শ্রাবণ ১৪০৬ বঃ
২৫ জুলাই ১৯৯৯ খ্রিঃ

বাণী

পদ্মা-যমুনা-মেঘনা বিধৌত বাংলাদেশ প্রকৃতি ও পরিবেশগতভাবে মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ। এদেশের নদী-নালা, হাওড়-বাওড়, খাল-বিল, পুকুর-দীঘিতে যেমন রয়েছে নানা প্রজাতির স্বাদু পানির মাছ তেমনি দেশের বিশাল সামুদ্রিক জলরাশিতে রয়েছে চিংড়ি-টুনা সহ নানা অর্থকরী মাছ। দেশের বিরাট জনগোষ্ঠীর আমিষ চাহিদা পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ মৎস্য খাত জাতীয় অর্থনীতিতে তাই অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এ খাত আগামী দিন গুলোতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

বেকার যুবশক্তি এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের মৎস্য উৎপাদনের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে **বেকারত্ব যেখানে মাছ চাষ সেখানে** এ শ্লোগান নিয়ে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় উদযাপন করতে যাচ্ছে মৎস্য সপ্তাহ-৯৯।

আমি মৎস্য সপ্তাহ-৯৯ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

আইয়ুব কাদরী

মুখবন্ধ

মাছে ভাতে বাঙ্গালী। মাছের সাথে রয়েছে আমাদের নাড়ীর টান। আমাদের খাদ্য তালিকায় প্রানিজ আমিষের প্রধান উৎসই হচ্ছে মাছ। মৎস্য সেক্টর এ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা নূতন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, বর্ধিত জনগোষ্ঠির পুষ্টির চাহিদা পূরণ, পরিবেশের উৎকর্ষতা সাধন এর পাশাপাশি বর্তমান সরকারের দারিদ্র বিমোচন কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এ সেক্টরের অব্যাহত অগ্রগতি ও প্রবৃদ্ধির গতিধারা সন্তোষজনক বিধায় বিশাল জনগোষ্ঠির সম্পৃক্ততায় এর ভবিষ্যৎ কর্মকান্ডের ব্যাপক সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে। আমাদের দেশের মৎস্য সম্পদের বিস্তৃত উৎস, মাটি, পানি, আবহাওয়া ও প্রতিবেশ মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও এর অব্যাহত প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে অর্থবহ করে তুলেছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সম্পদের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের জন্য বর্তমান সরকার সব রকম সুযোগ সুবিধা প্রদান করে যাচ্ছেন। মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব এবং এর উন্নয়ন তরান্বিত করার লক্ষ্যে জনগণের সম্পৃক্তি একান্তভাবে আবশ্যক। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উৎকর্ষতা সাধনের জন্য, মৎস্য সেক্টরের সুষম উন্নয়ন তথা আধুনিক মৎস্য চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের মাধ্যমে জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, অব্যাহত প্রবৃদ্ধি অর্জন ইত্যাদি বিষয়ে জনগনকে সচেতন করে মৎস্য সংক্রান্ত কর্মকান্ডকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপদানের লক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও সারা দেশে মৎস্য সপ্তাহ '৯৯ উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে।

মৎস্য সপ্তাহের গুরুত্ব দেশবাসীর নিকট উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচীর সাথে মৎস্য বিষয়ক প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ বিশেষ সংকলনটি প্রকাশ করে সৌজন্যমূলক বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যাদের উদ্দেশ্যে এ আয়োজন, তাদের উপকারে এলে এর প্রকাশনা স্বার্থক হবে বলে আশা করি।

মৎস্য সপ্তাহ '৯৯ সংকলন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পাদনা পরিষদের সদস্য বৃন্দ সহ মৎস্য সেক্টরের যে সকল কর্মী নিরলস শ্রম দিয়ে এ সেক্টরের উন্নয়নে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছেন তাঁদের সকলের জন্য রইল কৃতজ্ঞতা। বৃটিশ সরকারের ডি এফ আই ডি (DFID) আর্থিক সহায়তা প্রদান করায় সংকলনের সার্থক প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে। এ জন্য আমরা ঢাকাস্থ বৃটিশ হাইকমিশনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ আবদুল মতিন
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
ঢাকা।

১০ শ্রাবণ ১৪০৬ বঃ
২৫ জুলাই ১৯৯৯ খ্রিঃ

মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

মৎস্য সপ্তাহ '৯৯ সংকলন

সূচী

১. আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব ও উন্নয়ন সম্ভাবনা ❑ ১
আ স ম আবদুর রব

২. জলমহাল ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কৌশল ❑ ৫
মোঃ আবদুল মতিন

৩. মৎস্য গবেষণা, উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ঃ সমন্বিত প্রয়াস ❑ ১০
ডঃ এম. এ. মজিদ

৪. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য বাজারজাতকরণে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ❑ ১৩
গোলাম মুর্তাজা

৫. মৎস্য সেক্টরের গুরুত্ব ও উন্নয়ন সম্ভাবনা ❑ ১৬
মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ ও মোঃ রফিকুল ইসলাম

৬. হ্যাচারীতে উৎপাদিত কার্পজাতীয় মাছের পোনার মান নিয়ন্ত্রণ ❑ ২১
এস. এন. চৌধুরী

৭. মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে থানা পর্যায়ে সম্প্রসারণ সেবার প্রভাব ❑ ২৬
মোঃ নজরুল ইসলাম ও মোঃ মনিরুজ্জামান

৮. উন্নত পদ্ধতিতে আঁতুড় পুকুর ব্যবস্থাপনা ❑ ৩১
কৃষিবিদ বেগম আনওয়ারী ও কৃষিবিদ মোঃ আবুল হাশেম (সুমন)

৯ বাংলাদেশে মুক্তা চাষ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা ❑ ৩৫
ডঃ সুশান্ত কুমার পাল

১০. মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় রোগ প্রতিরোধ ❑ ৩৮
কৃষিবিদ মোঃ আমিনুল ইসলাম

১১. মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে বায়োটেকনোলজির ভূমিকা ❑ ৪১
প্রফেসর ডঃ মোঃ সাইফুদ্দিন শাহ

১২. বেকার সমস্যা সমাধানে মাছ চাষ ❑ ৪৬
কৃষিবিদ মোঃ মাহমুদুল হক

১৩. স্থায়ীত্বশীল প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ দক্ষতার উন্নয়ন ❑ ৪৮
কৃষিবিদ হুমায়ুন কবির, এলান ব্রুক্স ও ফেরদৌস পারভীন

১৪. মৎস্য সম্প্রসারণে জিও-এনজিও সহযোগীতা ❑ ৫৫
কৃষিবিদ মোঃ আব্দুস সাত্তার

১৫. বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষের সমস্যা ও সম্ভাবনা ❑ ৬০
মোঃ মাসুদুর রহমান

১৬. চিংড়ি চাষ উন্নয়নে নার্সারি ব্যবস্থাপনা ❑ ৬৬
কৃষিবিদ মোঃ রেজাউল করিম

১৭. বাংলাদেশে চিংড়ি পোনার প্রাপ্যতা ও সংরক্ষণ ❑ ৬৯
কৃষিবিদ মোঃ শহীদুল ইসলাম ও ডঃ সালেহ উদ্দিন আহম্মেদ

১৮. অপরিকল্পিত বাগদা চিংড়ি চাষ ও পোনা আহরণ ঃ
উপকূলীয় পরিবেশ ও জীববৈচিত্রের উপর এর প্রভাব ❑ ৭২
ডঃ এম. এ. হোসেন

১৯. খাঁচায় তেলাপিয়া ও পাংগাসের লাভজনক চাষ ❑ ৭৬
জিয়াউল হক, জাকির হোসেন, আলমগীর রহমান,
শ্যামল কান্তি বর্মন ও নাসিম আহমেদ আলীম

২০. সমাজভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনা ❑ ৭৯
মোঃ আবদুর রহমান ও কৃষিবিদ প্রহলাদ চন্দ্র দে

২১. মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ❑ ৮৩
আনোয়ার হোসেন সিকদার

২২. মৎস্য পণ্যের মান বজায়ে পরিচ্ছন্নতা ও জীবাণুমুক্ত করণের ভূমিকা ❑ ৮৫
মোঃ রফিকুল ইসলাম

২৩. ঢাকা শহরের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের বর্তমান অবস্থা ও উন্নয়ন সম্ভাবনা ❑ ৯১
বাকার আহমেদ

২৪. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ধারাবাহিক জরীপ ও গবেষণার গুরুত্ব ৯৩
মোহাম্মদ আলী আজম খান

২৫. বাংলাদেশের মৎস্য বিষয়ক তথ্যাদি ❑ ৯৬
রাখাল চন্দ্র কংশ বনিক ও নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ূন

২৬. প্রয়োজনীয় টেলিফোন নাম্বার ❑ ১০৫

২৭. মৎস্য সপ্তাহ '৯৯ কর্মসূচী ❑ ১০৯

২৮. মৎস্য সপ্তাহ '৯৯ পুরস্কার ❑ ১১০

আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব ও উন্নয়ন সম্ভাবনা

আ স ম আবদুর রব
মন্ত্রী
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রনালয়

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব ও উন্নয়ন সম্ভাবনার কথা বলতে গেলে দেশের সামগ্রিক জলসম্পদের কথা, মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের কথা, মৎস্য উৎপাদনের নিকট অতীত ও বর্তমানের কথা, প্রাকৃতিক, কৃত্রিম ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সৃষ্ট সমস্যার কথা এসে পড়ে। আমি বিজ্ঞানী নই কিন্ত বিজ্ঞান তথা মৎস্য বিজ্ঞান সব না হলেও কিছু বুঝি, আমি মৎস্য বিশেষজ্ঞ নই কিন্তু সাধারণ মৎস্যচাষী হিসাবে মাছ চাষ সমন্ধে সাধারণ নিয়ম কানুন গুলো বুঝি। আমি রাজনৈতিক, রাজনীতি করি এবং আমার রাজনীতি এদেশের মানুষকে নিয়ে, আমার এদেশকে নিয়ে, এ সমাজকে নিয়ে। শ্রমজীবি, পেশাজীবি, মৎস্যজীবি, মেহনতি মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং নুন্যতম সুযোগ সুবিধা নিয়ে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা বিধানই হচ্ছে আমার রাজনৈতিক দর্শন। তাঁদের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সামাজিক স্বার্থ সংরক্ষণ নিশ্চিত করার সংগ্রামই আমার রাজনৈতিক সংগ্রাম। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণের পর আমি একটু চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলাম, কিন্ত আজ চার মাসের অভিজ্ঞতা থেকে নির্দ্বিধায় এটুকু বলতে পারি যে, নিঃসন্দেহে এই সেই সেক্টর যার সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ভূখা-নাঙা কর্মহীন মানুষকে কর্মের সংস্থান দেয়া যাবে, আর্থ-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে। দারিদ্রের কষাঘাত থেকে বহুলাংশে মুক্তি দেয়া যাবে। বুভূক্ষ মানুষের মুখে খাদ্য দেয়া যাবে, আমিষ সরববাহ নিশ্চিত করে তাদেরকে সুস্থ সবল মানুষ হিসাবে বাঁচার সুযোগ করে দেয়া যাবে এবং সর্বোপরি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা যাবে। দেশের অর্থনীতিকে প্রশংসনীয় ভাবে মজবুত করা যাবে। প্রচন্ড সম্ভাবনাময়ী এ মৎস্য সেক্টর। এ সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে জনমানুষের প্রাণিজ আমিষের নুন্যতম চাহিদা বহুলাংশে পূরন করে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে।

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে এ যাবৎ আমি মাঠ পর্যায়ে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে, মাঠ পর্যায়ে মৎস্য বিভাগীয় কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করে, নথি পত্র বই পুস্তক পড়ে এবং একজন ক্ষুদ্র মৎস্য খামারী হিসাবে যে সীমিত অভিজ্ঞতা এই মৎস্য সেক্টর সমন্ধে আমার হয়েছে তাঁর আলোকেই আমি আমার বক্তব্য উপস্থাপনের চেষ্টা করব। দেশের অভ্যন্তরীন মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৪৩.৪৫ লক্ষ হেক্টর। তার মধ্যে অভ্যন্তরীন মুক্ত জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৪০.৪৮ লক্ষ হেক্টর যা মোট জলাশয়ের প্রায় ৯৩%। বাকী মাত্র প্রায় ৩ লক্ষ হেক্টর বদ্ধ জলাশয় যা মোট জলাশয়ের মাত্র ৭%। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে ১৯৯৮ সালে মাছের মোট উৎপাদন ছিল মাত্র ৬.২০ লক্ষ মেঃ টন যা মোট উৎপাদনের ৪১.৫%। অন্যদিকে অভ্যন্তরীন বদ্ধ জলাশয়ের মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৫.৭০ লক্ষ মেঃ টন যা মোট মৎস্য উৎপাদনের ৩৮.২৬% মাত্র। এই ২টি চিত্র থেকে দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, বিগত দিন গুলোতে কিভাবে আমরা অভ্যন্তরীন

বি সি এস (মৎস্য) ক্যাডার কর্তৃক আয়োজিত "আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব ও উন্নয়ন সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে মাননীয় মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী জনাব আ স ম আবদুর রব-এর দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ সংক্ষিপ্ত আকারে মুদ্রণ করা হলো। (মৎস্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ, মে ১৫, ১৯৯৯)

মুক্ত জলাশয় তথা জলসম্পদকে অবহেলা করেছি, তার অপব্যবহার করেছি। এগুলো ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায় কি চরম উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছি। ব্যর্থও হয়েছি। এই উদাসীনতা-এই ব্যর্থতার দায়ভার কার ? এদেশের সহজ সরল মানুষ গুলোর ? না আপনাদের আমাদের তথা মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তরের ? কৈফিয়ত কে দেবে ? কে দেবে তার জবাব ? নিশ্চয় আমরা-যারা এদেশের হর্তাকর্তা ভাগ্য বিধাতা বলে নিজেদেরকে মনে করি এসবের জন্য কম বেশী আমরা সকলেই দায়ী। কৈফিয়ত ও জবাব দেয়ার সময় অতি দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। ১৯৯৮ সালে সমগ্র অভ্যন্তরীন জলাশয়ে মোট মাছের উৎপাদন ১১.৯৩ লক্ষ মেঃ টন এবং সামগ্রীক মাছের উৎপাদন (আহরণ) প্রায় ৩ লক্ষ মেঃ টন। অথচ কেবল যদি বদ্ধ জলাশয় অর্থাৎ পুকুর, দিঘী, বিল, বাওড় এবং উপকূলীয় চিংড়ি চাষ এলাকার মোট ৩ লক্ষ হেঃ জলাশয় যথাপোযুক্ত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় ও প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ব্যবহার করা যেতো তবে সহজেই হেক্টর প্রতি ৪.৫ থেকে ৫ টন মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন করে কেবল এই বদ্ধ জলাশয় থেকেই বৎসরে প্রায় ১৪ থেকে ১৫ লক্ষ মেঃ টন মাছ ও চিংড়ি পাওয়া যেত। এটা কি খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার ? আমার তো তা মনে হয় না। কষ্ট সাধ্য হলেও অসাধ্য নহে।

আমরা জানি জিডিপিতে মৎস্য সেক্টরের অবদান ৫%, মোট কৃষি উৎপাদনের ১৬.৮%, মোট রপ্তানী আয়ের ১০%। ১৯৮৫ সালের মোট মৎস্য উৎপাদন ৭.৭৪ লক্ষ মেঃ টন থেকে বেড়ে ১৯৯৮ সালে তা প্রায় ১৫ লক্ষ মেঃ টনে দাড়িয়েছে। এটা অবশ্যই সকলের ঐকান্তিক চেষ্টা এবং আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতার ফলে সংশ্লিষ্ট জনগণের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফল। এ জন্য আপনারা অবশ্যই ধন্যবাদ পাবার দাবীদার। কিন্তু এতে কি আপনারা তৃপ্ত ? এতে কি আপনারা সার্থক ? এতে কি আপনাদের আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন যথেষ্ঠ হয়েছে ? আমি বলব অবশ্যই না। সফলতার তৃপ্তির সাথে সাথে ব্যর্থতার ব্যথায়ও আমাদের ব্যথিত হওয়া উচিত। অবাক লাগে-এত সম্ভাবনাময়ী এই মৎস্য সেক্টর অথচ ১৯৮৫-১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৬-১৯৯৭ পর্যন্ত ১২ বৎসরে এ সেক্টরে প্রকল্প সাহায্যসহ মোট অর্থ বরাদ্দ ৯৩৩.৮৭ কোটি টাকা। কি দূর্ভাগ্য, আপনারা ব্যয় করতে পেরেছেন মাত্র ৫৫২.৭১ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৫৯% মাত্র। ৩৮১ কোটি টাকা অব্যয়িত ছিল। তা হলে সরকার কিংবা দাতা গোষ্ঠি এ সেক্টরের জন্য কেন বেশী অর্থ বরাদ্ধ করবে ? অথচ আমরা সবাই জানি টাকা না হলে উন্নয়ন হয় না।

জাতীয় উন্নয়নে মৎস্য ও পশুসম্পদ সেক্টরের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের ভবিষ্যৎ ক্রান্তিকালে এ সেক্টরই দিতে পারে দেশ ও জনগণকে তুলনামূলক সহজ ভাবে খাদ্য, অর্থ, কর্মসংস্থান ও আর্থিক স্বচ্ছলতার নিশ্চয়তা দিতে। সুস্থ সবল সুঠাম বুদ্ধিদীপ্ত মেধাবী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উপহার দেয়ার পিছনে এ সেক্টর অমূল্য অবদান রাখতে পারে। কারণ খাদ্য তালিকায় মানুষের জন্য প্রাণিজ আমিষের বিকল্প আর দ্বিতীয়টি নেই। এই প্রাণিজ আমিষ বলতে গেলে জীবন রক্ষাকারী খাদ্য, আর এর সিংহ ভাগ সরবরাহ করছে এ সেক্টর। মৎস্য জীবী, শ্রমজীবী, পেশাজীবী এবং সর্বোপরি অবহেলিত মানুষের কল্যান ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং সমাজে তাদের প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচন্ড সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে এ সেক্টরে। সুতরাং এ সেক্টরের গুরুত্ব অপরিসীম। মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ ভাগ মানুষ তাদের জীবিকার জন্য এ সেক্টরের উপর নির্ভরশীল। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এই মৎস্য সেক্টর ৩য় স্থান দখল করে আছে এবং ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে এ সেক্টর। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র রক্ষার পিছনেও রয়েছে এ সেক্টরের অপরিসীম অবদান। সনাতন পেশায়, আবেগ, অনুভূতি, হ্যারিটেজ সংরক্ষণ এবং বাংগালী জাতীয়তাবোধের জীবন্ত দর্শনও রয়েছে এ সেক্টরের। কিন্তু দূর্ভাগ্য, যে হারে-যে গতিতে এ সেক্টরের অগ্রগতি ও উন্নয়ন হওয়া উচিৎ ছিল তা হয়নি। এই জন্য কেবলমাত্র আপনাদেরকে এককভাবে দায়ী করবো না তবে ব্যর্থতার জন্য দায়-দায়িত্ব এড়ানোর সুযোগও আপনাদের নেই।

বিংশ শতাব্দির প্রেক্ষাপটে দেশ ও জনগণের প্রত্যাশার আলোকে মৎস্য সেক্টরকে ঢেলে সাজাতে হবে। এ জন্য এখন আমি কতিপয় কর্মসূচী তুলে ধরছি।

(১) দেশের সকল পুকুর, দিঘী, বাওড় ও উপকূলীয়

চিংড়ি চাষ এলাকাসহ সকল জলাশয়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রার মাছ উৎপাদন ও জলজ সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্রের ক্ষেত্রে সহনশীল টেকসই আধুনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনগণ তথা মৎস্যচাষীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে আধা-নিবিড় হতে ধাপে ধাপে নিবিড় সমন্বিত মৎস্যচাষ কার্যক্রম হাতে নিতে হবে এবং একর প্রতি জলার বার্ষিক উৎপাদন দুই থেকে আড়াই টনে উন্নীত করার কর্মসূচী ও তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

(২) দলভিত্তিক প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মৎস্যচাষের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। এব্যাপারে গ্রহণযোগ্য মডেল প্রস্তুতের দায়িত্ব পালনের জন্য অধিদপ্তরের এক বা একাধিক উপযুক্ত কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি দল গঠন করে অনতিবিলম্বে তার কাজ শুরু করতে হবে।

(৩) অভ্যন্তরীন মুক্ত জলাশয়ের জন্য জৈবিক ব্যবস্থাপনার আওতায় উৎপাদন ভিত্তিক ও সংরক্ষণমূলক মৎস্য উৎপাদন ও আহরণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করে সংশ্লিষ্ট জনগণের দল ভিত্তিক প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পরিবেশ ও প্রতিবেশের অনুকূল ও সহনশীল অবস্থার প্রেক্ষিতে ধাপে ধাপে খাঁচায় মাছ চাষ ও পেনে মাছ চাষের ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনে চীন, ফিলিপিনস্, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড এবং ভারত ইত্যাদি দেশের অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি অনুসরণ করা যেতে পারে। অধিদপ্তরে কর্মরত এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও উচ্চ শিক্ষিত কর্মকর্তাগণকে চিহ্নিত করে এধরনের কর্মসূচী প্রণয়নের দায়িত্ব তাঁদের হাতে ন্যাস্ত করতে হবে। জীববৈচিত্র রক্ষা, বংশ বৃদ্ধি, অভয়াশ্রম, কৃত্রিম পোনা মজুত এবং সহনশীল মৎস্য আহরণ ইত্যাদি সমন্বিত কর্মকৌশল এসকল জলাশয়ের ক্ষেত্রে অবলম্বন ও প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) হাওর ও বিলের ক্ষেত্রে সমাজ ভিত্তিক মৎস্যচাষ ও মৎস্য আহরণ কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট জনগণের দলভিত্তিক প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের মাধ্যমে জলাশয় ব্যবস্থাপনা, মৎস্য উৎপাদন ও আহরণের দায় দায়িত্ব নিতে হবে। এ সকল জলাশয়েও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে খাচায় মাছ চাষ ও পেনে মাছ চাষের প্রযুক্তি কাজে লাগানো যেতে পারে।

(৫) প্লাবন ভূমিতে মৎস্যচাষ, মাছের বংশ বিস্তার, মৎস্য সংরক্ষণ ইত্যাদির উপর ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। সম্পূর্ণ গণভিত্তিক এ কার্যক্রমের জন্য বাস্তব সম্মত চাহিদা মাফিক লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প প্রণয়নের কাজ হাতে নিতে হবে। এক্ষেত্রে পেনে মাছ চাষ প্রযুক্তি কে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তোলার জন্য ব্যাপক মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

(৬) ধান ক্ষেতে মাছের চাষ প্রযুক্তি অত্যন্ত সম্ভাবনাময়ী একটি প্রযুক্তি। আমাদের দেশে এ কার্যক্রম নতুন হলেও চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে এই প্রযুক্তি বহু পুরাতন। ধান ক্ষেতে মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জাতীয়ভাবে প্রকল্প প্রণয়নের কাজ হাতে নিতে হবে। ধানের সাথে মাছ এবং ধানের পরে মাছ-এই উভয় প্রকারের প্রযুক্তির মাধ্যমে ধান ক্ষেতে মাছের চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে আত্মকর্মসংস্থান, দলভিত্তিক মৎস্যচাষ এবং স্বঅর্থায়নে সমাজ ভিত্তিক অংশিদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনা কৌশলকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। পেনে মাছ চাষ প্রযুক্তিও এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(৭) মৎস্য অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে অবশ্যই ঢেলে সাজিয়ে জোরদার করতে হবে। সংশ্লিষ্ট জনগণের কাছে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনার এবং নব উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বার্তা পৌছে দেয়ার একমাত্র এবং অদ্বিতীয় মাধ্যমই হচ্ছে সম্প্রসারণ কার্যক্রম। বর্তমানে দূর্বলতম এই সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে কি ভাবে সংশ্লিষ্ট জনগণ তথা মৎস্যচাষীদের চাহিদা উপযোগী করা যায় তার জন্য যত দ্রুত সম্ভব সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

(৮) সাফল্যের জন্য পুরস্কার ব্যর্থতার জন্য শাস্তি এই নীতির কঠোর বাস্তবায়ন করে অধিদপ্তরের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হতে মাঠ পর্যায়ের সর্বনিম্ন কর্মকর্তা কর্মচারীর তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত

করতে হবে। মৎস্য অধিদপ্তরের বিশেষ করে মৎস্য ভবনে যাবতীয় অন্তর্দ্বন্ধ বন্ধ করে কাজের কাঙ্খিত গতি লাভের জন্য জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কাজের সুষ্ঠু, সুন্দর ও স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। ভবনের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে একই পরিবারের সদস্য রূপে গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিয়ে দলীয় কর্মস্পৃহার উন্মেষ ঘটাতে হবে। অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘসূত্রিতার মনোভাব পরিহার করে উৎপাদন ও উন্নতির কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কর্মসম্পাদনে নতূন গতির সঞ্চার করতে হবে।

আপনাদের মেধা ও অভিজ্ঞতাকে যদি সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমে পরিচালনা করা যায় তবে ভবিষ্যতে মৎস্য সেক্টরের জন্য উন্নয়নমূলক যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা যাবে বলে আমার বিশ্বাস। দেশ ও জাতির কাঙিখত লক্ষ্যমাত্রার মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিৎ করে এ সেক্টরের আমূল পরিবর্তন আনা যাবে।

আমি জানি চাকুরীগত আপনাদের নানাবিধ সমস্যা রয়েছে, ১৮-১৯ বৎসর ধরে থানাতে চাকুরী করছেন- পদোন্নতি পাচ্ছেন না। চরম হতাশায় ভুগছেন। কর্মে স্পৃহা ও উদ্যম হারিয়ে ফেলছেন। অধিদপ্তরের কর্মকর্তা পর্যায়ের জনবল সংক্রান্ত বর্তমান জটিল সমস্যা সম্বন্ধে আমি অবগত আছি। আপনাদের চাকুরী সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান এবং সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমি আপনাদের ন্যায়সংগত দাবী আদায় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব। দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের মাধ্যমেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন সম্ভব।

মেহনতী মানুষের জয় হউক

জলমহাল ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কৌশল

মোঃ আবদুল মতিন, মহাপরিচালক
এম, এ, খালেক, ডেপুটি চীফ
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

বাংলাদেশে দীঘি-পুকুর, হাওর, বাঁওড়, বিল, নদ-নদী, খাল ও প্লাবন ভূমি মিলিয়ে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের আয়তন ৪৩.৪৭ লক্ষ হেক্টর। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মধ্যে মুক্ত জলাশয় অর্থাৎ নদী, খাল-বিল, বাঁওরের আয়তন প্রায় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর। দেশে উৎপাদিত মাছের দুই-তৃতীয়াংশ আসতো মুক্ত জলাশয় থেকে। ১৯৮৪-৮৫ বছরে উৎপাদিত মাছের প্রায় ৬৩% অর্থাৎ ৭.৭৪ লক্ষ টন এসেছে মুক্ত জলাশয় থেকে। বিগত ১৯৯৬-৯৭ সালে মুক্ত জলাশয় থেকে আহরিত মাছের পরিমাণ বেড়ে ১৩.০৭ লক্ষ টনে দাড়ালেও বস্তুত পক্ষে মুক্ত জলাশয় থেকে উৎপাদিত মাছের পরিমাণ অভ্যন্তরীণ মিঠা পানিতে উৎপাদিত মোট পরিমাণের ৬৩% থেকে কমে ৪৬% এ নেমে আসে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন কমে আশার প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে সময়োপচিত বৃষ্টি না হওয়া, নদ-নদী ভরাট ও গতিপথ পরিবর্তিত হওয়ায় মাছের প্রজনন ক্ষেত্র সঙ্কুচিত বা বিনষ্ট হয়ে যাওয়া, মাছের প্রাকৃতিক আবাস স্থল এবং বিচরণ ক্ষেত্র সঙ্কুচিত বা বিনষ্ট হয়ে যাওয়া। উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদণ কমে যাওয়ার জন্য মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কারণ ও সমানভাবে দায়ী। এগুলো হলো- বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের বাধঁ নির্মাণ, নিবির্চারে ডিমওয়ালা মাছ ও পোনা মাছ নিধন, ইজারা প্রথার মাধ্যমে রাজস্বভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় মাছের বংশ বিনাশ, কৃষি ফসলে সেচের জন্য মাছের আবাসস্থল থেকে মাত্রাতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন, পরিবেশের ক্ষতি সাধন করা, কৃষি জমিতে অতিরিক্ত মাত্রায় কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার, শিল্প কারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থের মাধ্যমে পানি দুষণ, জন বিষ্ফোরণের ফলে জীবিকা নির্বাহের জন্য মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য আহরণ, মাছের বংশ ধ্বংশকারী বিভিন্ন জাল ব্যবহার এবং সর্বোপরি মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব ইত্যাদি এসব কারণে মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন ক্রমহ্রাসকে তরান্বিত করেছে। মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন কমে আসলেও সরকারি জলমহাল হতে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েছে। ইজারা গ্রহীতাগণ তাই সর্বশক্তি দিয়ে মৎস্য আহরনের মাধ্যমে জলমহাল মৎস্যশুন্য করছে। মুক্ত জলাশয়ে মাছের বংশ রক্ষা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে জলমহালের জৈবিক ব্যবস্থাপনা তথা নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য হয়ে দাড়িয়েছে।

ভৌত আকার, অবস্থান, বানিজ্যিক বৈশিষ্ট, ব্যাপ্তি এবং ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে জলমহালকে ৫ টি শ্রেণীতে বিন্যাস করা যায়। (ক) পুকুর-দীঘি, (খ) বিল (গ) বাঁওড় (ঘ) হাওর ও মরা নদী এবং (ঙ) প্রবাহমান নদী। এ ৫ শ্রেণীর সরকারি জলমহালের সংখ্যা প্রায় ১০,১১৯ টি। ভুমি মন্ত্রণালয় এ সকল জলমহালের স্বতাধিকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী । এ সকল জলমহাল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ১৯৮০ সালে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত হলেও ১৯৮৩ সালে তা প্রত্যাহার করে পুণরায় ভূমি মন্ত্রণালয়কে দেয়া হয় এবং চিরাচরিত প্রথানুযায়ী ভূমি মন্ত্রণালয় জেলা ও থানা পর্যায়ে তাদের প্রতিনিধি জেলা প্রশাসক ও থানা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে কেবলমাত্র রাজস্বভিত্তিক ব্যবস্থাপনার জন্য ইজারা বন্দোবস্ত প্রথা পুণরায় চালু করে। এ সকল ছোট বড় জলমহাল হতে কেবলমাত্র মৎস্য আহরণই করা হয়েছে। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে কোন প্রকার জৈবিক ব্যবস্থাপনা না থাকায় নির্বিচারে মৎস্য আহরণের ফলে ক্রমশ জলমহালগুলো মৎস্য শুন্য হয়ে পড়েছে। জাল ও জলা তার নীতির ওপর নির্ভর করে যে সকল মৎস্যজীবিদের জীবিকা নির্বাহ হতো রাজস্বভিত্তিক ইজারা ব্যবস্থার সুযোগে সৃষ্ট মধ্যস্বত্বভোগীদের নিষ্ঠুর আর্থিক নিষ্পেষণে সর্বশান্ত হয়ে পড়েছে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়; দ্রুত কমে যাচ্ছে

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলমহালের মৎস্য সম্পদ। মৎস্যজীবীদের অধিকার নিশ্চিত করে জৈবিক পরিচর্যার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি অর্থাৎ মুক্ত জলাশয়ের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষে ১৯৮৮ সালে নতুন জালমহল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়। রাজস্বভিত্তিক ইজরা প্রথার পরিবর্তে গ্রহণ করা হয় জালমহালের জৈবিক উৎপাদনমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাপনা।

নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা

নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল,

- ১৯৮৮সালের পর হতে পরবর্তী ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে জলমহাল ব্যবস্থাপনায় প্রচলিত ইজারা পদ্ধিতি ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত করা।
- প্রকৃতি মৎস্যজীবীদের জলমহালসমূহে সরাসরি মৎস্য আহরণের অধিকার প্রদান।
- মধ্যবত্বভোগী ইজারা বা মহাজনের কবল থেকে মৎস্যজীবীদের মুক্তকরণ।
- মৎস্য উৎপাদন, উন্নয়ন ও বংশ সংরক্ষণের জন্য জৈবিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।
- সহনশীল মৎস্য আহরণের ভিত্তিতে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করতঃ রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার জন্য প্রকৃত মৎস্যজীবীদের মাঝে অধিকার পত্র প্রদান করে নির্ধারিত ফি আদায় করা।

উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জলমহালে জৈবিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনার আলোকে ভূমি মন্ত্রণালয় বাংলা ১৩৯৩ সালে ১০টি, ১৩৯৪ সালে ১৪০টি এবং ১৩৯৭ সালে ১৫০টি সর্বমোট ৩০০টি জলমহাল মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ন্যাস্ত করে। কর্মসূচী বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে মৎস্য অধিদপ্তর নতুন জলমহাল ব্যবস্থপনা নীতিমালার আলোকে ৩০০টি জলমহালের ব্যবস্থপনা কার্যক্রম চালু করে।

নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট জলমহালের তীরবর্তী ও পাশ্ববর্তী প্রকৃত মৎস্য জীবীদের তালিকা প্রণয়ন করে প্রথমে তা থানা জলমহাল ব্যবস্থপনা কমিটি এবং পরবর্তীতে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত করে ব্যবহৃত জাল ও মাছ ধরার যন্ত্রের প্রকার, ধরন এবং পরিধি বিবেচনা করে অধিকার পত্র প্রদান এবং ফি নির্ধারণ করে মৎসজীবীদের কে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে অধিকার পত্র প্রদান করা হয়। প্রকৃত মৎস্যজীবী চিহ্নিত করার জন্য বাংলাদেশ মৎস্যজীবী সমিতির থানা প্রতিনিধিগণ মূখ্য ভুমিকা গ্রহণ করে। মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা জলমহালের জৈবিক ব্যবস্থাপনা তদারকিসহ অধিকার পত্র প্রদান এবং ফি আদায়ে সাহায্য করে থাকেন।

মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের জনশক্তির স্বল্পতা, বাংলাদেশ মৎস্যজীবী সমিতির সাংগঠনিক দুর্বলতা, স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতার অভাব এবং সর্বোপরি বিভাগীয় লজিষ্টিক সার্পোটের স্বল্পতার দরুণ উল্লেখিত ৩০০টি জলমহালে নতুন জলমহালে ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। জৈবিক ব্যবস্থাপনায় জলমহালগুলোতে আহরিত মাছের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অতীতের তুলনায় বেশি হয়। পরীক্ষামূলকভাবে উল্লেখিত ৩০০টি জলমহালে নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা বাস্তবায়নের পর কতিপয় সমস্যা চিহ্নিত করা হয়। যেমন:

(ক) নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রার্থিত জলমহাল প্রাপ্তিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব জটিলতার জন্য অহেতুক বিলম্ব।

(খ) জেলা ও থানা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অমৎস্যজীবী প্রতিনিধির অন্তর্ভূক্তি।

(গ) বাংলাদেশ মৎস্যজীবী সমিতির সাংগঠনিক দূর্বলতা, দল ও উপদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, প্রকৃত মৎস্যজীবীদের তালিকায় অমৎস্যজীবীদের অন্তর্ভূক্তি।

(ঘ) সহনশীল মৎস্য আহরণের পরিবর্তে সর্বোচ্চ মৎস্য আহরণ ও জৈবিক ব্যবস্থাপনা নীতিমালার লংঘন।

(ঙ) প্রাকৃতিক কারণে নদ-নদী পলিতে ভরাট হয়ে গতি পরিবর্তন ও জলমহালের সীমানা-পরিধি পরিবর্তন এবং তার জন্য বিভিন্ন বিরোধ ও জটিলতার সৃষ্টি।

(চ) জৈবিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মৎস্যজীবীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব।

(ছ) মাছের উৎপাদন ও বংশ বিস্তার কল্পে রুইজাতীয় মাছের পোনা অবমুক্তি কর্মসূচী না থাকা।

(জ) মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত জল ও যন্ত্রপাতির ওপর বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ না থাকা ইত্যাদি।

উল্লেখিত চিহ্নিত সমস্যার আলোকে বর্তমান জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে আরো সময়োপযোগী, অধিক কার্যকর এবং চাহিদা মাফিক করে তোলা হয়েছে।

বর্তমান প্রস্তাবিত নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা

অতীতের জলমহাল ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতার আলোকে ও জলমহালের আকার, আকৃতি, প্রকৃতি, উৎপাদন ক্ষমতা এবং সহনশীল পর্যায়ে মৎস্য আহরণ ইত্যাদি বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে জলমহালগুলোতে ৩ ধরণের ব্যবস্থপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

উৎপাদন ভিত্তিক ইজারা ব্যবস্থাপনা।

সমাজ ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনা।

অভয়াশ্রম স্থাপনের মাধ্যমে মাছের প্রাকৃতিক বংশ বিস্তার ও সংরক্ষন ব্যবস্থাপনা।

উল্লেখিত তিন ধরনের ব্যবস্থাপনার আলোকে দেশের সকল জলমহাল গুলোকে শ্রেণীভূক্ত করে চিহ্নিত করা এবং জলমহালের চারিত্রিক বৈশিষ্টের ওপর ভিত্তি করে প্রযোজ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োগ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

উৎপাদনভিত্তিক ইজারা ব্যবস্থাপনায় গৃহীতব্য ও বাস্তবায়নযোগ্য কার্যক্রম গুলো নিম্নরূপ হতে পারেঃ

(ক) মুক্ত জলাশয়ের ক্ষেত্রে উৎপাদনভিত্তিক জৈব ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদনের সাথে সংগতি রেখে ইজারা তথা রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের ব্যবস্থা।

(খ) প্রত্যেক ইজারা গ্রহীতাকে ইজারা গ্রহণের পূর্বেই জলমহালের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও সহনশীল মৎস্য আহরণ সংক্রান্ত একটি উৎপাদন পরিকল্পনা দাখিলে বাধ্য করা। ইজারা প্রাপ্তির পর ইজারা গ্রহিতা কর্তৃক উৎপাদন পরিকল্পনা মোতাবেক জলমহলের সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। মৎস্য বিভাগীয় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্ভাব্য সকল প্রকার কারিগরি সাহায্যে ও প্রশিক্ষণসহ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকি করা।

গ) জলাশয়ের তীরবর্তী ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষী, মৎস্য সমবায় সমিতির সদস্য, মুক্তি যোদ্ধা, বেকার যুবক, যুব মহিলা, বিভিন্ন সমাজ কল্যাণ সংস্থা বা সংগঠন এবং মৎস্য চাষে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনগোষ্ঠিকে জলমহালের ইজারা প্রাপ্তিতে সরকারি বিধি মোতাবেক অগ্রাধিকার দেওয়া।

ঘ) কোন উপ-ইজারা ব্যবস্থা কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য করা যাবে না।

সমাজ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা

এ ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তর, এনজিও এবং ইজারা গ্রহীতা সুফলভোগী গোষ্ঠির সমন্বিত সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জলমহালের জৈবিক ব্যবস্থাপনা ও ইজারা মূল্য আদায় নিশ্চিত করা। জলমহলের সার্বিক জৈবিক ব্যবস্থাপনা, মৎস্য উৎপাদন ও সহনশীল মৎস্য আহরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং জলমহাল সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজ মৎস্য অধিদপ্তরের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করা।

অভয়াশ্রম স্থাপনের মাধ্যমে মৎস্যের প্রাকৃতিক বংশ বিস্তার ও সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাপনা

সব বিবেচনায় উত্তম জলাশয় চিহ্নিত করে মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন করা। নির্বাচিত বৃহদাকারের জলাশয়ের এক বা একাধিক অংশ চিহ্নিত করে মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন করা। এক থেকে তিন বৎসরের মধ্যে উক্ত স্থানে মৎস্য শিকার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা, যাতে করে মাছ প্রাকৃতিক উপায়ে ডিম ছেড়ে বংশ বিস্তার ঘটাতে পারে। প্রয়োজনে কৃত্রিমভাবে পোনা মাছ অবমুক্ত করে মাছের উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা করা। অভয়াশ্রম নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও তা অনুসরণ করা।

জলমহাল ইজারা পদ্ধতি

জৈবিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা মূল্য নির্ধারণে নিলাম কিংবা অক্শন পদ্ধতির পরিবর্তে জলমহালের প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা, সহনশীল মৎস্য আহরণের সর্বোচ্চ সীমা, মৎস্যের প্রাকৃতিক বংশ বিস্তারের সুযোগ, জীব বৈচিত্রের সংরক্ষণ, সংশ্লিষ্ট সুফল ভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়াদির আলোকে সরকার কর্তৃক গঠিত জেলা জলমহাল কমিটিতে সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের ইজারা নির্ধারণ করা। নীতিমালার আওতা বহির্ভূত কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি ইজারা

ডাকে যাতে অংশ গ্রহণ করতে না পারে তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

সরকারি রেকর্ডভূক্ত সকল জলমহাল ধাপে ধাপে ভুমি মন্ত্রণালয় হতে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত হওয়ার পর সকল জলমহাল প্রস্তাবিত নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালার আলোকে জৈবিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা। হস্তান্তরিত জলমহাল ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং উৎপাদন ও আয়ের প্রত্যক্ষ অংশিদারিত্বের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া। জৈবিক ব্যবস্থাপনায় সকল প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ত্রিপক্ষীয় যথা, ইজারা গ্রহীতা, সুফলভোগী-গোষ্ঠি, মৎস্য অধিদপ্তর এবং এনজিও প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে জলমহাল এবং মৎস্য সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও কাংখিত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনায় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

(ক) প্রত্যেক জলমহালের চারিত্রিক বৈশিষ্টের আলোকে পৃথক পৃথক উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে জৈবিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

খ) দেশীয় সনাতন প্রজাতির মাছের বংশ বিস্তার কল্পে বাঁওড় এবং বদ্ধ ও খোলা বিলে অনুরূপ অভয়াশ্রম স্থাপন করে মাছের বিশেষ করে শিং, মাগুর, কৈ,শোল, গজার,পাবদা, গোলাশা, বোয়াল, চিতল-সহ অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রজাতির মাছের প্রাকৃতিক বংশ বিস্তারের ব্যবস্থা করা।

গ) সংস্কারযোগ্য জলমহালের তালিকা প্রণয়ন পূর্বক ধাপে ধাপে সংস্কার যোগ্য জলমহালে স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রকল্প, খাদ্য সহায়তায় মৎস্য সেক্টরে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদি এ ক্ষেত্রে সর্বাদিক অগ্রাধিকার দেয়া। সংস্কারকৃত জলমহাল জৈবিক উৎপাদনমূলক ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা।

মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্প জাতীয় মাছের পোনা মজুদ কার্যক্রম

চিহ্নিত জলমহালের সার্বিক গুণাবলির কথা বিবেচনা করে মাছের কৃত্রিম মজুদ তথা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্পজাতীয় মাছের পোনা মজুদের ব্যবস্থা করা। পোনা মাছ মজুদের ক্ষেত্রে প্রবাহমান জলমহালের তুলনায় বাওড় ও বিলকে অগ্রাধিকার দেয়া, মজুদকৃত পোনা মাছ সংরক্ষণ ও মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় সরকার, এনজিও প্রতিষ্ঠান এবং অনুমোদিত সুফলভোগীদের প্রত্যক্ষ অংশিদারিত্ব বা সম্মিলিত ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োগ করা।

মৎস্য সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা

নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালার আওতাধীন সকল জলমহালে মৎস্য সংরক্ষণ আইন অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রয়োগ করা । আপামর জনসাধারণকে মৎস্য আইন মেনে চলার জন্য উদ্বুদ্ধকরণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে জাতীয় প্রচার মাধ্যম ও ব্যাপক সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম হাতে নেয়া এবং মৎস্য উৎপদন ও সংরক্ষণ কার্যক্রমকে ধাপে ধাপে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার সর্বাধিক প্রচেষ্টা চালানো।

পেন ও খাচায় মাছ চাষ কার্যক্রম

চিহ্নিত এবং নির্বাচিত জলমহালে পেন ও খাচায় মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষা ও প্রদর্শণীমূলক ভাবে ক্ষুদ্র পরিসরে পেন ও খাঁচায় মাছ চাষ কার্যক্রম হাতে নেয়া এবং প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে স্বল্প মেয়াদী এবং মেয়াদী ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়া।

ফিসপাস নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা

আগামী দিন গুলোতে সকল প্রকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, মহাসড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে মাছের প্রাকৃতিক আবাসস্থল যাতে বিনষ্ট হয়ে সকল প্রজাতির মাছের স্বাভাবিক প্রজনন ও বংশ বিস্তার কার্যক্রম কোন হুমকির সম্মুখিন না হয় সে জন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ফিস পাস নির্মাণের ব্যবস্থা করা। জৈবিক পরিবেশ এবং পরিবেশের ওপর যাতে কোন প্রকার বিরূপ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া না পড়ে তার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া।

ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা

নিষিদ্ধ সময়ে যাতে মৎস্য সংরক্ষণ আইন ভংগ করে জাটকা ও ডিমওয়ালা ইলিশ ধরতে না পারে তার জন্য বিশেষ ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপনসহ জাটকা মাছ নিধন নিয়ন্ত্রণ, মৎস্য সংরক্ষণ আইন অত্যন্ত কঠোর ও কার্যকরিভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে এজন্য

ইলিশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের লক্ষে এবং বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা।

উপসংহার

প্রস্তাবিত নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা একটি ব্যাপক ও গুরুদায়িত্ব পূর্ণ কার্যক্রম। ইতোমধ্যে প্রণীত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক যদি ভূমি মন্ত্রণালয় হতে চাহিদা মোতাবেক যথা সময়ে জলমহাল মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করা হয় এবং ঐ সকল জলমহালে বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায়, তবে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ২০.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ কেবলমাত্র মুক্ত জলাশয় হতেই উৎপাদন ও আহরণ করা সম্ভব। উল্লেখ্য, লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে হলে মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের জনবল বাড়ানো প্রয়োজন। এ সেক্টরে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা নেয়া, জলমহাল ব্যবস্থাপনায় সরকার, এনজিও প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী গোষ্ঠির সার্বিক প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ এবং অংশিদারীত্বমূলক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্য সংরক্ষণের ব্যাপারে ব্যাপক ভিত্তিক বিরামহীন প্রচার ও প্রদর্শণীর মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। মৎস্য চাষ, মৎস্য উৎপাদন এবং মৎস্য সংরক্ষণকে একটি সামাজিক আন্দোলন রূপে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন স্বল্প মেয়াদী ও চাহিদা উপযোগী উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাস্তবভিত্তিক লাগসই উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন এবং একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক, আর্থিক এবং সর্বোপরি জনসেবামূখী মানসিক প্রস্তুতি।

মৎস্য গবেষণা, উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ঃ সমন্বিত প্রয়াস

ডঃ এম. এ. মজিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট

খাদ্য, পুষ্টি ও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে এ খাতের উন্নয়নে সরকারী গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের ব্যাপ্তিও ঘটছে যথেষ্ট। তবে সম্পদ ও দক্ষ জনশক্তির সীমাবদ্ধতা সবসময়ই অন্তরায় হিসাবে থেকে গেছে। তাছাড়া বিদ্যমান সামাজিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাও কম অন্তরায় নয়। তা সত্বেও মৎস্য উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে সরকারের বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণের কারণে।

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ইতিমধ্যে বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করেছে। এ লক্ষ্যে বোর্ড অব গভর্ণরস এর পুনঃগঠনসহ ইনষ্টিটিউটে প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা হয়েছে। বিভিন্নমূখী অগ্রাধিকার-ভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইনষ্টিটিউট ইতিমধ্যে উন্নত মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ২২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এসব প্রযুক্তিসমূহের মধ্যে রুই জাতীয় মাছ ও পাংগাস মাছের পোনা উৎপাদন, বারোমাসি পুকুরে রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ, মৌসুমী পুকুরে রাজ পুটি ও তেলাপিয়ার চাষ, ধান ক্ষেতে মাছের সমন্বিত চাষ, সমন্বিত হাঁস-মুরগী/মাছের চাষ, হাইব্রীড মাগুরের পোনা উৎপাদন ও চাষ, পাংগাশের চাষ, গৃহাঙ্গন হ্যাচারীতে গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব প্রযুক্তি কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলে ১৯৯০-৯১ সালে মৎস্য চাষের উৎপাদন ৩ লক্ষ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৫ লক্ষ টনে উন্নীত হয়েছে। এ উৎপাদন আরো বৃদ্ধি করার অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে। নিম্নের আলোচনায় এ সুযোগের বিষয়ে জানা যাবে।

উচ্চ ফলনশীল মাছের জাত উন্নয়ন

এটা আজ সর্বজন স্বীকৃত যে, পোনা উৎপাদনের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন মৎস্যচাষ সম্প্রসারণে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে। দেশে বর্তমানে শতাধিক সরকারী হ্যাচারীর বাইরে প্রায় ৬/৭ শত মৎস্য প্রজনন হ্যাচারী রয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে ব্যক্তিমালিকানাধীন হ্যাচারীতে ব্রুডমাছ প্রতিপালনে অব্যবস্থাপনা, প্রজননক্ষম মাছ বাছাইয়ে অসচেতনা, অপরিকল্পিত সংকরায়ন ও অন্তঃ প্রজননজনিত সমস্যার কারণে হ্যাচারীতে নিম্নমানের পোনা উৎপাদিত হচ্ছে। এতে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাওয়ায় হ্যাচারী উৎপাদিত পোনা বড় হয় না-এমন ধারণাও সৃষ্টি হয়েছে। এ সংকট নিরসনে ইনষ্টিটিউট প্রাকৃতিক উৎস বা বন্যজাত সংগ্রহ করে নির্বাচিত প্রজনন ও জেনেটিক গবেষণার মাধ্যমে উন্নতজাত উদ্ভাবন করে ময়মনসিংহস্থ স্বাদু পানি কেন্দ্র ও চাঁদপুরস্থ নদীকেন্দ্রে ব্রুড ব্যাংক স্থাপন করেছে। মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত দেশের লীড সেন্টার হিসাবে এসব ব্রুড ব্যাংক থেকে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের রুই, কাতলা, মৃগেল, মিররকাপ, কমনকাপ, পাংগাশ, মহাশোল, রাজপুটি, গিফট তেলাপিয়া ইত্যাদি উচ্চ ফলনশীল ব্রুডজাত সরবরাহ করা হয়।

জেনেটিকস্ গবেষণার (জিন বিন্যাস ও কৌলিতাত্বিক ভিন্নতা) মাধ্যমে উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল জাতের রুই, কাতলা, রাজপুটি, গিফট তেলাপিয়ার উৎপাদনশীলতা ৩০-৫০% বেশী। অতএব, উন্নত মান ও উন্নত জাতের পোনার ব্যবহার মৎস্য উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি করতে পারে।

প্রাকৃতিক জীব বৈচিত্র

বাংলাদেশ মৎস্য সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলেও পরিবেশের বিবর্তন, জলাশয়ের সংকোচন ও মানব সৃষ্ট নানাবিধ সমস্যার কারণে অনেক প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হতে চলেছে। ফলে সামগ্রিক প্রাকৃতিক উৎপাদন ব্যবস্থায় এর দারুন নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এ অবস্থা নিঃসন্দেহে দেশের মৎস্য সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে এক বিরাট বিপর্যয়। এ বিপর্যয় কাটিয়ে উঠার জন্য বিপন্ন প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে

প্রয়োজনীয় গবেষণা কাযক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ইতিমধ্যে পাবদা, গুলশা, মহাশোল, কৈ, শিং, মাগুর, শোল, গনিয়া ও বাটা মাছের কৃত্রিম প্রজনন এর মাধ্যমে পোনা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

ছোট ছোট মৎস্য প্রজাতি উৎপাদন

একথা সত্যি যে, অনাদিকাল থেকে পুঁটি, মলা, চেলা, চাঁন্দা, চাপিলা, মেনি, কাকিলা, গুতুম দাড়কিনা, বাইম ইত্যাদি নানা জাতীয় ছোট ছোট মাছ দেশের গরীব মানুষের পুষ্টির যোগান দিয়ে আসছিল। যে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে এসব মাছ আজ বিলুপ্তির পথে। সম্প্রতি এসব মাছের সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিমূলক গবেষণার আহবান জানিয়ে পত্রপত্রিকায় যথেষ্ট খবর প্রকাশিত হচ্ছে। মূলতঃ এ ছোট ছোট মাছগুলো খাল-বিল, নদী-নালা ও প্লাবন ভূমিতে জন্মে থাকে। কিন্তু উদ্বেগের, বিষয় এসব মাছের আবাস্থল আজ কি হারে অবক্ষয় হচ্ছে, তা কারো অজানা নয়। অপরিকল্পিত সমন্বয়বিহীন উন্নয়ন ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এর মূলে দায়ী। তাই পরিবেশের বিশুদ্ধতা বজায় রেখে ছোট মাছের বংশ বিস্তারে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিই হবে এর উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম ব্যবস্থা। ছোট মাছের কৃত্রিম পোনা উৎপাদন ও চাষের প্রসারতা বাণিজ্যিক অর্থে সুকঠিন হয়ে দাড়াবে। কেননা যে প্রযুক্তি ব্যবহারে বড় মাছের চাষ করা হয় তা ছোট মাছ চাষের জন্য অনুকূলতো নয়ই বরং অনেকাংশে প্রতিকূলই বলা চলে। এ কারণে পরিবেশ সংরক্ষণ ও অভয়াশ্রম সৃষ্টির মাধ্যমে ছোট মাছের উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করাই হবে সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ড। এব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে হবে সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসাবে। সরকারী সংরক্ষণ প্রচেষ্টার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে সকল সমাজিক সম্প্রদায়কে। তবেই প্রাকৃতিক পরিবেশে ছোট মাছের উৎপাদন ও বংশ বিস্তারের পূর্ববত প্রাযুয্যাবস্থা ফিরে আসবে। নিশ্চিত হবে গরীব জনসাধারণের পুষ্টি সরবরাহের ব্যবস্থা।

বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ। কিন্তু জনসংখ্যা বিপুল। এই ছোট ভূখন্ড হতে বিপুল জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণ করা গতানুগতিক চাষাবাদ পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সমন্বিত চাষ ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন। এ দেশে ধানের জমির পরিমাণ ১০.৮ মিলিয়ন হেক্টর। এর মধ্যে ৮.৩ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে বর্ষা মৌসুমে ৪-৫ মাস পানি থাকে যেখানে ধানের সাথে মাছের সমন্বিত চাষের ব্যাপক সুযোগ বিদ্যমান। বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট সমন্বিত মাছ ও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর আওতায় ধান ক্ষেতে মাছ চাষ, পুকুরে মাছ চাষ ও সমন্বিত কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এতে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় এবং উৎপাদন মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে সামগ্রিক কৃষি উৎপাদন হয়ে উঠে অধিক লাভজনক।

সমন্বিত মৎস্য ও চিংড়ি চাষ

ইনষ্টিটিউট ১৯৮৬-৮৭ সাল থেকে ধান ক্ষেতে মাছ ও গলদা চিংড়ি চাষের গবেষণা শুরু করে। একই সময়ে শুরু হয় হাঁস ও মুরগীর সাথে সমন্বিত মাছ চাষ। উক্ত সমন্বিত মৎস্য চাষ কার্যক্রমে সফলতা লাভের পর ১৯৮৮-৮৯ ও ৮৯-৯০ সালে Incorporation of Fisheries Component in to the Farming System of Bangladesh শীর্ষক একটি কর্মসূচীর আওতায় সরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান - যেমন বারি, বিজেআরআই ও বেসরকারী সংস্থার (ব্র্যাক, প্রশিকা, বাঁচতে শেখা, জাগরণী চক্র এবং টিএমএসএস) মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে এর উপযোগিতা যাচাই ও প্রমিতকরণ করা হয়। বিএআরসি এ কার্যক্রমের সমন্বয় করে। মাঠ পর্যায়ে এ কর্মসূচী ব্যাপক সাফল্য লাভ করায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় সমগ্র দেশে ধানক্ষেতে মাছ চাষ প্রযুক্তির ব্যাপক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি জাতীয় সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অত্র ইনষ্টিটিউট পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ পদক্ষেপের আওতায় ১৯৯৫ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রস্তাবিত ধানক্ষেতে মাছ চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ে আরেকটি ফলোআপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু লিড মন্ত্রণালয় নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতায় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন হয় নাই। ফলশ্রুতিতে সম্ভাবনাময় এই প্রযুক্তির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেনি। অথচ দেশে ধান চাষের আওতাভূক্ত ১০% জমিতে মাছের চাষ করা গেলে অন্ততঃ ২-৩ লক্ষ টন অতিরিক্ত মাছের উৎপাদন হতে পারে।

১৯৯৩-৯৫ মেয়াদে Integrated Fisheries Research প্রকল্পের আওতায় সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে ইনষ্টিটিউট উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বিভিন্ন পরিবেশগত অঞ্চলে প্রমিতকরণ করা হয়। এসব গবেষণায় স্বল্প ব্যয়ে পরিবেশ উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারে মৌসুমী পুকুরে প্রতি হেক্টরে ২-৪ টন এবং সাংবাৎসরিক পুকুরে ৪-৬ টন মাছ উৎপাদন হয়।

পরবর্তীতে ১৯৯৬-৯৭, ৯৭-৯৮ সালে সরকারি ও বেসরকারী সংস্থা এবং চাষীদের মাধ্যমে সমন্বিত ধান ক্ষেতে মাছ চাষ প্রযুক্তি জনপ্রিয় করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা

হয়। প্রধান প্রধান বেসরকারী সংস্থাগুলি হলো - প্রশিকা, বাঁচতে শেখা, জাগরণীচক্র, টিএমএসএস, বার্ড, কারিতাস, রাসডো, সেভ দি চিল্ডরেন্স, সিডা, বাখরাবাদ মিল্ক-ফিশ লিমিটেড, কনফিডেন্স, মাটি ও মানুষ ইত্যাদি; সরকারী সংস্থা হলো- মৎস্য অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্যদের মধ্যে কিছু মৎস্য চাষী। এ কার্যক্রমের আওতায় ১২০০ চাষীর প্লটে ধানক্ষেতে মাছ চাষ প্রযুক্তি প্রদর্শিত হয়, ২০০ সম্প্রসারণ কর্মী ও ১১০০ চাষীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং এবং ৫০টি চাষী সমাবেশ সম্পন্ন করা হয়। এ কার্যক্রমে ধানক্ষেতে মাছ চাষ প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সফল বলে প্রমাণিত হয়েছে। ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ১০-১৫%। ধানক্ষেতে পোঁকা মাকড়ের আক্রমন হ্রাস পেয়েছে। ক্ষেতে আগাছার নিয়ন্ত্রণ হয়েছে। তিন মাসে প্রতি হেক্টরে ২৫০-৩০০ কেজি মাছ উৎপাদিত হয়েছে। চাষীর আয় ৩০-৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে একজন চাষীর এক মৌসুমে ধান থেকে প্রতি হেক্টরে ৫০০০-৬০০০ টাকা এবং মাছ থেকে ৮০০০-১০০০০ টাকা আয় হয়েছে। অতএব, ধানক্ষেতে মাছের সমন্বিত চাষ প্রযুক্তির ব্যাপক সম্প্রসারণে চাষীর আয় বর্ধনের নিশ্চিত সুযোগ কাজে লাগানোর ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ।

১৯৯৭-৯৮ হতে ইনষ্টিটিউট আনুষ্ঠানিক ফার্মিং সিসটেম গবেষণা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। যশোহরে স্থাপন করা হয়েছে এই গবেষণা পরিচালনা কেন্দ্র। উক্ত কেন্দ্রের আওতায় ফরিদপুর, নোয়াখালি, সাভার, টাঙ্গাইল, জামালপুর, ঈশ্বরদি, সিরাজগঞ্জ, রংপুরসহ ১৫টি গবেষণা সাইটে সমন্বিত কৃষি ও মৎস্য চাষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় মাছের সাথে সহ ফসল হিসাবে ধান, হোমষ্টিড গার্ডেনিং তথা শাকসব্জী, পেঁপে, কচু বিভিন্ন জাতের শাক-সব্জী উৎপাদন, হাঁস-মুরগী পালন, গরু-ছাগল মোটাতাজাকরণ ইত্যাদি সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এতে বাড়ীর আঙ্গিনায় সকল পরা পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় এসেছে। ফলে কৃষকের মোট কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে পারিবারিক আয় ও পুষ্টি। ইনষ্টিটিউটের এ উদ্যোগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক ইঞ্চি জমি পতিত না রাখার আহবানের সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। এমনি সফল সমন্বিত কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণ অপরিহার্য। এজন্য দরকার মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট সহ অন্যান্য কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের সাথে মৎস্য ও কৃষি অধিদপ্তর-এ দু'টি মৌলিক সম্প্রসারণ সংস্থার কার্যকর সমন্বয়। যৌথ কর্মসূচী বাস্তবায়ন, কার্যকর সমন্বয়ের প্রকৃষ্ট পন্থা বলে মনে করি। অতএব, এলক্ষ্য অর্জনে মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের জরুরী উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

বর্তমানে কৃষি বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে চমৎকার সমন্বয় ও সহযোগিতা বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সামগ্রিক সমন্বয়ে বিশ্ব ব্যাংক সহায়তাপুষ্ট বাস্তবায়নাধীন কৃষি গবেষণা ব্যবস্থাপনা প্রকল্প এই সমন্বয়কে আরো জোরদার ও ফলপ্রসু করেছে। ১৯৮৯ সাল থেকে ব্রাক, প্রশিকাসহ দেশের অগ্রণী বেসরকারী সংস্থাগুলির সাথে মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউটের চমৎকার সমন্বয় বিদ্যমান রয়েছে। ইনষ্টিটিউট কর্তৃক গৃহীত মাঠ পর্যায়ের গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত সংস্থাগুলোর সাথে এ সমন্বয় গড়ে উঠেছে। বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচীর অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে নিয়মিত পর্যালোচনা সভা। এতে পরস্পরের প্রতি আস্থা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

শুধু অনুরূপ নয় আরো শক্তিশালী সমন্বয়ের প্রয়োজন সরকারী গবেষণা ও সম্প্রসারণ সংস্থাসমূহের মধ্যে। ফসল-কৃষিতে এ সমন্বয় আনুষ্ঠানিকভাবে গড়ে উঠলেও মৎস্যসহ অন্যান্য কৃষি উপখাতে ইহা অত্যন্ত দুর্বল। অথচ সংশ্লিষ্ট সকল মহলে একটি শক্তিশালী সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার তীব্র আকাংখার কথা অহরহ উচ্চারিত হচ্ছে। তবে কেন হচ্ছেনা, সমস্যা কোথায়-তা নিয়ে খুব চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে বলে মনে হয়না।

প্রথমতঃ আকাঙ্খার বাস্তবায়নের জন্য সদিচ্ছা ও উদ্যোগের প্রয়োজন। সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ব্যক্তিত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক দ্বন্দ পরিহার, সকলের আন্তরিক উদ্যোগকে সমর্থন এবং সহযোগিতার একান্ত মনোভাব গ্রহণ। অতঃপর যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে গৃহীত কর্মসূচী নিয়মিত পর্যালোচনা ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যা সমাধানে নিজে ভূমিকা গ্রহণ। মনে রাখা দরকার, বিরোধীতা, বিশেষ করে উচ্চ পর্যায়ের বিরোধীতা সমন্বয় সংগঠনে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে।

উপরোক্ত অবস্থার কথা মনে রেখে ইনষ্টিটিউট বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তর ও বেসরকারী সংস্থার সমন্বয়ে মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য দু'টি মাঠ গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করছে। একটি প্রকল্প বাস্তবায়নে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ও অন্যটিতে ইনষ্টিটিউট নিজেই অর্থায়ন করছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রকল্প দু'টি বাস্তবায়নকালে মৎস্য গবেষণা এবং মৎস্য সম্প্রসারণ সংস্থার মধ্যে কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় গড়ে উঠবে।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য বাজারজাতকরণে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

গোলাম মুর্তাজা
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বামউক) ১৯৬৪ সালে তদানিন্তন পূর্ব-পাকিস্তান অডিন্যান্স নং-৪ বলে ইষ্ট-পাকিস্তান ফিসারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার পর ১৯৭৩ সালের এ্যাক্ট নং ২২ দ্বারা উহা বাতিল করে "বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন" বিএফডিসি নামকরণ করা হয়। বামউক তার জন্মলগ্ন হতে মূলতঃ উন্নয়ন/সেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। তবে এ সকল কর্মকান্ডের পাশাপাশি কিছু কিছু আধা বাণিজ্যিক ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ড চালিয়ে এসেছে। বিগত ১৯৮৯ইং সাল হতে কর্পোরেশনকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনার লক্ষ্যে সেবা/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের পরিধি কমিয়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে জোরদার করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে কর্পোরেশন তার জন্মলগ্ন হতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে। বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরে ট্রলার ও দেশীয় যান্ত্রিক নৌকা দ্বারা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য শিকার প্রবর্তন, একাধিক জাল কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে মৎস্য শিকারের জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে জাল তৈরীর সূচনা, স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে মৎস্য অবতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মৎস্য বন্দর ও মৎস্য অবতরণ ঘাঁটি নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কাজে বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান সহ মৎস্য চূর্ণ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রমের সূচনা, ফিস প্রডাক্ট ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রমের মাধ্যমে বিএফডিসি মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ ও বিতরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছে।

আভ্যন্তরীণ বাজারজাতকরণ ঃ

আধুনিক মৎস্য অবতরণ ও বিপণন সুবিধাদির অবর্তমানে প্রায় ৩০% Post Harvest loss হয়ে থাকে। এ অবস্থার উন্নয়ন কল্পে কর্পোরেশন উপকূলীয় অঞ্চলে আধুনিক মৎস্য অবতরণ ও বিপণন কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে মাছের গুণগত মান সংরক্ষণ এবং জেলে ও মৎস্য ব্যবসায়ীকে ন্যায্য মূল্যে প্রাপ্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কক্সবাজার, খুলনা ও চট্টগ্রামে অবস্থিত তিনটি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৯৯৮-৯৯ সালে প্রায় ৭০০০ মেট্রিক টন সামুদ্রিক মাছ অবতরণ ও বিপণন করা হয়েছে। উল্লেখ্য ১৯৯৪ সালে জাপানী আর্থিক সহায়তায় ৫৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রামের মনোহরখালীতে একটি আধুনিক মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধাদি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। বরিশাল ও পাথরঘাটায় অবস্থিত অপর ২টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র পুরাদমে চালু হলে মৎস্য অবতরণ ও বাজারজাতকরণ কার্য পরিধি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। বিগত ১৯৯৮-৯৯ইং আর্থিক সালে বরিশাল কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৭০০০ হাজার টন ইলিশ মাছ প্রাইভেট পার্টি কর্তৃক অবতরণ ও প্যাকিং করে ভারতে রপ্তানী ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিতরণ করে আসছে।

আভ্যন্তরীণ মৎস্য বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কল্পে কক্সবাজার এবং পাথরঘাটা পাইকারী মৎস্য বাজার কেন্দ্র দুইটি প্রায় ৯.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ করার কাজ শেষ হওয়ার পথে। কর্পোরেশনের প্রতিটি অবতরণ কেন্দ্রে মৎস্য অবতরণের সুবিধাদিসহ বরফকল হিমাগার ও আড়ৎ ঘর রয়েছে। উক্ত পাঁচটি অবতরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম পুরাদমে চালু হলে বছরে প্রায় ৭৭০০০ টন মাছ (সামুদ্রিক মাছের ৩০%) আধুনিক

এবং স্বাস্থ্য সম্মত অবতরণের মাধ্যমে বিপণন করা সম্ভব হবে। উপরন্ত ১৯৯৮-৯৯ইং সালে কর্পোরেশন কাপ্তাই ও রাংগামাটি অবতরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কাপ্তাই হ্রদ হতে প্রায় ৪৭০০ টন মিঠা পানির মাছ অবতরণ ও বাজারজাতকরণ সম্ভব হয়েছে।

সামুদ্রিক মাছের জনপ্রিয়তা অর্জনে বিএফডিসি'র ভূমিকা অগ্রগন্য। বিগত ১৯৭২ইং সালে বঙ্গোপসাগরে ট্রলার দ্বারা মৎস্য আহরণের সূত্রপাত ঘটে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭২ সালে সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া সফর কালে রুশ সরকার ১০টি ট্রলারের একটি বহর উপহার হিসেবে প্রদান করেন। উক্ত ট্রলারগুলোর পরিচালনার ভার বিএফডিসি'র উপর ন্যাস্ত করা হয়। ট্রলার দ্বারা বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণে বিএফডিসি মূলতঃ পথ প্রদর্শক এর ভূমিকা রাখে। এতে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান উৎসাহিত বোধ করে যার ফলে বর্তমানে ৫৫টি গভীর সমুদ্রে মৎস্য ধরার ট্রলার মৎস্য আহরণে রত আছে। ফলশ্রুতিতে সামুদ্রিক মৎস্য ও চিংড়ি আহরণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন ৯০ হাজার টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ৩ লক্ষ টনে দাঁড়িয়েছে।

সামুদ্রিক মাছ মূলতঃ

উপকূলীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে বহুল পরিচিত এবং জনপ্রিয় থাকলেও দেশের অন্যান্য স্থানে ইহা ছিল অজানা, অচেনা এবং অপ্রিয়। ঢাকা মহানগরে এ অবস্থা ছিল প্রকট। বিএফডিসি এর ট্রলারের দ্বারা ধৃত সামুদ্রিক মাছ কর্পোরেশন কর্তৃক ঢাকা মহানগরের নিয়মিতভাবে স্বল্প মূল্যে ক্রেতা সাধারণের হাতে তুলে দিয়ে ঢাকা মহানগরসহ অন্যান্য স্থানে সামুদ্রিক মাছ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের সহায়তায় যশোর ও তার আশে পাশে এলাকায় অবস্থিত বিল বাওড় ও হাওড় হতে বিভিন্ন প্রজাতির মিঠা পানির মাছ ফিশভ্যান দ্বারা এনে ঢাকা শহরে কর্পোরেশন রিটেইল মার্কেটিং চ্যানেলের মাধ্যমে বিক্রয় করা হচ্ছে। এ সকল মাছ কর্পোরেশনের কাওরান বাজারস্থ ষ্টল সহ রিক্সা ভ্যান ও ঢাকা শহরের বিভিন্ন বিতানের মাধ্যমে মাছ বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে আসছে। কর্পোরেশন তার কক্সবাজারস্থ মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৯৬৬-৬৭ সাল হতে মৎস্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত একটি ছোট হেমার মিল দ্বারা সর্ব প্রথম মৎস্য চুর্ন উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ শুরু করে। একই সময় দেশীয় পদ্ধতিতে হাঙ্গরের যকৃতের তৈল উৎপাদন শুরু করে। পরবর্তীতে কক্সবাজারস্থ কারখানাটির সম্প্রসারণ করা হয় এবং চট্টগ্রাম ও মংলায় মৎস্য চুর্ন কারখানা স্থাপন করা হয়। এ তিনটি কারখানা হতে দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সরকারি/বেসরকারি মুরগী খামার এবং পশু খাদ্য উৎপাদনকারী কারখানাসহ মাছের খাদ্য তৈরীর জন্য বিপুল পরিমান মৎস্য চুর্ন সরবরাহ করেছে। মুরগীর খাবার, মাছের খাবার, পশু খাদ্য ইত্যাদিতে মৎস্য চুর্ন অতি প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য যে, হাঙ্গরের যকৃতের তৈল মুরগী, পশু খাদ্য ব্যতিত ট্যানারী ও সাবান ফ্যাক্টরীতে ব্যবহৃত হয়। কর্পোরেশন মৎস্য চূর্ণ উৎপাদন ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে যার ফলশ্রুতিতে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যক্তি মালিকানাধীন একাধিক মৎস্য চূর্ণ কারখানা গড়ে উঠেছে।

মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ উন্নয়ন ও রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণ

প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য মৎস্য/চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানা বিদ্যমান ছিল না। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন পক্ষে প্রদর্শক হিসেবে বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং স্বাস্থ্য সম্মতভাবে চিংড়ি ও মৎস্য প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্তে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা এবং ঢাকায় প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠা করে। বে-সরকারী রপ্তানীকারকগণ এই সমস্ত প্ল্যান্টের সুবিধাদি গ্রহণ করে এবং বর্তমানে ১২৩টি ফিস প্রসেসিং প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠা করে। এতে মৎস্য/চিংড়ি এবং মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানী উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৭২ইং সনে এই খাতে অর্জিত ৩.০০ কোটি টাকা হতে আয় বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬-৯৭ সনে প্রায় ১৫০০.০০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। কর্পোরেশনের মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাগুলি প্রচলিত আন্তর্জাতিক মান সম্মত না হওয়ায় বর্তমানে রপ্তানীর জন্য চিংড়ি ও মাছ প্রক্রিয়াকরণ করতে সক্ষম নয়। এগুলির বর্তমানে মানোন্নয়নের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

তবে অভ্যন্তরীণ বাজারজাতকরণের জন্য প্রক্রিয়াকরণ অব্যাহত আছে। কর্পোরেশনের চিংড়ি ট্রলার সমূহ গভীর সমুদ্র থেকে চিংড়ি আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণ অব্যাহত রেখেছে। বিগত এক যুগেরও বেশী সময় প্রতি

বছর গড়ে ৫০/৬০ টন হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানী করে আসছে। কর্পোরেশন ১৯৯৮-৯৯ইং সালে প্রায় ৫৫.০০ টন হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানী করেছে।

ফিস প্রডাক্ট উদ্ভাবন ও পরীক্ষা মূলক বাজারজাতকরণ

ছোট ছোট প্রজাতির অনেক সামুদ্রিক মাছ ট্রলার বহর কর্তৃক শিকার করা সত্ত্বেও বাজার মূল্য কম থাকার কারণে মৎস্য বন্দরে অবতরণ না করে সমুদ্রেই ফেলে দেয়া হয়ে থাকে। ফলে সমুদ্রে মৎস্য ক্ষেত্র সমূহ বিনষ্ট হয় এবং দেশবাসী অতি প্রয়োজনীয় আমিষ খাদ্য (প্রোটিন) থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। এ অবস্থার উন্নয়ন কল্পে কর্পোরেশ জাতি সংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থার সহযোগিতায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের আওতায় একটি পরীক্ষা মূলক প্রডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপন করে। এ কেন্দ্রে জাপানী বিশেষজ্ঞদের তদারকীতে ১৯৮৫ইং সনের শেষ দিকে সাফল্যজনকভাবে কিছু কিছু মৎস্যজাত খাদ্য যেমন- ফিস বার্গার, ফিস বল, ফিস ফিংগার ও ফিস কিমা ইত্যাদি উৎপাদন করা হয়।

মূল্য সংযোজিত মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন কর্মসূচীঃ

মালয়েশীয়ায় অবস্থিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থা ইনফোফিস এর বাংলাদেশের Country liason অফিস হিসাবে অত্র কর্পোরেশন কাজ করেছে। মূল্য সংযোজিত মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন কর্মসূচীর অংশ হিসাবে ইনফোফিশের সহযোগিতায় বাছাইকৃত ব্যক্তি মালিকানাধীন ৬টি প্রসেসিং প্ল্যান্টে ১৯৯৭-৯৮ হতে ট্রেনিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রদত্ত ট্রেনিংয়ের ফলে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি প্ল্যান্ট BUTTER FLY, BREADED, IQF, COOKED SHRIMP AND FISH SKEWER ইত্যাদি মৎস্যজাত খাদ্য উৎপাদন ও রপ্তানী শুরু করেছে।

উপসংহার ঃ

বর্তমানে মুক্তবাজার অর্থনীতির আওতায় এবং সরকারের বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে পৃষ্টপোষকতার ফলে দেশে আজ বে-সরকারী খাতে প্রসংশাজনকভাবে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের এ সাফল্যজনক উদ্যোগের সাথে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ও জড়িত থেকে যে সামান্য অবদান রেখেছে তার জন্য কর্পোরেশন গৌরবান্বিত বোধ করে। মৎস্য সেক্টরে সারা বিশ্ব জুড়ে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন অব্যাহত আছে। প্রাইভেট সেক্টরের পাশাপাশি মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন টেকনোলজি ট্রান্সফার বা প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশের মৎস্য সেক্টরকে উপযোগী করে গড়ে তোলার কাজে কর্পোরেশন নিরলশ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মৎস্য সেক্টরের গুরুত্ব ও উন্নয়ন সম্ভাবনা

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
মোঃ রফিকুল ইসলাম
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

বাংলাদেশ বিশাল জলসম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ। এদেশে রয়েছে প্রচুর নদী- নালা,খাল-বিল,হাওড়-বাওড়,পুকুর-দীঘি,ও উপকূলীয় জলাশয়।এ ছাড়া রয়েছে বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশি। এদেশের জলবায়ূ আবহাওয়া মাছ চাষের জন্য খুবই উপযোগী । বিনাশ্রমে আর সামান্য পুজিতে একসময় প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত কারণে মাছের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । ফলে পূর্বের ন্যায় মাছ এখন অতি সহজলভ্য নয় । আমাদের দেশের সকল জলাশয় সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হলে মাছের অভ্যন্তরীন চাহিদা মিটিয়েও বিদেশে রপ্তানী করা সম্ভব।

বাংলাদেশের প্রায় ১.২ কোটি জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য খাতের উপর নির্ভরশীল, যার মধ্যে ১২.০ লক্ষ লোক সার্বক্ষনিক ভাবে মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশের সকল জনগোষ্ঠির প্রানীজ আমিষের চাহিদার ৬০ ভাগ যোগান আসছে মাছ থেকে। এতদভিন্ন বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৬% ই আসে মৎস্য ও মৎস্যপন্য রপ্তানি থেকে । জাতীয় আয়ের প্রায় ৫% অবদান এই মৎস্য সেক্টরের এবং বিগত ৫ বৎসরে এ সেক্টরের আর্থিক গড় প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ৬%। আলোচ্য প্রবন্ধে এ সেক্টরের গুরুত্ব এবং সম্ভাবনা নিয়ে সংক্ষিপ্ত অলোচনা করা হলো।

জলাশয় ও মৎস্য উৎপাদন পরিসংখ্যান

মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৮৫-৮৬ মৎস্য সম্পদের উপর পরিচালিত জরীপের তথ্য এবং ১৯৯৬-৯৭ সালে মৎস্য আহরন হিসাব নিম্নরূপ ঃ -

উৎপাদনের উৎস	জলাশয়ের পরিমান	মোট উৎপাদন (মেট্রিক টন)	মোট উৎপাদনের শতকরা হার (%)
(ক) অভ্যন্তরীন মৎস্য			
১। মুক্ত জলাশয়	৪০৪৭৩১৬ হেঃ	৫৯৯৯০০	৪৬
২। বদ্ধ জলাশয়	২৯০,৩৪৭ হেঃ	৪৩২১৩৫	৩৩
(খ) সামুদ্রিক মৎস্য জলাশয়	১.৬৬ লক্ষ বঃ কিঃ	২৭৪৭০৪	২১
দেশের মোট মৎস্য উৎপাদন		১৩,০৬,৭৩৯	১০০

উপরে বর্নিত তথ্য থেকে জলাশয়ের আয়তন,উৎপাদন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য সেক্টরের গুরুত্ব সহজে অনুধাবন করা যায়। পরিকল্পিত উৎপাদনমুখী ব্যবস্থাপনা করা হলে এ সম্পদের ব্যপক উন্নয়ন সম্ভব। দেশের পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার সমাপ্তি বৎসরে (২০০১-২০০২) বার্ষিক উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ২০.৭৫ লক্ষ মেঃ টন নির্ধারন করা হয়েছে। এর ফলে মাথাপিছু মৎস্য প্রাপ্তির পরিমান দাড়াবে ৩৪.৪৩ গ্রাম। পঞ্চম পঞ্চ

বার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক অগ্রগতির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ,কর্মসংস্থান সৃষ্টি,খাদ্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিবেশ সংরক্ষণ সহ উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মতো অনগ্রসর এলাকা , পাবর্ত্য চট্রগ্রাম ও উপকুলীয় এলাকার উন্নয়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতদভিন্ন উক্ত পরিকল্পনায় স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প এবং বিভিন্ন কর্মসূচী প্রনয়ন এবং ইউনিয়ন,থানা ও জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে উহা বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। উপরোক্ত অবস্থার আলোকে জাতীয় মৎস্য নীতি ও পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য মাত্রার সহিত সামঞ্জস্য রেখে দেশের মৎস্য সম্পদের ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য সেক্টরের বিভিন্ন উপখাত ভিত্তিক উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা ও উন্নয়ন কৌশল বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

বদ্ধ জলাশয়

দেশে চাষ উপযোগী প্রায় ১৩ লক্ষ পুকুর দীঘি রয়েছে যার আয়তন ১.৪৭ লক্ষ হেক্টর এবং প্রায় ৬০০০ হেক্টর বাওড় রয়েছে।এতদভিন্ন সারা দেশে অসংখ্য মৌসুমী জলাশয় ,রাস্তা পার্শ্বস্থ ডোবা,জলাধার,বরোপিট, পাহাড়ী ক্রীক,জলাভূমি রয়েছে যার আয়তন প্রায় ৫.৭ লক্ষ হেক্টর। এ সমস্ত জলাশয় মাছ চাষের আওতায় আনা সম্ভব। বর্তমানে পুকুরে গড়ে হেক্টর প্রতি বৎসরে ১.৮ মেঃটন মাছ উৎপাদিত হচ্ছে যা বাড়িয়ে গড়ে ৩-৪ মেঃটন উন্নীত করা সম্ভব।

সমস্যা

* মৎস্য চাষীদের উপযুক্ত কারিগরী জ্ঞানের অভাবে লাগসই প্রযুক্তি ভিত্তিক মাছ চাষ না করা।
* চাষী পর্যায়ে গুনগত মানসম্মত বড় আকারের ও নির্দিষ্ট প্রজাতির পোনা প্রাপ্তির অনিশ্চিয়তা।
* পুকুর মালিকদের পুজি বিনিয়োগের অপারগতা ও সদ্দিচ্ছার অভাব।
* পুকুরের বহুমালিকানা ও জলাশয় প্রাপ্তির জটিলতা।

উন্নয়ন কৌশল

* সকল পুকুর দীঘি ও অন্যান্য বদ্ধ ও অধাবদ্ধ জলাশয়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিবিড়,আধা নিবিড়, উন্নত লাগসই প্রযুক্তিতে কার্প জাতীয় মাছ ও অন্যান্য নতুন নতুন প্রজাতির মাছ চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ ও ঢেলে সাজানো ।
* সকল পতিত/ সর্বোত্তম ভাবে ব্যবহার হয় না। এসকল জলাশয় মাছ চাষে আনার জন্য পুকুর উন্নয়ন আইন ১৯৩৯ প্রয়োগ নিশ্চিত করণ।
* স্থানীয় জনগনের সম্পৃক্ততায় অন্যান্য বদ্ধ জলাশয় যেমন এফ,সি,ডি,আই বরোপিট,রাস্তা/রেল লাইন পার্শ্বস্থ খাল ডোবা ও নিচু জলাভূমি ইত্যাদিতে মাছ চাষ কার্যক্রম গ্রহন। সমন্বিত মাছ চাষ যেমন ধান ক্ষেতে মাছ চাষ, গবাদিপশু ও হাঁসমুরগীর সাথে মাছ চাষ, ইত্যাদি কার্যক্রম বৃদ্ধি করণ।
* চাষী পর্যায়ে গুনগত সঠিক আকারের সকল প্রজাতির পোনা মাছ প্রাপ্তির নিশ্চয়তার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে নার্সারী স্থাপন ও হ্যাচারী সমূহে ইনব্রিড ও হাইব্রিড সমস্যার দূরীকরণার্থে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন।
* মাছচাষী /উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য মৎস্য ব্যাংক বা বানিজ্যিক ব্যাংকে পৃথক মৎস্য সেল খোলার ব্যবস্থা গ্রহন।
* গলদা চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ এর লক্ষ্যে হ্যাচারী ও নার্সারী স্থাপন সম্প্রসারিত করা।
* বেসরকারী উদ্যোগক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহন।

মুক্ত জলাশয়

বাংলাদেশে প্রায় ৪০.৪৭ লক্ষ হেঃ মুক্ত জলাশয় রয়েছে। এর মধ্যে নদী ও মোহনা অঞ্চল,সুন্দরবন অঞ্চল,বিল,কাপ্তাই হ্রদ ও প্লাবন ভূমি অর্ন্তভূক্ত। অতীতে এই মুক্ত জলাশয় থেকে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের ৭০-৭৫ ভাগ আহরন হতো। বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও ব্যবস্থাপনার অভাবে এর পরিমান ৫০ ভাগে দাড়িয়েছে। যেহেতু মুক্ত জলাশয়ই আমাদের মোট মৎস্য উৎপাদনের অর্ধেক এর বেশী যোগান দিয়ে থাকে সেহেতু মুক্ত জলাশয়ের উন্নয়নের দিকে আমাদের যথেষ্ট দৃষ্টি দিতে হবে। মুক্ত জলাশয়ের বিবিধ প্রতিবন্ধকতা দূরকরনের সঠিক ব্যবস্থা করনের মাধ্যমে এ সেক্টর থেকে আরো অনেক বেশী মাছ উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহন করা সম্ভব।

সমস্যা

* মাছের ভবিষ্যত বংশ বিস্তারের কথা না ভেবে

মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য আহরণ করা এবং জলাশয় থেকে সম্পুর্ন পানি নিষ্কাশন করে বিল ঝিল থেকে সকল মৎস্য আহরণ করা।

* অতিরিক্ত পলি জমে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ এর ফলে মৎস্য আবাস ভুমির সংকোচন।
* বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অপরিশোধিত বর্জ্য নিক্ষেপ, ফসলের জমিতে মাত্রাতিরিক্ত কীট নাশক ব্যবহার , মৎস্য কুলের প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি ও বংশ বৃদ্ধির উপর বিরুপ প্রভাব।
* প্রয়োজনীয় সুবিধাদির অভাবে মৎস্য সংরক্ষণ আইন কঠোর ভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া।

উন্নয়ন কৌশল

* সকল জলাশয় সমুহ ভূমি মন্ত্রণালয় হতে জৈবিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে মৎস্য বিভাগে হস্তান্তর করা।
* সংশ্লিষ্ট জনগণকে সম্পৃক্ত করে উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্ত করন প্রক্রিয়া জোড়দার করণ।
* মৎস্য আইন কঠোরভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করণ।
* পলিতে ভরাট হয়ে যাওয়া সকল জলাশয় পর্যায়ক্রমে পুনঃখনন ও সংস্কারের মাধ্যমে পূনরুদ্ধার ও পূনবার্সন করণ।
* ভবিষ্যতে যেখানে সেচ প্রকল্প, রাস্তা নির্মান করা হবে, সেখানে মৎস্য সম্পদের বিকল্প জলাধার সৃষ্টি,ফিসপাস নির্মাণ এবং ইতিমধ্যে নিমানকৃত সেচ প্রকল্প ,এলাকায় ফিসপাস ও মাছ চাষের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ।
* প্রজননক্ষম মাছ এবং পোনা মাছ চলাচলের পথ উম্মুক্ত রাখা এবং মুক্ত জলাশয়ে অভয়আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা।
* হিলসা ফিসারিজ রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য জৈব ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
* মৎস্য সংরক্ষণ আইন সংশোধন করে সময় উপযোগী করা।

উপকূলীয় অঞ্চল

বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চল অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং সমুদ্র তটরেখার বিস্তৃতি প্রায় ৭১০ কিঃমিঃ। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে মাছ চাষের তেমন বিস্তৃতি না থাকলেও অপরিকল্পিত ভাবে চিংড়ি চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। উপকূলীয় অঞ্চলে ১৯৮৪-৮৫ সালে ৬৪,২৪৬ হেক্টর চিংড়ি খামারের স্থলে ক্রমানয়ে বৃদ্ধি পেয়ে তা বর্তমানে ১৪১৩৫৩ হেক্টরে এ উন্নীত হয়েছে। আমাদের দেশে বর্তমানে হেক্টর প্রতি চিংড়ি উৎপাদনের হার ৩০০-৩৫০ কেজি। পৃথিবীর চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশ সমুহের তুলনায় এ উৎপাদন অনেক কম। তবে, এসকল চিংড়ি খামারের উপর প্রত্যক্ষ ভাবে প্রায় ৪ লক্ষ জনগোষ্ঠি সহজে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। ১৯৯৭-৯৮ সালে ১৮৬৩০ মেঃ টন চিংড়ি রপ্তানী করে বাংলাদেশে ১১৮১ কোটি টাকা আয় করেছে। উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভবনা রয়েছে। এতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ছাড়াও কর্মসংস্থান সৃষ্টির যথেষ্ট সুযোগ বিদ্যমান।

সমস্যা

* লাগসই প্রযুক্তি নির্ভর কারিগরী জ্ঞানের অভাবে অনুপোযুক্ত স্থানে ও অপরিকল্পিত উপায়ে চিংড়ি চাষ।
* অসামঞ্জস্যপূর্ন খামারের আয়তন ও অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার অভাব।
* উপযুক্ত সময়ে চিংড়ির পোনা (পি.এল) এর অপর্যাপ্ত সরবরাহ।
* জমির মালিকানা,চিংড়িচাষী ও কৃষিজ ফসল উৎপাদনকারীদের মধ্যে সংঘাত।
* চিংড়ির রোগ নির্ণয়ে অবকাঠামোগত (পরীক্ষাগার) সুবিধাদির অভাব।
* চিংড়ি খামারের বর্জ্য নিক্ষেপ ও পরিবেশ এর ক্ষতিসাধন।

উন্নয়ন কৌশল

* উপকুলীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন ও ভূমির শ্রেনী বিন্যাস করে স্থানীয় সুযোগ সুবিধা ও পরিবেশ সহনিয় লাগসই প্রযুক্তি ভিত্তিক চিংড়ি চাষ জোন নির্ধারণ ও চিংড়ি চাষের আলাদা নীতিমালা প্রণয়ন।
* পরিবেশ অনুকুল সম্ভাব্য স্থানে ক্রমান্বয়ে আধা

নিবিড় ও নিবিড় চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ।

* চিংড়ির পর মাছ বা চিংড়ির পর কৃষি ফসলের উৎপাদন আবর্তন বজায় রেখে রোগ প্রতিরোধ এবং পরিবেশ অনুকূল চিংড়ি চাষ প্রবর্তন।
* চিংড়ি চাষীদের সময়মত সুস্থ সবল পোনা (পি.এল)সুলভ মূল্যে সরবরাহের লক্ষ্যে চিংড়ি হ্যাচারী নির্মাণের জন্য ক্র্যাশ প্রোগ্রাম গ্রহন এবং চিংড়ি পোনার মৃত্যুহার হ্রাসের জন্য উন্নততর পরিবহণ ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি (বিমান ও অন্যান্য)।
* চিংড়ি খামারের পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ও অন্যান্য আনুষাংগিক অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ বা সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান।
* চিংড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চাষ ব্যবস্থাপনাগত যেকোন সেবা তাৎক্ষনিক পাওয়ার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা ও কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন লোকবল ন্যস্ত।
* চিংড়ির প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র ও নার্সারী এলাকা সংরক্ষণ এবং এর প্রজনন মৌসুমে ট্রলিং এর মাধ্যমে চিংড়ি আহরণ নিষিদ্ধ করণ।
* ম্যানগ্রুব বনাঞ্চল ধবংস বন্ধ এবং খামার /ঘের ও নদী তীরের মাঝে যে ভূমি রয়েছে তাতে ম্যানগ্রুব বনাঞ্চল সৃষ্টি।
* অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন মাছ (মুগীল, ভেটকী,মিল্কফিস, পাংগাস ইত্যাদি) মাছ চাষ সম্প্রসারন।
* চিংড়ি/ মাছ চাষ সহায়ক সকল সরঞ্জামাদি ও উপকরনাদি সহজলভ্য করণ ও প্রয়োজনে আমদানির ক্ষেত্রে কর রেয়াতের ব্যবস্থা গ্রহণ।

সামুদ্রিক মৎস্য

বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক এলাকার সামুদ্রিক জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ১,৪০,৯১৫ বর্গ কিলোমিটার। এছাড়া মোহনা অঞ্চল, সুন্দরবনে সংরক্ষিত জলাভূমি,বেজলাইন জলাভূমি ও আন্তঃ দেশীয় অঞ্চলের জলাভূমি সহ সর্বমোট প্রায় ২.৬৩ লক্ষ বর্গকিলোমিটার জলাশয় বিদ্যমান। বাংলাদেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের ২২-২৫ ভাগই আহরিত হয় সমুদ্র থেকে। এই বিশাল জলসম্পদের উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ বিদ্যমান। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আমাদের মৎস্য উৎপাদন বাড়াতে হবে।

সমস্যা

* সহনশীল পর্যায়ে মৎস্য আহরণের তথ্যের অভাব ও আহরন এলাকা নির্দিষ্ট করণ না করা।
* পেলাজিক মৎস্য সম্পদের পরিমাণ, নিরুপন না করা এবং আহরণের উদ্যোগ এর অভাব।
* অনিয়ন্ত্রিত ভাবে যান্ত্রিক নৌকার সাহায্যে মৎস্য আহরন।
* সামুদ্রিক মৎস্য আইন প্রয়োগে জটিলতা।

উন্নয়ন কৌশল

* সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের পরিমাণ,বিভিন্ন প্রজাতির মাছের আহরন পূনঃ নিরুপন এবং সহনশীল পর্যায়ে মাছ ধরার পরিমান নির্ণয়ের জন্য জরুরী ভিত্তিতে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ক্রাশ প্রোগ্রাম গ্রহন।
* বর্তমান মজুদ এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকার ফিশিং ট্রলার এবং যান্ত্রিক নৌকার পরিমাণ নির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহন।
* অনাহরিত পেলাজিক মৎস্য আহরণের ব্যবস্থা গ্রহন।
* উপযুক্ত স্থানে সামুদ্রিক মৎস্য অভয়াশ্রম (পার্ক) প্রতিষ্ঠা।
* সমুদ্র মোহনা বা সম্ভাব্য স্থানে সামুদ্রিক মাছ সহ অন্যান্য বানিজ্যিক গুরুত্ব সম্পন্ন সম্পদ (মুক্তা, ঝিনুক ইত্যাদি) চাষের ব্যবস্থা গ্রহন।
* সামুদ্রিক মৎস্য আইন কঠোর ভাবে বাস্তবায়ন।

মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে হিমায়িত মৎস্য, চিংড়ি এবং মৎস্য পণ্যের স্থান তৃতীয়।এখাতে ১৯৭২-৭৩ সালে রপ্তানী আয় ছিল ৩-৫ কোটি টাকা যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮-৯৯ সালের মে মাসে এসে দাঁড়িয়েছে ১২৩৮.৭১ কোটি টাকা । ইহা

একটি সম্ভাবনাময় খাত যার মাধ্যমে বাংলাদেশ আরো অধিক পরিমানে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে।

সমস্যা

* বাংলাদেশের মৎস্য প্রক্রিয়াজাত পণ্যের মান ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের দেশগুলোর স্বাস্থ্য সম্মত মান সম্পন্ন না হওয়ায় ১৯৯৭ সালে রপ্তানী নিষেধাজ্ঞা জারী ।
* মৎস্য /চিংড়িচাষী,আড়ৎদার, প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মালিক/শ্রমিকের মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কারিগরী জ্ঞানের অভাব।
* আড়ৎদার ,হিমায়িত কারখানা,চাষী এবং সরকারি পর্যায়ে অবকাঠামোগত সুবিধার অভাব।

উন্নয়ন কৌশল

* ই,ইউর চহিদানুযায়ী দেশের সকল মৎস্য প্রক্রিয়া করণ কারখানা নবরূপায়ন ও আধুনিকীকরণ করা এবং চাষ পদ্ধতি হতে প্রক্রিয়াকরণ কারখানা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে হ্যাসাপ (HACCP) পদ্ধতি সম্পুর্নভাবে বাস্তবায়ন।
* ইতিমধ্যে হ্যাসাপ পদ্ধতি অনুসরনের ফলে ২৭টি প্রক্রিয়াকরণ কারখানার উপর থেকে ই,ইউর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের মত অন্য সকল কারখানাগুলোকে একই রকম পদক্ষেপ গ্রহন করে রপ্তানী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পদক্ষেপ গ্রহণ।
* মৎস্য মান নিয়ন্ত্রন পরীক্ষাগার গুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ পুর্বক এগুলোর গুনগত মান উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ এবং প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ দান।
* মৎস্য মান নিয়ন্ত্রনের সাথে জড়িত সরকারি বেসরকারি সকল জনবলকে মাছ চাষ পদ্ধতি থেকে প্রক্রিয়াকরণ কারখানা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের বিষয়ে তথা হ্যাসাপ পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।
* রপ্তানী পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং নতুন রপ্তানী বাজার সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ।
* সমুদ্রগামী মাছ/চিংড়ি ট্রলার ও ইঞ্জিন নৌকাগুলোর মৎস্যমান নিয়ন্ত্রন ও সংরক্ষণ এর সুযোগ সুবিধাদি বৃদ্ধি করণ।

বিবিধ বিষয়

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ন মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন সম্ভাবনাকে যথাযথ ভাবে কাজে লাগানো ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নিম্মোক্ত বিবিধ বিষয় গুলোর উপর কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করা বাঞ্চনীয়।

* দেশের সকল মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য আহরন তথ্যাদি যুগোপযোগী ও তথ্য নির্ভর করার লক্ষ্যে পূরাতন পদ্ধতি বিলুপ্ত করে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ও বাস্তবমুখী জরীপ পদ্ধতি গ্রহন অত্যাবশ্যক।
* মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান এবং প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা প্রদান ।
* উৎপাদনমুখী কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে প্রকল্পের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে কর্মসূচী ভিত্তিক কার্য্যক্রম গ্রহণ।
* সকল প্রকার প্রাকৃতিক বা অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবেলায় মৎস্য ,চিংড়ি খামার,মৎস্য জাত শিল্প,মৎস্য চাষী ও মৎস্যজীবিদের বীমার আওতায় আনা।
* মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কর্মকান্ডে জড়িত চাষী,উদ্যোক্তার শিল্প প্রসারের লক্ষ্যে মৎস্য ব্যাংক। প্রতিষ্ঠা/ব্যাংক প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত বানিজ্যিক ব্যাংকে মৎস্য সেল সৃষ্টি।

হ্যাচারীতে উৎপাদিত কার্পজাতীয় মাছের পোনার মান নিয়ন্ত্রণ

এস.এন.চৌধুরী
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

বীজের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে ফসলের ফলন, আর বীজের গুণাগুণ নির্ভর করে যে স্ত্রী -পুরুষ থেকে তার উদ্ভব তার উপর। এই সত্যটি আমাদের দেশে মাছ চাষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রকৃতি তার আপন রীতিতে বিদ্যমান জীবজগতের প্রতিটি জীবের স্বভাব - বৈশিষ্ট্য এবং গুণাগুণ সংরক্ষণ করে আসছে। মানুষ তার মেধা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান দিয়ে তাঁর প্রয়োজনীয় ফসল ও জীবজন্তুর গুনাগুন উন্নততর করায় নিয়োজিত আছে। কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ কিংবা উদ্দ্যেশ্য প্রণোদিত কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। দেশের মৎস্য হ্যাচারীগুলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কৃত্রিম প্রজনন

দেশে মাছের পোনা উৎপাদনে কৃত্রিম প্রজনন বিশেষ অবদান রাখছে। মৎস্য চাষ এবং মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদের কার্যক্রম প্রসারিত হওয়ায় দেশে কার্প জাতীয় মাছের পোনার চাহিদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কার্পজাতীয় মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে রেণু পোনা উৎপাদনের যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা নিম্নের ছক থেকেই বুঝা যায়।

রেণু পোনা উৎপাদনের পরিমাণগত অগ্রগতি হয়েছে সত্যিই কিন্তু গুণগত উন্নতির পরিবর্তে অবনতি হয়েছে ততোধিক। মৎস্য বীজের কাংখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর অবনতি হওয়ায় মৎস্য চাষীরা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। তাদের পুকুরে মাছ আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় না, সহজেই রোগাক্রান্ত হয়, অল্প বয়সেই এবং ছোট আকারেই পরিপক্কতা লাভ করে, ফলে সার্বিক উৎপাদন কমে যায়। তাই তারা নদীর পোনা এবং হ্যাচারীতে উৎপাদিত পোনার মধ্যে সুস্পষ্ট তুলনা তুলে ধরেন। যদি এখনই এ দিকে পদক্ষেপ নেয়া না হয়, তবে এই সমস্যা ভবিষ্যতে প্রকট হয়ে দেখা দিবে তাতে সন্দেহ নেই। গুণগত বৈশিষ্ট্যের অবক্ষয়ের প্রধান

সাল	উৎপাদন	
	প্রাকৃতিক উৎসের রেণু পোনা (কেজি) প্রায়	হ্যাচারীতে উৎপাদিত রেণু পোনা (কেজি)প্রায়
১৯৮৮	১২,৫৩৩	৫,৬৯৭
১৯৮৯	১২,২৩৫	৪,৩১৫
১৯৯০	৫,১২৮	১৩,০১৪
১৯৯১	৬,৮৫৫	২২,১৭০
১৯৯২	৯,৩৪২	৩৩,০৭২
১৯৯৩	৪,৯১৩	৪৩,০৪৭
১৯৯৪	৫,৮৭১	৪৯,০০০
১৯৯৫	৯,১৪৪	৭২,০০০
১৯৯৬	২,৩৯৯	১,১৬,২১২
১৯৯৭	২৮২৪	১,১৭,৫০০
১৯৯৮	২,৮৮৫	১,১৮,১০০

কারণগুলো হচ্ছে ব্রুড মাছের বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিচর্যা ও নির্বাচন জ্ঞানের অভাব, অন্তঃ প্রজনন সমস্যা সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে অনাকাংখিত সংকরায়ন।

দেশে বর্তমানে প্রায় পাঁচ শতাধিক ছোট বড় বেসরকারী কার্প হ্যাচারী আছে। এ সব হ্যাচারী ব্যবস্থাপকদের অনেকেই কারিগরী জ্ঞানে সমৃদ্ধ নন। বিজ্ঞানের জটিল তাত্ত্বিক জ্ঞান দিয়ে এদেরকে হ্যাচারী ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী করাও সহজ নয়। তাই এদেরকে অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাবে সমস্যাগুলো সম্পর্কে সচেতন এবং সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। সরকারী হ্যাচারীতেও এ ধরনের সমস্যা একেবারে অনুপস্থিত নয়। সকলেরই লক্ষ্য কেবল মাত্র

পরিমাণগত উৎপাদন বৃদ্ধির, তাই ফসলের সার্বিক গুণাগণ সমুন্নত রাখার দিকে দৃষ্ট নিবদ্ধ থাকে না। কিন্তু কিছুটা সতর্ক ও সচেষ্ট হলে এবং সদিচ্ছা থাকলে তা সম্ভব। এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে এ সম্পর্কে একটি দিক নির্দেশনা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।

কৃত্রিম উপায়ে প্রজননিত চাষযোগ্য প্রজাতি

দেশে চাষ যোগ্য অনেকগুলো মৎস্য প্রজাতি রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু কিছু প্রজাতি বিশেষ স্থানে এবং বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রজনন করে। এ সব প্রজাতির মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস এবং বিদেশ থেকে আনিত সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প, বিগহেড কার্প, কমনকার্প, মিরর কার্প ও থাইপুঁটি উল্লেখযোগ্য। এ গুলোর মধ্যে কমন কার্প, মিররকার্প ও থাইপুঁটি ব্যতীত অন্য প্রজাতিগুলো সাধারণতঃ প্রবাহমান নদীতে প্রজনন করে। মাছ চাষের ব্যাপক প্রসারের ফলে পোনার চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত পোনা এ চাহিদা পূরণে যথেষ্ট নয়। তাই পোনার চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে এসব প্রজাতির কৃত্রিম প্রজনন ঘটানো হয়। অনিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম প্রজননের প্রসারের কারণেই এ সব প্রজাতি গুলোই গুনগত মানের দিক থেকে সব চেয়ে বেশী অবক্ষয়িত হয়েছে।

আহরণ, পরিবহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রায় ৫% মৃত্যুহার ধরে বছরে প্রায় ৪২৫ কোটি পোনার প্রয়োজন। ৪২৫ কোটি বড় পোনা উৎপন্ন করতে প্রয়োজন হয় (৩০% বাঁচার হার হিসেবে) প্রায় ৪৭,২২২ কেজি রেণু পোনা (গড়ে প্রতি কেজি রেণুতে প্রায় ৩.০ লক্ষ রেণু হিসেবে)। অর্থাৎ কম বেশী ৫০,০০০ কেজি।

পোনার চাহিদা

জলাশয়	আয়তন (হেক্টর)	পোনার সম্ভাব্য চাহিদা (কোটি)
দিঘী পুকুর	১,৪৭,০০০	১০৯
বাওড়	৬,০০০	২
কাপ্তাই লেক	৬৯,০০০	১৪
প্লাবন ভূমি বিল, হাওড়	২৮,০০,০০০	২৮৪
মোট		৪০৯

উল্লেখ্য যে বর্তমানে উৎপাদিত রেণু পোনার পরিমাণ এক লক্ষাধিক কেজি। এ থেকে বর্তমানে বড় পোনার উৎপাদন প্রায় ৩০০ কোটি। এতে প্রতীয়মান হয় রেণু থেকে পোনা (৫-১৫ সে.মি আকারের) উৎপাদনের সময় রেণু পোনার বাঁচার হার মাত্র প্রায় ১০ শতাংশ । এ হিসাবে ৪২৫ কোটি পোনা উৎপাদনে প্রায় ১,৪২,০০০ কেজি রেণু পোনার প্রয়োজন। আঁতুড় এবং চারা পুকুর ব্যবস্থাপনার উন্নতি হলে বর্তমানে যে পরিমাণ রেণু পোনা উৎপন্ন হচ্ছে তার অর্ধেক উৎপন্ন হলেই দেশের চাহিদা পূরণ সম্ভব হতো। তাছাড়া উৎপাদিত রেণুর গুণগত মান বজায় রাখাও সহজতর হতো।

ব্রুড মাছ ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা

একটি হ্যাচারীর উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী যে পরিমাণ ব্রুড মাছ প্রতিপালন করা প্রয়োজন তা অনেক হ্যাচারীতে করা হয় না। অবশিষ্ট মাছ পার্শ্ববর্তী মাছ চাষের পুকুর থেকে তাৎক্ষণিকভাবে সংগ্রহ করে প্রজনন ঘটানো হয়। এ অবস্থায় আকার, স্বাস্থ্য, পরিপক্কতার বয়স, বংশগতি, উৎপত্তির ইতিহাস কিছুই বিবেচনা করা হয় না, কেবল মাত্র পেটে ডিম আছে কিনা কিংবা পুরুষগুলোর শুক্র (milt) আছে কিনা তা নিশ্চিত হয়েই প্রজনন ঘটানোর জন্য সংগ্রহ করা হয়।

এ ছাড়া হ্যাচারীর পুকুরে যে সব ব্রুড মাছ প্রতিপালন করা হয় সেগুলোর অধিকাংশই কয়েক জোড়া ব্রুড থেকে উৎপাদিত পোনা থেকেই বংশানুক্রমে তৈরী ব্রুড। পরবর্তীতেও বারংবার প্রজননিত একই ব্রুডের বংশধরদেরকে ব্রুডে পরিণত করা হয়। উল্লেখ্য যে, অন্তঃ প্রজনন (in-breeding) প্রতিক্রিয়া ২-৩ বংশগতিতেই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। সুতরাং বারংবার অন্তঃপ্রজনন ঘটালে উৎপাদিত পোনার গুণাগুণের অবক্ষয় কতটা হবে তা সহজেই অনুমেয়।

হ্যচারীর্তে বা খামারে মৌসুমের প্রথমদিকে চাহিদা থাকায় দ্রুত বর্ধনশীল পোনাগুলো বিক্রী করে শেষ মৌসুমের অবশিষ্ট পোনা ভবিষ্যতের ব্রুড হিসাবে তৈরী করা হয়। নিয়মিত ভাবে প্রাকৃতিক উৎস কিংবা অন্য কোন হ্যাচারী থেকে উন্নত মানের ব্রুড বিনিময় (inter-change) করা হয় না। হ্যাচারী ব্যবস্থাপকরা তাদের ব্রুডগুলো ছোট করে রাখতে আগ্রহী। কারণ ছোট মাছের প্রজননও সহজ এবং ডিমপাড়ার হারও (spawning rate) বেশী। তাই বাণিজ্যিক সফলতার উদ্দেশ্যে গুনগত মান গৌণ হয়ে পড়ে।

ব্রুডের উৎস নির্বাচন

হ্যাচারী ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের সিংহভাগই নির্ভর করে ব্রুড মাছের উপর। তাই হ্যাচারীতে ব্রুড মাছ প্রতিপালনের জন্য উন্নত মানের ব্রুড মাছ কিংবা পোনা নির্বাচন করে ভবিষ্যতের জন্য ব্রুডের মজুদ গড়ে তুলতে হবে। এই কাজটি অত্যন্ত ধৈর্য্য ও বিচক্ষণতার সাথে করতে হয়। কোন জীব যখন অধিকতর বৈচিত্র পূর্ণ এবং পরিবর্তনশীল পরিবেশে বাস করে তখন সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্য তার মধ্যে নানা রকমের "কৌলতাত্ত্বিক বৈসাদৃশ্য"(genetic variability) গড়ে উঠে। তাই প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত পোনা মাছ হ্যাচারীতে পালনের মাধ্যমে ভাল গুনসম্পন্ন ব্রুড হিসেবে তৈরি করে নেয়া যায়। কোন হ্যাচারী যদি আগে থেকে প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহীত ব্রুডের প্রজননের মাধ্যমে নিজস্ব ব্রুডের মজুদ গড়ে থাকে তবে সেখান থেকেও ব্রুড সংগ্রহ করা যেতে পারে।

ব্রুড তৈরির জন্য প্রথম পর্যায়ে প্রাকৃতিক উৎস যেমন হালদা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা প্রভৃতি নদ-নদীর প্রজনন ক্ষেত্র থেকে রেণুপোনা সংগ্রহ করাই শ্রেয়। সংগৃহীত রেণু পোনা পুকুরে পালনকালে তার মধ্য থেকে দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত , স্বাস্থ্যবান, সবল, নিখুঁত অবয়বের পোনা গুলোকে ভবিষ্যতের ব্রুড হিসেবে নির্বাচিত করা উচিৎ।

এ ছাড়া একই উৎস থেকে মাছ সংগ্রহ না করে দূর-দূরান্তের সর্বাধিক উৎস থেকে বিভিন্ন সময়ে সংগ্রহ করা করা প্রয়োজন। দূরবর্তী বিভিন্ন হ্যাচারীর মধ্যে ব্রুড বিনিময়ের মাধ্যমেও এটি করা যায়, যদি সেই হ্যাচারীতে নিয়ম অনুসরণ করে ব্রুড প্রতিপালন করা হয়ে থাকে।

ব্রুড প্রতিপালন

হ্যাচারীতে যে পরিমাণ (সংখ্যা) মাছ প্রজনন কাজে ব্যবহৃত হয়, তার চেয়ে কিছু বেশী মাছ সংগ্রহ করতে হবে। তবে এই সংখ্যা নির্ভর করবে হ্যাচরীর উৎপাদন লক্ষ্য মাত্রার উপর। যত ব্রুড মাছ প্রতিপালন করা হয় তার মধ্যে প্রায় ২% মারা যেতে পারে, ৫% যথাযথ পরিপক্কতা লাভ করে না, ৭% প্রজনন করে না এবং ১০% মাছ পুকুরে থেকে যায়, যা জাল দিয়ে ধরা যায় না। এই বাড়তি ২৪% হিসাব ধরেই ব্রুডের প্রাথমিক সংখ্যা নিরূপণ করতে হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রাথমিক অবস্থায় যত বেশী উৎস থেকে ব্রুড সংগ্রহ করা যাবে ততই তা থেকেই কৌলতাত্ত্বিক ভাল গুণ সম্পন্ন পোনা পাওয়া যাবে। ব্রুড প্রতিপালনের জন্য যথারীতি পুকুর প্রস্তুত করে সার ও সম্পূরক খাবার দিয়ে এবং পানির পরিমাণ ও গুনাগুন সুষ্ঠুভাবে বজায় রেখে ব্যবস্থাপনা করতে হবে। সম্পূরক খাদ্য অবশ্যই সুষম হতে হবে এবং তা ভিটামিন, প্রেটিন, খনিজ লবণ যুক্ত হতে হবে। মাঝে মাঝে আংশিক পানি পরিবর্তন (exchange) ব্রুডের পরিপক্কতা লাভে বিশেষ সহায়ক হয়। ব্রুডমাছ প্রতিপালন কালে যে সব মাছের বৃদ্ধি শ্লথ , রোগাক্রান্ত, বিকলাংগ, সেগুলো তুলে ফেলতে হবে। প্রজননক্ষম কাতলা মাছ তৈরী অন্যান্য মাছের তুলনায় কঠিন। তাই কাতলার সাথে সিলভার কার্প এবং বিগহেড কার্প না রাখাই বাঞ্ছনীয়। প্রতি একরে ৮০০-১০০০ কেজি ব্রুড মজুদ রাখা শ্রেয়। একই ব্রুড ৪-৫ বছর পর্যন্ত প্রজনন করা যায়, তারপর প্রজনন না করাই শ্রেয়, এতে পোনার মানের অবনতি হতে পারে।

হ্যাচরীতে ব্যবহার যোগ্য মাছের বয়স ও আকার

ইদানিং প্রায়ই দেখা যায় অত্যন্ত ছোট আকারের কার্প জাতীয় মাছ প্রজনন করানো হয়। এতে ভবিষ্যত বংশধরদের গুণগত মান অধঃপতিত হয়। তাই নিম্নবর্ণিত আকার ও বয়সের মাছ প্রজনন করানোর জন্য পরামর্শ প্রদান করা যেতে পারে।

প্রজাতি	সর্বনিম্ন বয়স(বছর)	সর্বনিম্ন ওজন(কেজি)
কাতলা	২+	৩.০+
রুই	২	১.৫+
মৃগেল	২	১.০+
কালিবাউস	২	১.০+
সিলভারকার্প	২+	২.৫+
গ্রাসকার্প	২+	২.৫+
বিগহেড	২+	২.৫+
কমনকার্প	১+	১.৫+
মিররকার্প	১+	১.৫+
রাজপুঁটি	১	০.৩০+
ব্লাক কার্প	৫	৬.০

ব্রুড প্রতিস্থাপন

ব্রুড মাছ ব্যবহারের ফলে প্রতি বছরই কিছু ব্রুড নষ্ট হয়। এ গুলো পূরণের জন্য ২/১ টি পুকুরে প্রাকৃতিক উৎসের কিংবা অন্য কোন দূবর্তী স্থান থেকে সংগৃহীত গুনগত মান সম্পন্ন পোনা প্রতিপালনের সংস্থান রাখতে

হবে। এই পোনা থেকে দ্রুত বর্ধনশীল ও স্বাস্থ্যবান মাছগুলো পরিত্যক্ত ব্রুড মাছ প্রতিস্থাপনে নিয়মিত ব্যবহার করা যায়।

বিদেশী প্রজাতির মাছগুলো দীর্ঘদিন আগে এ দেশে আনা হয়েছে। এদের অন্তঃ প্রজনন ঘটার ফলে গুণগত মান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে কিংবা সরকারের সহায়তায় বেসরকারী উদ্যোগে বিদেশ থেকে কৌলতাত্বিক ভাবে বিশুদ্ধ নতুন ব্রুড মাছ আনার ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন।

দেশে ব্রুড মাছের চাহিদা

প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ শুরুতে ১০০ কেজি ব্রুড মাছ (স্ত্রী ও পুরুষ সহ) প্রতিপালন করলে তা থেকে ১৭-২০ কেজি রেণু পোনা উৎপন্ন করা যায়। তবে একই মৌসুমে দুইবার প্রজনন করা হলে মোট প্রায় ২৮ কেজি রেণু উৎপন্ন সম্ভব। ১০০ কেজি ব্রুড পালন করলে প্রায় ৮৩ কেজি মাছ প্রজননে অংশ নিতে পারে।

এ হিসেবে দেশের মোট চাহিদা পূরণে বছরে প্রায় ৮৩৫ মেঃ টন উন্নত মানের ব্রুড প্রয়োজন। পরবর্তীতে প্রতি বছর মোট ব্রুডের প্রায় ২০ % প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন।

ব্রুড ব্যাংক স্থাপনের প্রস্তাব

যতদিন উন্নত মানের কৌলিতাত্বিক বৈচিত্র সম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদন সাধারণ হ্যাচারী মালিকদের পক্ষে সম্ভব না হয়, ততদিন এর দায়িত্ব মাৎস্য গবেষণা ইনিষ্টিটিউট এর নেয়া প্রয়োজন। উন্নত জাতের বীজ তৈরী করে বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনিষ্টিটিউট মৎস্য অধিদপ্তরের খামার সমূহে প্রতিপালনের জন্য সরবরাহ করতে পারে। মৎস্য খামার সমূহে এগুলো ২৫০- ৫০০ গ্রাম ওজনের হলে তা হ্যাচারী মালিকদের নিকট নির্ধারিত সুলভ মূল্যে সরবরাহ করা যায়। হ্যাচারী মালিকগণ তাদের নিজস্ব পুকুরে এগুলো প্রতিপালন করে ভবিষ্যতের ব্রুড হিসেবে তৈরি করে নেবেন। সরাসরি নির্ধারিত পূর্ণ ওজনের ব্রুড সরকারী খামারে তৈরী করতে হলে অনেক পরিমান জলায়তনের প্রয়োজন, যার সংস্থান করা কঠিন। তাছাড়া বৃহদাকারের ব্রুড দূর-দূরান্তের হ্যাচারীগুলোতে পরিবহণ করা কষ্টকর, ঝুঁকিপূর্ণ এবং ব্যয়সাধ্য। বিকল্প পন্থা হিসেবে ক্রমান্বয়ে বেসরকারী পর্যায়েও ব্রুড ব্যবসায় গড়ে উঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। আগ্রহী উদ্যোক্তাদেরকে যথাযথ কারিগরী প্রশিক্ষণ দিয়ে সরকারী আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে ব্রুড ব্যবসায় উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। এটি একটি লাভজনক ব্যবসা তাতে সন্দেহ নেই। তবে সার্বিক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও তদারকীর জন্য একটি সুষ্ঠু নীতিমালা এবং কর্মসূচী গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন।

সরবরাহ পদ্ধতি

ব্রুড মাছগুলো বিভিন্ন হ্যাচারীতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিবহনের জন্য উন্নত পরিবহন পরিকাঠামো সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

দেশের মৎস্য সম্পদের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে সরকার পরিচালিত ব্রুড ব্যাংকে উৎপাদিত ব্রুড মাছ নো-লস নো-প্রফিট (No loss no profit) মূল্যে সরবরাহ করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

হ্যাচারী মালিকের করনীয়

হ্যাচারীতে বিদ্যমান অন্তঃ প্রজনন সমস্যা সংকুল ব্রুড গুলো সরিয়ে ফেলে সংগৃহীত উন্নত কৌলিতাত্বিক বৈচিত্রময় গুনসম্পন্ন ব্রুড সংরক্ষন করা উচিত, কোন ক্রমেই যেন আগের ব্রুডের সংগে মিশে না যায়।

মৎস্য অধিদপ্তর এবং মাৎস্য গবেষণা ইনিটিউট যৌথভাবে সকল হ্যাচারী মালিকদেরকে/ ব্যবস্থাপকদেরকে অন্তঃ প্রজনন সমস্যা নিরসন এবং কৌলিতাত্বিক বৈচিত্র সম্পন্ন ব্রুড তৈরীর উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিয়েছে। তাছাড়া এই প্রবন্ধে আলোচিত পরামর্শ মত ব্রুড প্রতিপালন করলে ক্রমান্বয়ে হ্যাচারীতে উন্নত গুণ সম্পন্ন ব্রুড তৈরি সম্ভব।

অনাকাংখিত সংকরায়ন থেকে বিরত থাকার জন্য হ্যাচারী ব্যবস্থাপকদের সচেষ্ট হতে হবে। নতুবা মূল প্রজাতি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। কেবল মাত্র গবেষণা লব্দ অভিজ্ঞতার আলোকে লাভজনক সংকরায়ন করা উচিত।

নদী থেকে কিংবা ব্রুড ব্যাংক থেকে সংগৃহীত মাছ হ্যাচারীর মূল ব্রুড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মূল ব্রুড থেকে যে রেণু পোনা উৎপন্ন হবে তা থেকে পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতে দ্রুত বর্ধনশীল, স্বাস্থ্যবান পোনা গুলোকে নতুন ব্রুড হিসেবে তৈরি করে ব্যবহার করা যায়। মূল ব্রুড থেকে উৎপাদিত অতিরিক্ত পোনা নার্সারী মালিক কিংবা মাছচাষীদের নিকট মাছ চাষে ব্যবহারের নিমিত্তে বিক্রী করা যায়। নতুন ব্রুড থেকে উৎপাদিত রেণু হ্যাচারীতে

পরবর্তী ব্রুডের জন্য ব্যবহার না করে মাছ চাষের জন্য বিক্রী করা উচিত। এই পোনা মাছ চাষের জন্য ক্ষতিকারক নয়। নদী থেকে সংগৃহীত পোনা পরিচর্যা করে তার মধ্য থেকে উন্নত মানের পোনাগুলোকে নদীর নতুন ব্রুড হিসেবে মজুদ গড়ে তোলা যায়। এই ব্রুড মূল ব্রুডের সাথে প্রজননে এবং ব্রুড প্রতিস্থাপনে ব্যবহার করা যায়। এতে কৌলতাত্ত্বিক গুণাগুণ ক্ষতিগ্রস্থ হয় না, যা সাধারণতঃ অন্তঃ প্রজননে হয়ে থাকে।

উপসংহার

দেশে বর্তমানে হ্যাচারীতে উৎপাদিত পোনার প্রাচুর্যই সর্বজন স্বীকৃত। ইদানিং হাওড় ও বিলে হ্যাচারীতে উৎপাদিত পোনা মজুদ করা হচ্ছে। পোনা গুলোর অধিকাংশ অন্তঃ প্রজননজনিত সমস্যা প্রসূত। মুক্ত প্রবাহমান জলাশয়,

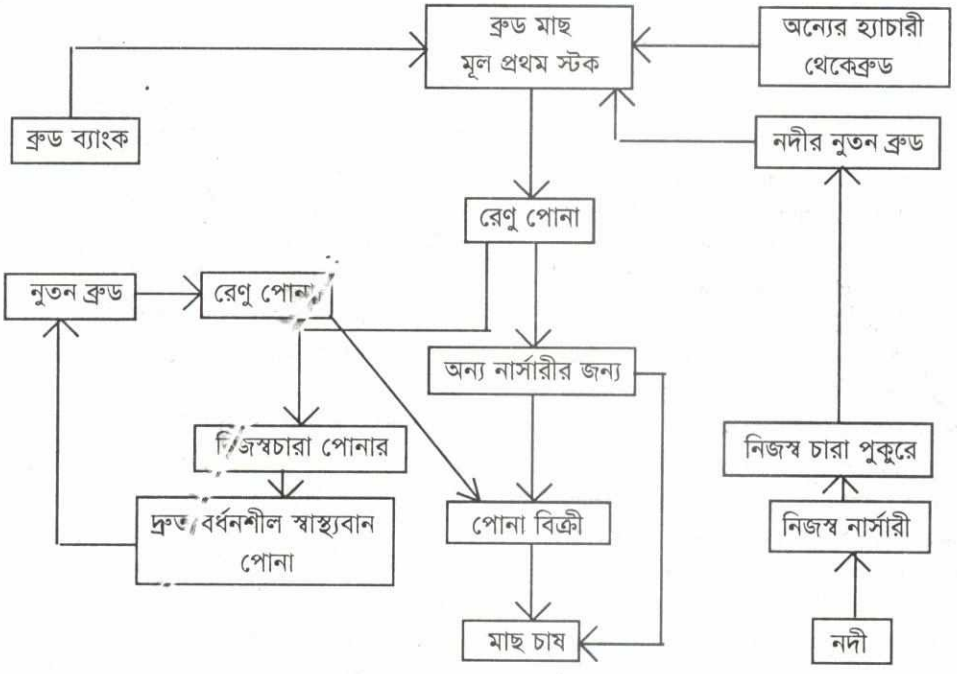

হ্যাচারীতে উন্নত ব্রুড ব্যবস্থাপনার ছক

যেখানে কার্প জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ঘটে সেখানে হ্যাচারীতে উৎপাদিত পোনা মজুদ না করাই শ্রেয়। প্রাকৃতিক উৎসে কৌলিতাত্ত্বিক বৈচিত্র সম্পন্ন "মূল জেনেটিক মজুদ" অবশ্যই সংরক্ষিত এবং অক্ষত রাখা উচিত। হ্যাচারীতে ব্রুডের অবক্ষয় যতটা না ইচ্ছকৃত তার চেয়ে বেশী অজ্ঞতাজনিত। তাই হ্যাচারী ব্যবস্থাপকদেরকে অবিলম্বে পর্যায়ক্রমে ব্রুড ব্যবস্থপনা এবং হ্যাচারী পরিচালনায় বিশদ প্রশিক্ষকের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। দেশে বর্তমানে মাত্র পাঁচ শতাধিক হ্যাচারী রয়েছে। সুতরাং এদেরকে প্রশিক্ষিত করা কঠিন কাজ নয়। হ্যাচারী নির্মাণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি নীতিমালা থাকা অত্যাবশ্যক। সরকার এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন।

হ্যাচারী মালিকদের মনে রাখতে হবে, তারা বীজ উৎপাদনকারী। পুকুর মালিকরা সেই বীজের সর্বশেষ প্রকৃত ব্যবহারকারী, তাই ব্যবহারকারীরা যদি বীজের সন্তোষজনক ফল না পায় তাতে শুধু সেই ব্যক্তি নয় গোটা দেশই মৎস্য উৎপাদনে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাই দেশের স্বার্থে উন্নত ব্রুড ব্যবহারে সচেষ্ট হয়ে উন্নত বীজ (পোনা) উৎপাদন বাঞ্চনীয়।

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে থানা পর্যায়ে সম্প্রসারণ সেবার প্রভাব

মোঃ নজরুল ইসলাম
মোঃ মনিরুজ্জামান
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

বাংলাদেশের পুকুর-দীঘি, ডোবা-নালা, মৌসুমি জলাশয় এবং অন্যান্য বদ্ধ ও আধাবদ্ধ জলাশয় চাষের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন অত্যন্ত সম্ভাবনাময় উৎস। দেশে প্রায় ১৩ লক্ষ দীঘি-পুকুর আছে। এসব বদ্ধ জলাশয়ের আয়তন প্রায় ১.৪৭ লক্ষ হেক্টর। তাছাড়া মৎস্য চাষোপযোগী ৫-৭লক্ষ হেক্টর আধাবদ্ধ ও মৌসুমি জলাশয় রয়েছে। বর্তমানে এ উৎস হতে উৎপাদিত মাছের পরিমাণ দেশের মোট উৎপাদনের প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অভাবে এ সকল জলাশয়ের উৎপাদন ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু দেশের জলবায়ু, পানি ও মাটির উর্বরতা বিবেচনা করে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ পূর্বক দ্রুত বর্ধনশীল রুইজাতীয় বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করলে উৎপাদনশীলতা ২-৩ গুণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মাছ চাষের কলাকৌশল সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সম্প্রসারণ সেবা কার্যক্রম খুবই সীমিত। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় কয়েকটি মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সীমিত কিছু এলাকায় বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এতে মৎস্য চাষে গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে বিপুল আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। মৎস্যচাষীদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের নিমিত্তে দলগত প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীমূলক কার্যক্রম এক চাষীর মাধ্যমে অন্যান্য চাষীদের নিকট প্রযুক্তি প্রসারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। থানা পর্যায়ে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়, দেশের ৫৯ টি জেলায় ৪০০ থানায় সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

সম্প্রসারণ সেবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা

* মৎস্য অধিদপ্তরের বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে থানা পর্যায়ের বিদ্যামান সম্প্রসারণ কর্মীদ্বারা মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।
* স্থানীয় লাগসই প্রযুক্তি বিশেষ করে "রুই জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ" - প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।
* মৎস্য চাষীদের হাতে কলমে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা প্রদান করা।
* গ্রামীণ মৎস্যচাষীদের উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে ফলাফল প্রদর্শক হিসেবে বেসরকারী সম্প্রসারণ কর্মী সৃষ্টি করা।
* পল্লী অঞ্চলে মৎস্যচাষের মাধ্যমে বর্ধিত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং মৎস্যচাষীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

এ প্রকল্পের আওতায় ৫ বৎসরে ১৩,২০০ জন ফলাফল প্রদর্শক মৎস্য চাষীএবং ৬৬,০০০ জন সহযোগী মৎস্য চাষী অর্থাৎ মোট ৭৯,২০০ মৎস্য চাষীকে উন্নত মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী মৎস্য চাষের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তরের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ফলাফল প্রদর্শক মৎস্যচাষীদের পুকুরে বাৎসরিক গড়ে হেক্টর প্রতি ৩.৫০ টন এবং সহযোগী মৎস্যচাষীদের পুকুরে বাৎসরিক গড়ে হেক্টর প্রতি ২.৫০ টন হিসেবে ৫ বৎসরে সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় গ্রামীণ মৎস্যচাষীদের ১১,৮৮০ হেক্টর পুকুর আধা নিবিড় পদ্ধতিতে রুইজাতীয় মাছের মিশ্রচাষের আওতায় এনে ৩১,৭৮০ মেট্রিক টন মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

সম্প্রসারণ পদ্ধতি

এক চাষীর মাধ্যমে অন্য চাষীদের নিকট প্রযুক্তি প্রসার অথবা ট্রিকল ডাউন মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত এবং দলভিত্তিক সংযোগ রক্ষার জন্য প্রতি থানায় বৎসরে মোট ৩৬ সদস্যের ৬ টি ছোট ছোট দল গঠন করা হয়। সংযোগ মৎস্যচাষীদের মধ্যে একজন অগ্রগামী

ফলাফল প্রদর্শক মৎস্যচাষী এবং ৫ জন সহযোগী মৎস্য চাষী সমন্বয়ে প্রতিটি দল গঠন করা হয়। এ কার্যক্রমে মৎস্য চাষীগণ নিজ ব্যয়ে মৎস্য চাষ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। মৎস্যচাষীদের শুধু মাত্র কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে সকল মৎস্য চাষীকে দুই ধাপে অর্থাৎ মৎস্য চাষ প্রস্তুতিমূলক ২ দিনের এবং মধ্যবর্তী সময়ে পুকুর ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যামূলক ১ দিন মোট ৩ দিনের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মৎস্য চাষীদের মধ্যে মত বিনিময়ের জন্য থানা পর্যায়ে ১ দিনের কৃষক র‍্যালি ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। মৎস্য চাষের কলাকৌশল হাতে-কলমে শিখানো এবং রুইজাতীয় মাছের আধা নিবিড় মৎস্যচাষ পদ্ধতির প্রযুক্তি ব্যবহারে বর্ধিত উৎপাদনের ফল প্রত্যক্ষভাবে দেখানোর জন্য ফলাফল প্রদর্শকের পুকুরটিতে প্রদর্শনী পুকুর হিসেবে মাছ চাষ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ কর্মীগণ মাসে কম পক্ষে একবার ফলাফল প্রদর্শকের পুকুর পরিদর্শন ও দলগত সংযোগ রক্ষা করে উদ্ভুত সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান এবং প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ প্রদান করেন যাতে ফলাফল প্রদর্শকের প্রদর্শনী পুকুরে মাছ চাষের নিয়ম কানুন দেখে অন্যান্য সহযোগী চাষী মৎস্য চাষ প্রযুক্তি ও কৌশল শিখে নিজেদের পুকুরে একই নিয়মে চাষ করতে পারে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ কার্যক্রমের প্রভাব নিরূপনের জন্য মৎস্য চাষীদের আর্থসামাজিক অবস্থা প্রকল্প-পূর্ব এবং প্রকল্পোত্তর মৎস্য চাষের উৎপাদন আয়-ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া ফলাফল প্রদর্শক মৎস্য চাষীর পুকুরে প্রদর্শনী মৎস্য চাষের পুকুর প্রস্তুতি, চুন ও সার প্রয়োগ, পোনা মজুত, সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ, মজুত পরবর্তী পুকুর ব্যবস্থাপনা, মাছ আহরণ ও বিপনণের সকল তথ্যাদি পুকুর ব্যবস্থাপনা রেকর্ড বইয়ে সংরক্ষণ করা হয়। প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের সম্প্রসারণ কার্যক্রম থানা মৎস্য কর্মকর্তা, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা এবং ক্ষেত্র সহকারী পরিচালনা করেন। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা কার্যক্রমের কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা তদারকী করেন। জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে সার্বিক কর্মকান্ডের সরেজমিন পরিদর্শন ও মাসিক সভার মাধ্যমে অগ্রগতি পর্যালোচনা, সমস্যা নিরূপণ এবং সমাধান প্রদান করে থাকেন। এভাবে প্রকল্পে সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে রুই জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ বিষয়ক উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার কৌশল অবলম্বন করা হয়। মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ সামগ্রী, প্রদর্শনী মৎস্য চাষের পুকুরে পানি পরীক্ষার নিমিত্তে পানি পরীক্ষা কিটস্, সংযোগ চাষী পুকুরে নমুনাকরণের নিমিত্তে জাল ও মাছ চাষের যন্ত্রপাতি, চাষীদের প্রশিক্ষণের জন্য ফ্লিপ চার্ট, প্রশিক্ষণ বোর্ড, প্রদর্শনী পুকুরে সাইন-বোর্ড, অডিও ভিজুয়্যাল যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, মৎস্যচাষ বিষয়ক নির্দেশিকা ও পুস্তিকা, পুকুর ব্যবস্থাপনা রেকর্ড বই, মৌলিক তথ্য ও আর্থ সামাজিক জরিপ ফরম এবং বিবিধ সম্প্রসারণ সামগ্রী প্রকল্প হইতে সরবরাহ করা হয়।

সম্প্রসারণ সেবার ফলাফল ও পর্যবেক্ষণ

মৎস্য চাষীদের উৎপাদন

প্রকল্প বাস্তবায়নের মোট ৫ বৎসরের মধ্যে প্রথম ৩ বৎসরে (১৯৯৫-৯৮) মোট ৭৯,২০০ জন মৎস্যচাষীর মধ্যে ৩৬,০০০ জন মৎস্যচাষীকে প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ সেবা প্রদান এবং ৫,৪০০ হেক্টর পুকুরে উন্নত পদ্ধতিতে রুই জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ কার্যক্রমের আওতায় আনার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ১৯৯৫-৯৬ সালে ২৯৭ টি থানা হতে মোট ১,৭৪২ জন ফলাফল প্রদর্শক মৎস্য চাষীদের (আর ডি) মাধ্যমে ৫০৬ হেক্টর পুকুরে এবং ৮,৫২৮ জন সহযোগী মৎস্য চাষীদের (এফ এফ) মাধ্যমে ১,৫২৬ হেক্টর পুকুরে মৎস্যচাষ কার্যক্রম পরিচালনা করে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় এবং এক বৎসরে প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের পর ফলাফল প্রদর্শকদের উক্ত উৎপাদন মৌসুমে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ৯২৪ কেজি হতে ২,৩৩২ কেজিতে এবং সহযোগী চাষীদের ১,৮১৫ কেজিতে উন্নীত হয়। ১৯৯৬-৯৭ সালে ২৮৩ টি থানায় মোট ১,৫৮২ জন ফলাফল প্রদর্শক মৎস্যচাষীদের মাধ্যমে ৫৫৫ হেক্টর পুকুরে এবং ৮,৩৬১ জন সহযোগী মৎস্যচাষীদের মাধ্যমে ১,৫১৯ হেক্টর প্রদর্শনী পুকুরে মৎস্যচাষ কার্যক্রম পরিচালনা করে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় এবং ফলাফল প্রদর্শকদের উক্ত উৎপাদন মৌসুমে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ১,০৬৭ কেজি হতে ২,৮৩৩ কেজিতে এবং সহযোগী চাষীদের ২,৩৫১ কেজিতে উন্নীত হয়। ১৯৯৭-৯৮ সালে ৩০২ টি থানায় মোট ১,৮৯০ জন ফলাফল প্রদর্শক মৎস্যচাষীদের মাধ্যমে ৫১৯ হেক্টর পুকুরে এবং ৮,৪৫৬ জন সহযোগী মৎস্যচাষীদের মাধ্যমে ১,৫২৫ হেক্টর পুকুরে মৎস্যচাষ কার্যক্রম পরিচালনা করে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। ফলাফল প্রদর্শকদের উক্ত উৎপাদন মৌসুমে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ১,১৭৩ কেজি হতে

৩,০৭০ কেজিতে উন্নীত হয় এবং সহযোগী চাষীদের ২,৩৪২ কেজিতে উন্নীত হয়। প্রকল্পের মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচীতে সহযোগী মৎস্যচাষীদের তুলনায় ফলাফল প্রদর্শক মৎস্যচাষীদের উৎপাদন বেশী বলে পরিলক্ষিত হয় (সারণি - ১)। প্রকৃত পক্ষে ফলাফল প্রদর্শক মৎস্যচাষীরা থানা পর্যায়ে সম্প্রসারণ কর্মীদের সাথে মতবিনিময় এবং প্রযুক্তি সেবা গ্রহণের সুযোগ বেশি পায় বলে তাদের পুকুরে উৎপাদনও বেশি পরিলক্ষিত হয়। প্রকল্প ভুক্ত ৪০০ টি থানার মধ্যে ১৯৯৫-৯৬ সালে ১০৩ টি থানা, ১৯৯৬-৯৭ সালে ১১৭ টি থানা এবং ১৯৯৭-৯৮ সালে ৯৮ টি থানা হতে মৎস্যচাষীদের উৎপাদন সংক্রান্ত কোন উপাত্ত ও তথ্য পাওয়া যায় নাই বলে তা মৎস্যচাষীদের উৎপাদন বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব করা হয় নাই। যে সব চাষী মাছচাষের মৌলিক বিষয়গুলো অনুসরণ করেন তাদের উৎপাদন প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় আশাব্যঞ্জক বলে পরিলক্ষিত হয়। মৎস্যচাষীর প্রদর্শনী ব্যবহারিক কার্যক্রম ও বর্ধিত উৎপাদন দেখে অন্যান্য সহযোগী চাষীরাও আধুনিক প্রযুক্তি মাফিক মৎস্য চাষ পরিচালনা করেন। প্রকল্পের মৎস্য চাষী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমাজের সকল ধরনের চাষীর আর্থিক অবস্থা, মৎস্য চাষের অভিজ্ঞতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, জেন্ডার বিষয়াদি ইত্যাদি বিবেচনায় আনা হয়। ফলে দেখা যায় চাষী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যারা তাদের পুকুরে মাছচাষের সকল খরচ বহন করতে পারে এরূপ ব্যক্তিবর্গকে ফলাফল প্রদর্শক চাষী হিসেবে নির্বাচন করায় সম্প্রসারণ সেবা কার্যকরী হয়। সমাজের এ ধরনের মৎস্যচাষীদের উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সম্প্রসারণ সেবা করায় কর্মসূচী বহাল রাখা হলে তা স্থায়িত্বশীল হবে। ফলে মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে সফল মৎস্য চাষীদের ফলাফল প্রদর্শক হিসেবে নির্বাচন করায় তার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি অন্যান্য সহযোগী মৎস্যচাষীদের মাঝে প্রসার লাভ করে। প্রকল্পটি মৎস্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় থানা পর্যায়ে বিদ্যমান জনবল দ্বারা বাস্তবায়ন করা হয় বলে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ কর্মীদের সাথে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শন সেবার মাধ্যমে গ্রামীন মৎস্যচাষীদের একটি যোগসূত্র সৃষ্টি হয়েছে যা সম্প্রসারণ সেবা জোরদার করণ এবং এর স্থায়ীত্বশীলতার উপর ধনাত্মক প্রভাব পড়ে। বিগত ৩ বৎসরে প্রকল্পপূর্ব এবং প্রকল্পোত্তর উৎপাদন সংক্রান্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ফলাফল প্রদর্শক মৎস্যচাষীগণ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৭৮ ভাগ এবং সহযোগী মৎস্যচাষীদের শতকরা ৮৬ ভাগ উৎপাদন করতে সক্ষম হন।

সারণি - ১ঃ ফলাফল প্রদর্শক ও সহযোগী মৎস্যচাষীদের গড় উৎপাদন বৃদ্ধি

সন	আর.ডি সংখ্যা	পুকুরের আয়তন (হেক্টর)	এফ.এফ সংখ্যা	পুকুরের আয়তন (হেক্টর)	প্রকল্পপূর্ব উৎপাদন (কেজি/হেঃ)	আর.ডি প্রকল্পোত্তর উৎপাদন (কেজি/হেঃ)	এফ.এফ প্রকল্পোত্তর উৎপাদন (কেজি/হেঃ)
১৯৯৫-৯৬	১,৭৪২	৫০৬	৮,৫২৮	১,৫২৬	৯২৪	২,৩৩২	১,৮১৫
১৯৯৬-৯৭	১,৫৮২	৫৫৫	৮,৩৬১	১,৫১৯	১,০৬৭	২,৮৩৩	২,৩৫১
১৯৯৭-৯৮	১,৮৯০	৫১৯	৮,৪৫৪	১,৫২৫	১,১৭৩	৩,০৭০	২,৩৪২

সারণি - ২ ঃ মৎস্য অধিদপ্তরে বাস্তবায়নাধীন মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ ধর্মী বিনিয়োগ প্রকল্পের তালিকা

প্রকল্প নাম ও দাতা সংস্থা	বিনিয়োগ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের এলাকা	মৎস্যচাষী লক্ষ্যমাত্রা	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (টন)	চাষী প্রতি প্রকল্প খরচ (টাকা)
১) থানা পর্যায়ে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (জিওবি)	৭১২	৫৯ জিলা (৪০০থানা)	৭৯,০০০	৩২,০০০	৯০৫/-
২) উত্তর-পশ্চিম মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (ডিএফআইডি)	১,৯০৯	৮ জিলা (৫৮ থানা)	৬০,০০০	৩৪,০০০	৩,১৮২/-
৩) বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (ডানিডা)	৩,৬৭০	৭ জিলা (২৬ থানা)	২৫,০০০	৩০,০০০	১৪,৬৮০/-
৪) বৃহত্তর নোয়াখালী জেলায় মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (ডানিডা)	৩,৭৮০	৩ জিলা (১৪ থানা)	২৫,০০০	২৭,০০০	১৫,১২০/-
৫) বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলায় মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (ডানিডা)	২,৪২৩	২ জিলা (১১ থানা)	১২,০০০	১৬,০০০	২০,১৯২/-

সম্প্রসারণ র্কসূচীর তূলনামূলক পর্যলোচনাঃ মৎস্য অধীদপ্তরে বর্তমানে ৫ টি মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। যার মধ্যে ৪ টি প্রকল্প বিভিন্ন বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রত্যক্ষ কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন আছে। শুধুমাত্র আলোচ্য থানা পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অনুদানে মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান সম্প্রসারণ কর্মীদ্বারা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মোট বিনিয়োগ খরচ, প্রকল্প এলাকা, মৎস্যচাষীদের সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা এবং উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ইত্যাদি সূচক বিশ্লেষণ করে প্রতীয়মান হয় যে বিদেশী সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পটিতে বিশেষজ্ঞ ও বর্ধিত জনবল এবং তাদের যানবাহন ও যন্ত্রপাতি বাবদ ব্যয়ে বিনিয়োগ ব্যয়ের সিংহভাগ খরচ হয়। এসব প্রকল্পে মৎস্যচাষী এবং উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার অনুপাতে প্রকল্প ব্যয়ের হার অত্যাধিক বেশি। ডানিডা সাহায্যপুষ্ট মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ প্রকল্পটিতে প্রাথমিক পর্যায়ে এককভাবে মৎস্যচাষীদের নিবিড় সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করলেও পরবর্তীতে উক্ত কৌশল পরিবর্তন করে দলভিত্তিক মৎস্য সম্প্রসারণ কৌশল অবলম্বন করে। ডি. এফ.আই.ডি সাহায্যপুষ্ট উত্তর-পশ্চিম মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প এলাকায় আদর্শ মৎস্য গ্রামে দল/গোষ্ঠী ভিত্তিক সম্প্রসারণ কৌশল অবলম্বন করায় প্রকল্প খরচ বেশি হলেও তার কার্যকারিতা মাঝামাঝি ধরনের বলে প্রতীয়মান হয়। অন্যদিকে সরকারি অনুদানে বাস্তবায়নাধীন থানা পর্যায়ে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ প্রকল্পটির সংস্থানকৃত অর্থ খরচ করা হয় মাঠ পর্যায়ে মৎস্যচাষীদের প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ সামগ্রী ও প্রযুক্তি সেবা বাবদ। এক্ষেত্রে মৎস্যচাষী এবং উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার অনুপাতে প্রকল্প ব্যয়ের আনুপাতিক হার কম (সারণি - ২) ফলে দেশের আর্থ- সামাজিক প্রেক্ষাপটে চাষীদের সংগঠিত করে দলগতভাবে একচাষীর মাধ্যমে অন্যান্য চাষীদের নিকট স্থানীয় লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণধর্মী প্রকল্প স্থায়ীত্বশীল ও সহনীয় হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

সম্প্রসারণ কর্মসূচীর সমস্যাসমূহ

মাঠ পরিদর্শন কালে প্রকল্প বাস্তবায়নের কিছু সমস্যা চিহ্নিত করা হয়। বিচ্ছিন্নভাবে সামাজের কিছু প্রভাবশালী মৎস্য চাষীকে ফলাফল প্রদর্শক হিসেবে নির্বাচনের ফলে সে ক্ষেত্রে সহযোগী মৎস্য চাষীগণ ফলাফল প্রদর্শকের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেবা পান না। তাছাড়া সহযোগী মৎস্য চাষীর পুকুর মাঠ কর্মী কর্তৃক নিয়মিত তদারকী না করাতে কোন কোন ক্ষেত্রে তাদেরকে সংগঠিত করা সম্ভব হয় না এবং ফলাফল প্রদর্শক কতটুকু প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করছে তা নির্ধারন করা সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে ফলাফল প্রদর্শক কর্তৃক প্রতিযোগিতার কারণে সহযোগী মৎস্য চাষীদের পরামর্শ প্রদান করতে

অনীহা প্রদর্শন করে। মাঠ কর্মীগণ ফলাফল প্রদর্শকের প্রদর্শনী পুকুর পরিদর্শন সময় কিছু সহযোগী মৎস্য চাষী নিয়মিতভাবে হাজির থাকেন না অথবা প্রদর্শনী কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এতে তারা মাছ চাষের প্রযুক্তির ব্যবহারিক দিকগুলো সম্পর্কে হাতে কলমে শিখার সুযোগ পান না। সেসব ক্ষেত্রে প্রকল্পের এক চাষীর মাধ্যমে অন্য চাষীর নিকট প্রযুক্তি প্রসার পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসৃত হয় না। ফলে নির্বাচিত মৎস্যচাষীদের নিকট থেকে সম্প্রসারণ সেবার প্রভাতেব সংক্রান্ত উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। বর্ণিত সমস্যাসমূহ প্রকল্পভুক্ত থানাসমূহের মধ্যে শতকরা ২৭ ভাগ থানায় পরিলক্ষিত হয়।

সুপারিশ ও উপসংহার

প্রকল্পের ফলাফল প্রদর্শক ও সহযোগী চাষী নির্বাচনের সময় সমাজের সকল শ্রেণীর মৎস্য চাষীদের মধ্য থেকে নির্বাচন করা উচিৎ। প্রভাবশালী মৎস্যচাষী যারা সহযোগী চাষীদের পরামর্শ প্রদানে অনীহা প্রদর্শন করতে পারে তেমন চাষীদের নির্বাচন না করে অংশগ্রহন মূলক সম্প্রসারণ সেবা কাজে আগ্রহী মৎস্য চাষীদের নির্বাচনে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। প্রকল্পে মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অধিক ফলপ্রসূ করার নিমিত্তে পর্যায়ক্রমে থানা মৎস্য কর্মকর্তার কার্য্যালয়ে এবং মৎস্যচাষীদের পুকুর পাড়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। সম্প্রসারণ কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রায় উপনীত হওয়ার নিমিত্তে সম্প্রসারণকর্মী কর্তৃক প্রদর্শনী পুকুর পরিদর্শন কালে সহযোগী চাষীদের উপস্থিতির নিশ্চয়তা বিধান করে তাদেরকেও মৎস্যচাষ বিষয়ক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিৎ।

প্রকল্পের ফলাফল প্রদর্শক ও সহযোগী মৎস্যচাষী একটি বিশেষ সুফলভোগী দল, যাদের নিজস্ব পুকুর আছে এবং পুকুরে মাছ চাষাবাদের নিমিত্তে পরিচালনা খরচ নিজেরাই বহন করতে সক্ষম। এ সব মৎস্যচাষীর অনেকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থাকায় তারা অংশগ্রহণ মূলক সম্প্রসারণ কর্মসূচীর আওতায় স্থায়ীত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধিতে দক্ষতা অর্জন করেছে। তাদের শুধু প্রয়োজন আরও অধিক উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে লাগসই মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান যা এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শন সেবা প্রদান করছে। স্থানীয় সহায়তায় কম ব্যয়বহুল এবং বিদ্যমান সম্প্রসারণ কর্মী দ্বারা উন্নত মৎস্যচাষ প্রযুক্তি হস্তান্তর কর্মসূচীর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারলে দেশের সামগ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে যথাযথ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এ প্রকল্পের সফল সমাপ্তির পরে একই উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী ভিত্তিক মৎস্যচাষীদের সংগঠিত করে দলগত ভাবে একচাষীর মাধ্যমে অন্যান্য চাষীদের নিকট প্রযুক্তি প্রসারমূলক মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ সেবা অব্যাহত রেখে স্থায়ীত্বশীল মৎস্য উৎপাদনে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে জড়িত রাখা সম্ভব হবে। এতে মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক সম্প্রসারণ সেবা কার্যকরী ও জোরদার হবে।

উন্নত পদ্ধতিতে আঁতুড় পুকুর ব্যবস্থাপনা

কৃষিবিদ বেগম আনওয়ারী
কৃষিবিদ মোঃ আবুল হাশেম (সুমন)
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষের জন্য উন্নতমানের পোনা সরবরাহ নিশ্চিত করা একান্তই অপরিহার্য। বাংলাদেশে মৎস্য চাষে আশানুরূপ সফলতা অর্জনের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে উন্নতমানের পোনা মাছের অপর্যাপ্ততা। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সুস্থ্য-সবল পোনার কোন বিকল্প নেই। রেণুপোনার জীবন চক্র অত্যন্ত নাজুক। বর্তমানে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে পোনা মৃত্যুর হার কমানো হয়েছে। যে ক্ষুদ্রায়তন পুকুর বা জলাশয়ে মাছের ছোট আকারের বাচ্চা গুলোকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে লালন করে চারা বা মজুদ পুকুরে ছাড়ার উপযুক্ত করে বড় করা হয় তাকেই আঁতুড় পুকুর বলে। মাছের রেণু পোনা বড় করার জন্য আঁতুড় পুকুরে ৩-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত লালন করা হয়ে থাকে। আঁতুড় পুকুর ব্যবস্থাপনায় পোনা লালন পালনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গুলো সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

পুকুর নির্বাচন

যে সমস্ত পুকুরে বা জলাশয়ে মৌসুমে অথবা সারা বৎসর ব্যাপী পানি থাকে সে গুলি আঁতুড় পুকুর হিসাবে ব্যবহার করা চলে। পুকুরের আয়তন ছোট আকারের অর্থাৎ ২.৫ শতাংশ হতে ১ বিঘা পর্যন্ত হলে ভাল হয়। পুকুরে পানির গভীরতা ৩-৫ ফুট রাখাই বাঞ্চনীয়। পুকুর হতে প্রয়োজনানুসারে পানি বের করা ও পানি সরবরাহ দেওয়ার জন্য একটি নির্গমন ও আগমন পথ রাখা ভাল। উক্ত পথ দিয়ে যাতে অবাঞ্ছিত মাছ পুকুরে ঢুকতে না পারে বা পোনা মাছ বের হয়ে যেতে না পারে সে জন্য উপযুক্ত জাল দ্বারা নির্গমন পথ আটকে রাখতে হবে। উল্লেখ্য, পানির গভীরতা উপরোক্ত মাত্রার চেয়ে কম হলে রৌদ্রের তাপে পানি গরম হয়ে পোনার মৃত্যু ঘটতে পারে, আবার গভীরতা বেশিহলেও পোনা মাছ পানির চাপ সহ্য করতে না পারায় মারা যাবে।

পুকুর প্রস্তুতি

আঁতুড় পুকুরে মাছের পোনার বাঁচার হার বৃদ্ধি সঠিক ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভরশীল। পুকুরের পাড় ও তলা মেরামত করা, পুকুর পাড়ের ঝোপঝাড় জংগল, বড় আকারের গাছের ডাল পালা কেটে ফেলা ছাড়াও পুকুর প্রস্তুতির বেশ কয়টি পর্যায় আছে যেমন - জলজ আগাছা দমন, রাক্ষুসে ও অন্যান্য মাছ উচ্ছেদ, চুন ও সার প্রয়োগ এবং জলজ কীট পতঙ্গ উচ্ছেদ ইত্যাদি।

ক। জলজ আগাছা দমন

পুকুর প্রস্তুতির প্রাথমিক পর্যায়ে জলজ আগাছা যেমন কচুরী পানা, টোপা পানা, ক্ষুদি পানা এবং তন্তুজাতীয় শ্যাওলা ইত্যাদি দূর করতে হবে। পুকুরে আগাছা থাকলে মাছের খাদ্য তৈরিতে ও চলাফেরায় দারুন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। তাই আগাছা গুলো প্রথমে কায়িক শ্রম দ্বারা তুলে ফেলতে হবে। সাধারণত তন্তুজাতীয় শ্যাওলা উচ্ছেদ করার জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রয়োগ করতে হবে। শতাংশ প্রতি ৮-১০ গ্রাম তুঁতে (কপার সালফেট) পানিতে মিশিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিলে ৩-৪ দিনের মধ্যেই সমস্ত শ্যাওলা মারা যাবে।

খ। রাক্ষুসে ও অন্যান্য মাছ উচ্ছেদ

রাক্ষুসে মাছ যেমন- শোল, টাকি, গজার, ফলি ইত্যাদি অথবা অন্যান্য অবাঞ্ছিত মাছ বা ক্ষতিকর প্রাণী মজুদকৃত রেণু পোনা এবং খাবার খেয়ে পোনার ক্ষতিসাধন করে থাকে। সাধারণতঃ পুকুর শুকিয়ে বা বিষ প্রয়োগ করেই পুকুরের সমস্ত মাছ ও ক্ষতিকর প্রাণী দূর করা যায়। পুকুর শুকিয়ে রাক্ষুসে মাছ ও ক্ষতিকর প্রাণী উচ্ছেদ করাই উত্তম তবে পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে নিচের যে কোন একটি

পদ্ধতির মাধ্যমে রাক্ষুসে/অবাঞ্ছিত মাছ তথা অন্যান্য ক্ষতিকর প্রাণী দমন করতে হবে।

(১) ফস্‌টকসিন ট্যাবলেট

এটি ব্যবহারের ফলে পুকুরের সমস্ত মাছ মারা যাবে তবে কিছু চান্দা, তেলাপিয়া থেকে যেতে পারে।

ব্যবহারের মাত্রা ঃ ১টি ট্যাবলেট/শতাংশ/ ৩০ সেঃ মিঃ পানি।

ব্যবহার বিধি ঃ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্যাবলেট সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। ১-২ ঘন্টা পর মাছ ভাসতে শুরু করলে জাল টেনে মাছ ধরে ফেলতে হবে।

বিষাক্ততার মেয়াদকাল ঃ ৭-১০ দিন।

(২) রোটেনন পাউডার

প্রয়োজনীয় পাউডার বালতিতে পানির মধ্যে গুলে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। পাউডার ছিটনোর পর জাল টেনে পুকুরের পানি ওলট পালট করে দিতে হবে।

ব্যবহার মাত্রা ঃ ২৫ গ্রাম পাউডার/শতাংশ/৩০ সেঃ মিঃ পানি।

বিষাক্ততার মেয়াদকাল ঃ ৭দিন।

৩। ব্লিচিং পাউডার

এ পাউডার ব্যবহারে মাছ, ব্যাঙ, শামুক ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রাণী মারা যায়।

ব্যবহার মাত্রা ঃ ১ কিলোগ্রাম/ শতাংশ/৩০ সেঃ মিঃ পানি।

ব্যবহার বিধি ঃ রোটেনন পাউডার ব্যবহার পদ্ধতির মতই এর ব্যবহার।

বিষাক্ততার মেয়াদকাল ঃ ৭দিন প্রায়। উল্লেখ্য, ব্লিচিং পাউডার ব্যবহারের পর পুকুরে চুন দেওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে ক্ষেত্রে পুকুরে বিষ প্রয়োগ করা হবে সে ক্ষেত্রে রেণু ছাড়ার পূর্বে বিষক্রিয়া পরীক্ষা করে নিতে হবে।

(গ) চুন প্রয়োগ

পুকুর শুকানোর মাধ্যমে মাছ উচ্ছেদ করা হয়ে থাকলে পুকুরের তলদেশে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরে চুন প্রয়োগের ৩দিন পর পানি সরবরাহ করতে হবে। যদি পানি নিষ্কাশন না করে বিষ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে শতাংশ প্রতি ১ কেজি চুন পানিতে মিশিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। উভয়ক্ষেত্রে পুকুরের ঢালু পাড়েও চুন দিতে হবে।

(ঘ) সার প্রয়োগ

পুকুরে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরির জন্য জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করতে হয়। চুন প্রয়োগের অন্তত ৭ দিন পর জৈব সার শতাংশে ৮-১০ কেজি অথবা হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা প্রতি শতাংশে ৪-৫ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পরে। জৈবসার সহজলভ্য না হলে প্রতি শতাংশে ইউরিয়া ২০০ গ্রাম এবং টি. এস. পি. ১০০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করতে হবে।

জৈব ও অজৈব সার একটি পাত্রে পানির সাথে মিশ্রিত করে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পুকুরে দ্রুত খাবার উৎপাদনের জন্য পঁচানো সরিষার খৈল ও ইউরিয়া সার নিম্নলিখিত হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(ক) সরিষার খৈল ঃ ৩০০-৪০০ গ্রাম/শতাংশ।

(খ) ইউরিয়া ঃ ৮০-১০০ গ্রাম/শতাংশ।

খৈল ও ইউরিয়া সার একত্রে একটি পাত্রে তিন গুণ পানির মধ্যে ১২-২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে সূর্য্যের আলোতে সকাল ৯-১১ টার মধ্যে এ পচাঁনো সার সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগ কাজটি রেণু পোনা মজুদের অন্তত ৪-৫ দিন পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে।

(ঙ) জলজ কীট পতঙ্গ উচ্ছেদ

আঁতুড় পুকুরে সার প্রয়োগের ফলে সাধারণত হাঁস পোকা, ব্যাঙাচি ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রাণী জন্ম নিতে দেখা যায়। এ সকল ক্ষতিকর প্রাণী মাছের পোনা খেয়ে ফেলে এবং খাদ্যের জন্য পোনার সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। তাই রেণু পোনা মজুদের পূর্বে সরু মশারির জাল দিয়ে টেনে কীট পতঙ্গ দূর করে নেয়া উচিত। উল্লেখ্য, সার প্রয়োগের অন্তত ৫ দিন পর রেণু ছাড়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। রেণু ছাড়ার পূর্বে সম্পূর্ণরূপে পুকুর হতে ক্ষতিকর কীট পতঙ্গ অপসারণ করতে হবে।

ক) পুকুরে শতাংশ প্রতি ২০ গ্রাম হারে ডিপট্যারেক্স নামক রাসায়নিক পদার্থ পানিতে গুলে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। ডিপট্যারেক্স প্রয়োগের ফলে ৩-৪ ঘন্টার মধ্যে জলজ কীট পতঙ্গ মারা যায়।

খ) ডিপট্যারেক্স-সুমিথিয়ন ঔষধ দুটি নিম্নহারে পুকুরে প্রয়োগ করে পানির মধ্যকার ক্ষতিকর পোকামাকড় মেরে ফেলা যায়।

ডিপট্যারেক্স ঃ ১২ গ্রাম/শতাংশ/৩০ সেঃ মিঃ পানি।

সুমিথিয়ন ঃ ৩ গ্রাম /শতাংশ/৩০ সেঃ মিঃ পানি।

রেণু ছাড়ার ২৪ ঘন্টা পূর্বে একটি পাত্রের মধ্যে ডিপট্যারেক্স পানিতে মিশিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। ডিপট্যারেক্স দেওয়ার ১২ ঘন্টা পর অর্থাৎ রেণু ছাড়ার ১২ ঘন্টা পূর্বে একটি পাত্রে সুমিথিয়ন পানিতে মিশিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

(গ) ডিপট্যারেক্স এর অভাবে কেরোসিন অথবা ডিজেল ব্যবহার করেও পুকুরের হাঁসপোকা দমন করা যায় তবে এ ক্ষেত্রে রেণুর জন্য ক্ষতিকর অন্যান্য বড় কীট পতঙ্গ মারা যায় না। বাতাসের মধ্যে পুকুরে তৈল ছিটানো কার্যকর হয় না। প্রতি ১০ শতাংশ পুকুরের জন্য ১ লিটার ডিজেল অথবা আধা লিটার কেরোসিন এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

পুকুরে রেণু পোনা মজুদ করণ

আঁতুড় পুকুরে মজুদের জন্য সাধারণত ৪-৫ দিন বয়সের রেণুপোনা সংগ্রহ করে নিতে হবে। পানির তাপমাত্রা যখন কম থাকে অর্থাৎ সকালে বা বিকালে রেণু পুকুরে ছাড়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। রাত ১০-১১ টার দিকেও পুকুরে রেণু ছাড়া যেতে পারে। এ সময় পানির তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। রেণু যদি অক্সিজেন সম্বলিত পলিথিন ব্যাগে আনা হয় তাহলে পুকুরে ছাড়ার সময় পলিথিন ব্যাগটির অর্ধেক পানিতে অন্তত আধ ঘন্টা ডুবিয়ে রাখতে হবে। এরপর পুকুরের পানি আস্তে আস্তে ব্যাগে ঢুকাতে হবে এবং ব্যাগের পানি বাহিরে ফেলতে হবে। এভাবে যখন পুকুরের পানির তাপমাত্রা ও ব্যাগের পানির তাপমাত্রা সমান হবে তখন ব্যাগটি কাত করে ধরলেই সকল রেণুপোনা ধীরে ধীরে আপনা আপনিই বেরিয়ে পুকুরে চলে যাবে। আঁতুড় পুকুরে রেণু প্রতিপালনে দুই ধরণের পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

ক) একধাপ পদ্ধতিতে প্রতিপালন

এ পদ্ধতিতে রুই জাতীয় মাছের যে কোন প্রজাতির ৪-৫ দিনের রেণু পোনা ২-৩ মাস প্রতিপালন করে ২-৩" ইঞ্চি বড় করা যায়। এক্ষেত্রে প্রতি শতাংশে ৮-১০ গ্রাম হারে রেণু ছাড়া যেতে পারে। আশানুরূপ ফলন লাভের উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন। এ ছাড়া রেণু মজুদের ১-২ দিন পর হতে পুকুরে প্রতিদিন নিম্নহারে সার প্রয়োগ করতে হবে। গোবর ১৫০-২৫০ গ্রাম/শতাংশ। ইউরিয়া ৪-৫ গ্রাম/শতাংশ, টি. এস. পি ৩ গ্রাম/শতাংশ দুই ধরণের সার (জৈব + অজৈব) একটি পাত্রে ১২-১৫ ঘন্টা ৩ গুন পানির মধ্যে মিশানোর পর সকালে ৯-১১ টার দিকে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। মেঘলা দিনে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি চালের কুঁড়া/গমের ভূষি ও সরিষার খৈল সম্পুরক খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। খৈলের পরিবর্তে মৎস্য চুর্ন ব্যবহার করা চলে তবে তা হবে ব্যয় বহুল। চালের কুঁড়া ও সরিষার খৈল ভাল করে গুড়া করে চালুনি বা গামছা দিয়ে চেলে খাদ্য তৈরি করতে হবে। সমপরিমান মিশিয়ে সমস্ত পুকুরে দিনে অন্তত ২বার ছিটিয়ে দিতে হবে। প্রথম সপ্তাহে প্রতি শতাংশে অন্তত ৫০ গ্রাম, ২য় সপ্তাহে ১০০ গ্রাম, ৩য় সপ্তাহে ১৫০ গ্রাম, ৪র্থ সপ্তাহে ২০০ গ্রাম, ৫ম সপ্তাহে ২৫০ গ্রাম, ৬ষ্ঠ হইতে ৭ম সপ্তাহ ৩০০ গ্রাম হারে খাবার প্রয়োগ করতে হবে। চতুর্থ সপ্তাহের পর হতে খাবার পুকুরে ২/৩ টি নির্দিষ্ট স্থানে ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্ণিত ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে মেনে চললে ২-৩ মাসের মধ্যে পোনার আকার অন্তত ৩ ইঞ্চি এবং পোনা মৃত্যুর হার কমে বাঁচার হার শতকরা ৬০ ভাগ হবে।

খ) দুই ধাপ পদ্ধতিতে প্রতিপালন

দুই ধাপে পোনা প্রতিপালন পদ্ধতি অধিকতর লাভজনক। এ পদ্ধতিতে প্রথম পর্যায়ে পুকুরে ৪-৫ দিন বয়সের রেণু পোনা শতাংশ প্রতি ৫০-১০০ গ্রাম হারে মজুদ করা যাবে। পোনা মজুদের দিন হতে মিহি চালের কুড়াঁ ও মিহি সরিষার খৈল ভাল করে মিশিয়ে নিম্নলিখিত হারে শুকনা অবস্থায় পুকুরে সকাল বিকাল ছিটিয়ে দিতে হবে। সম্ভব হলে ৩-৪ বার খাবার প্রয়োগ করলে আরো ভাল ফল পাওয়া যাবে। রেণু পোনা মজুদের পর হতে ১ম সপ্তাহে মজুদকৃত পোনার ওজনের ৩ গুণ, ২য় সপ্তাহে পোনার ওজনের ৫ গুণ, ৩য় সপ্তাহে পোনার ওজনের ৭গুণ এবং ৪র্থ সপ্তাহে পোনার ওজনের ১০গুণ হারে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া প্রাকৃতিক খাদ্য বাড়ানোর জন্য পুকুরে জৈব ও অজৈব সার ব্যবহার করতে হবে। জৈব সার হিসাবে

গোবর রেণু পোনা মজুদের ১০ দিন অন্তর অন্তর শতাংশ প্রতি ১০ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। গোবর সার পুকুরের ১ বা ২ কোণায় দেওয়া যেতে পরে। তদুপরি ইউরিয়া ও টি. এস. পি. প্রতি শতাংশে ১ঃ১ অনুপাতে ১০০ গ্রাম হারে পানিতে মিশিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় ৩ সপ্তাহে পোনা অন্তত ১ ইঞ্চি বড় হবে। পোনার জন্য জায়গা ও খাদ্যের অভাব দূর করার স্বার্থে উৎপাদিত পোনা অন্য পুকুরে সরিয়ে ফেলতে হবে। এ পদ্ধতিতে অধিক ঘনত্বে ২০-৩০ দিন প্রতিপালনে বাঁচার হার শতকরা সর্বোচ্চ ৭০ ভাগ পর্যন্ত পাওয়া যেতে পারে।

উক্ত পদ্ধতির আওতায় দ্বিতীয় পর্যায়ের পূর্বে উল্লেখিত নিয়মানুসারে পুকুর তৈরি করে ১ ইঞ্চি আকারের পোনা প্রতি শতাংশে ৩০০০-৪০০০ টি হিসাবে মজুদ করতে হবে এবং নিম্নলিখিত হারে সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। পোনা মজুদের ১ দিন পর হতে প্রথম দুই সপ্তাহ প্রতি লক্ষ পোনার জন্য ৮ কেজি, ২য় এবং ৪র্থ দুই সপ্তাহের জন্য প্রতি লক্ষ পোনার জন্য ১০ কেজি, ৩য় দুই সপ্তাহের জন্য প্রতি লক্ষ পোনার জন্য ১২ কেজি এবং ৪র্থ দুই সপ্তাহের জন্য প্রতি লক্ষ পোনার জন্য ১৫ কেজি হারে খাদ্য দিতে হবে। এ ছাড়া একধাপ পদ্ধতির ন্যায় জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। এ পদ্ধতিতে প্রতিপালন করলে ২ মাসে পোনা ৩ ইঞ্চি আকারের হবে এবং বাচাঁর হার হবে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ।

পর্যবেক্ষণ ও পরিচর্যা

রেণু ছাড়ার ১ দিন পর হতে প্রতিদিন সকালে অন্ততঃ ২ বার হররা টানতে হবে। রেণু মজুদের ৫-৬ দিন পর পুকুরের বেশ কিছু অংশ হাপা কিংবা একটুকরা পাতলা কাপড় দিয়ে টেনে পোনা বেঁচে থাকা এবং বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করতে হবে। রেণু মজুদের ৮- ১০ দিনের মধ্যে পুকুরে চট-জাল টানা উচিত নয়। কোন কোন সময়ে পুকুরের পানির রংবেশি সবুজ হলে পুকুরে অক্সিজেনের অভাবে পোনা মারা যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। সে পুকুরে সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। নিয়মিত সার ও খাবার দেওয়া হলে প্রজাতি ভেদে ১০-১৫ দিনের মধ্যে ধানী পোনা কাটাই করা ভাল। কাটাইয়ের পূর্বের দিন জাল টেনে পানির ঝাপটা দিয়ে পোনা শক্ত করতে হবে। একধাপ বাস্তর পদ্ধতির চাষে ধানী কাটাইয়ের কোন প্রয়োজন নাই।

আহরণ

পোনা মৃত্যুর হার হ্রাসকল্পে পোনা মাছ সাধারণত সকাল বেলাতেই আহরণ করা সমীচিন। যদি একই পুকুরে পোনা রেখে বিক্রয় করতে হয় তবে সকাল বেলা ১ থেকে ২বার জাল টানা উচিত। অন্যথায় পানি ঘোলা হয়ে পোনার ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মাছ চাষের পূর্বশর্তই হচ্ছে-উন্নতমানের পোনা সরবরাহ নিশ্চিত করা। সুতরাং উন্নত প্রযুক্তিতে আঁতুড় পুকুর ব্যবস্থাপনায় পোনা উৎপাদন কার্যক্রম সফল করে তোলা সংশ্লিষ্ট সকলেরই পবিত্র দায়িত্ব যা হবে প্রকৃত অর্থেই দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর।

বাংলাদেশে মুক্তা চাষ : সমস্যা ও সম্ভাবনা

ডঃ সুশান্ত কুমার পাল
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ঢাকা

মুক্তা ঝিনুকের ন্যাকার গ্রন্থি হতে নির্গত রক্ষিত পদার্থ - যা কোন বহিরাগত বস্তুর চার পাশে চক্রাকার পদ্ধতিতে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে যে উজ্জল চকচকে বস্তু গঠন করে তাকে মুক্তা বলে। একটি পুর্নাঙ্গ পরিপক্ক মূল্যবান রত্ন মুক্তা তৈরি হতে দীর্ঘ ৩-৫ বৎসর সময়ের প্রয়োজন হয়।

মুক্তা বিশ্বের একটি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ যা ঝিনুকের দেহে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন মুক্তা পৃথিবীর সব থেকে পুরানো আবিস্কৃত মনি মুক্তা বা পাথর। মুক্তা ঝিনুকের পেটে বিশেষ পদ্ধতিতে উৎপন্ন হয়ে থাকে। মুক্তা ধাতুর তৈরি পাথরের চেয়ে নরম এবং শোষণ করার ক্ষমতা রাখে ও আলো প্রতিফলিত হয়।

বিশ্বের প্রাকৃতিক মুক্তা বহনকারী ঝিনুক/ শামুকের আবাসস্থল

বাংলাদেশ ও ভারত ছাড়া ও বিশ্বে জাপান, চীন, ভিয়েতনাম, অস্ট্রেলিয়া, পারস্য উপসাগর, মান্নার উপসাগর, সাউথ প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ সংলগ্ন সমুদ্রে, ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে, ম্যাক্সিকো উপসাগর ও ক্যালিফর্নিয়া উপসাগরে মুক্তাভূমি আছে।

মুক্তার প্রকার ভেদ

মুক্তা প্রধানত তিন প্রকরের (১) প্রাকৃতিক (২) কৃত্রিম ও (৩) প্রনোদিত উপায়ে উৎপাদিত মুক্তা। ঝিনুকের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে যে মুক্তা থাকে তাকে প্রাকৃতিক মুক্তা বলে। যান্ত্রিক উপায়ে কাচ বা প্লাস্টিক সৃষ্ট মুক্তাকে কৃত্রিম মুক্তা বলে যা অসাধু ব্যাবসায়ীরা আসল মুক্তা বলে চালিয়ে দেয়। কোন বহিরাগত বস্তু যেমন কাচের টুকরো, হাড়ের গুড়ো মরা মুক্তার কনা, ঝিনুকের খোলসের গুড়ো ঝিনুকের দেহের বিশেষ অঙ্গে প্রবেশ করিয়ে যে মুক্তা তৈরী হয় তাকে প্রনোদিত উপায়ে উৎপাদিত মুক্তা বলা হয়।

মক্তার রাসায়নিক উপাদান

রাসায়নিক দিক বিশ্লেষন করিয়া দেখা গিয়েছে যে মুক্তার দুইটি প্রধান উপাদান আছে। মুক্তার রাসায়নিক উপাদান গুলি হলো -

আরগেনাইট (Caco3) - ৯০% ভাগ

কনকিওলিন (C32 H98 011) - ৫% ভাগ

জল -৫% ভাগ

কনকিওলিনে প্রোটিন অ্যালবুমেন পাওয়া যায়।

মুক্তার আকৃতি ও নাম

মুক্তা বিভিন্নআকারের হয়ে থাকে। মুক্তার আকৃতির উপর এর দামের কদর । আকারের দিক দিয়ে লম্বা, ডিম্বাকৃতি, ত্রিকোনা ও গোলাকার। গোলাকৃতি মুক্তার দাম সবচেয়ে বেশী । এর পরেই রয়েছে বোতাম আকৃতি মুক্তা। মুক্তার ওজনের একক পার্লগ্রেন । এক পার্লগ্রেন = ৫০ মিঃ গ্রাম = $\frac{1}{4}$ ক্যারেট । $\frac{1}{4}$ পার্ল মুক্তাকে ধানী মুক্তা বলা হয়। বাংলাদেশের মুক্তার বিভিন্ন নাম প্রচলিত আছে । যেমন - গারা, চুমকী, রাইটকী, ফুসকী ইত্যাদি ।

মুক্তা সাদা, গোলাপী,কালো, ধুসর, হলদে ও ক্রিম বর্নের হয়ে থাকে । স্বাভাবিক মুক্তার দেহতল কর্কশ । ইহাকে পালিশ করলে ইহার উজ্জলতা বৃদ্বি পায়। মুক্তার এই উজ্বলতাকে ওরিয়েন্ট বলা হয় ।

মক্তা বহন কারি ঝিনুকের বৈজ্ঞানিক পরিচিতি

ভারতের বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী ৫২ প্রজাতির ঝিনুক ও শামুকে মুক্তা পাওয়া যায় তবে মিঠে পানিতে ঝিনুকের মধ্যে Lamellidens এবং Parreysia গনের ঝিনুকে উন্নত মানের মুক্তা পাওয়া যায়। Lamellidens গনের মধ্যে রয়েছে

Lamellidens marginalis এবং Lamellidens corrianus প্রজাতি Parreysia গনের মধ্যে রয়েছে একটি প্রজাতি Parreysia corrugata এবং এই প্রজাতি হতে গোলাপী মুক্তা পাওয়া যায়। এ ছাড়া আমাদের বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক জলাশয়ে Pinctada গনের ৮ টি প্রজাতির ঝিনুক রয়েছে । এগুলো হলো - Pinctada fucata, P. margaritifera. P. chemmitizii, P. sugileata, P. anomioides, P. atropurpurea, P. maxima, P. martensis. এছাড়া কক্সবাজার এলাকায় Windowpane Oyster, Placuna placenta এবং সেন্টমার্টিন দ্বীপের সামুদ্রিক জলাসয়ে Trochus গনের দুইটি মলাস্ক প্রজাতিতে উন্নত মানের cremish pearl পাওয়া যায়। এই দুইটি প্রজাতি হলো (১) Trochus radiatus এবং (২) Trochus maculatus এদের মধ্যে প্রনদিত উপায়ে মুক্তা উৎপাদনের জন্য Pinctada fucata সবচেয়ে উপযোগী প্রজাতি।

এই উপমহাদেশে ভারতের গুজরাটে ১৯৫৬ সালে প্রনোদিত উপায়ে মুক্তা চাষের গবেষণা শুরু হয়। ১৯৭২ সালে ভারতের টিউটিকরিন এলাকায় CMFRI এর একটি গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রনোদিত উপায়ে মুক্তা চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে এবং ১৯৭৩ সালের ২৫ শে জুলাই প্রথমবারের মতো ভারতে প্রনোদিত উপায়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মুক্তা চাষের জন্য সফলতা লাভ করে। ভারতে মুক্তা চাষের গবেষণা এখনও চলেছে। ভারতের বালেশ্বর কচ্চ উপকুলে, বোম্বাইয়ের থানে ও উড়িস্যার ভুবনেশ্বরে মুক্তা চাষ করা হচ্ছে।

প্রনোদিত উপায়ে মুক্তা তৈরীর কলাকৌশল

ওয়েষ্টার এবং অন্যান্য ঝিনুকের মধ্যে একটি বিশেষ উপাদান থাকে একে নেকার বলে। শেলের মেন্টেলের মসৃন পর্দাকে Nacreous layer বা Pearlylayer বলা হয়। এটি সাধারনত আলোক উজ্জল দেখায়। এটি মেন্টেলের পুরু পর্দার কোষ থেকে তৈরী হয়েছে কোন বহিরা গত বস্ত ঝিনুকে প্রবেশ করালে মেন্টেলের নেকরিয়াস স্তর থেকে নেকার রস বহিরাগত বস্তুর চতুর্দিকে চক্রাকার পদ্ধতিতে আবৃত করতে থাকে। এরুপ দীর্ঘ তিন বছর পর পূর্নাঙ্গ মুক্তায় পরিনত হয়। ঝিনুক প্রজাতির খোলসের ভিতরে অংশে যে বর্ন দেখা যায় সেই বর্নের প্রজাতি বিশেষ মুক্তার রং হয়ে থাকে। আবার কোন প্রজাতিতে নেকার রসের বর্নের কারনে মূল্যবান মুক্তা তৈরি হয়। এটি সাধারনত গ্রীস্মমন্ডলীয় এলাকায় সমুদ্রের প্রজাতিতে দেখা যায়। যে সব ঝিনুক ও শামুক খাদ্য হিসেবে গ্রহন করা হয়, এদের খোলস অনুজ্জল, তাই এদের মুক্তা আলোকউজ্জল নয়। ফলে এই সব মুক্তা মূল্যবান রত্ন হিসেবে বিবেচ্য নয় । প্রনোদিত উপায়ে মুক্তা তৈরীর বিস্তারিত তথ্য মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কতৃক মৎস্য সপ্তাহ '৯৮ এর সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে। তাই বিস্তারিত তথ্য এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হলো না।

বাংলাদেশে প্রনোদিত উপায়ে মুক্তা চাষের ইতিহাস

বাংলাদেশে প্রনোদিত উপায়ে মুক্তা চাষের সফলতা বিষয়ক প্রযুক্তি নির্ভর তথ্য নেই বললেই চলে। তবে মুক্তা চাষের বিক্ষিপ্ত কিছু গবেষনা তথ্য রয়েছে। ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট মুক্তা চাষের গবেষনা হয়েছে কিন্তু মুক্তা চাষিদের উপযোগি লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশে মুক্তা চাষে প্রধান সমস্যা

আমাদের দেশে বিভিন্ন সমস্যার কারনে প্রনোদিত উপায়ে মুক্তা চাষ বাস্তবায়িত হচ্ছে না। এর প্রধান কারন গুলো প্রধানত ঃ-

* দক্ষ জনশক্তির অভাব;
* প্রনোদিত উপায়ে মুক্তা চাষ প্রযুক্তির অভাব ;
* মুক্তা অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামো বিষয়ে অজ্ঞতা;
* মুক্তা চাষের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অভাব;
* ঝিনুকের জীব বিদ্যা বিশেষ করে বিভিন্ন অঙ্গ সনাক্ত করন ও এই সব অঙ্গের কার্যকারিতা বিষয়ে অজ্ঞতা;
* লোনা পানির ঝিনুক সাধারনত Lamgoon এলাকায় ভাল হয়। আমাদের দেশে এধরনের ভালো উপযোগী স্থানের অভাব রয়েছে;
* প্রনোদিত উপায়ে উন্নত মানের মুক্তা তৈরি করতে কমপক্ষে ১-৩ বৎসর সময় লেগে যায়, তাই মুক্তা চাষে চাষীদের অনীহা;

* প্রনোদিত উপায়ে মুক্তা চাষের প্রচার মাধ্যমের অভাব ইত্যাদি।

সমাধান/ করণীয়

প্রনোদিত উপায়ে মুক্তা চাষের জন্য যে সমস্যা গুলো আলোকপাত করা হয়েছে তা সমাধানের লক্ষে প্রথমত নিম্নে বর্নিত বিষয় গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

* মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে মুক্তা গবেষনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
* যেহেতু প্রনোদিত উপায়ে মুক্তা চাষের কোন সফলতা বিষয়ক প্রযুক্তি আমাদের দেশে নাই সেহেতু বিজ্ঞানীদেরকে প্রশিক্ষনের জন্য বিদেশে পাঠাতে হবে।
* ইতিমধ্যে মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কেন্দ্রে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে হবে। সল্প মেয়াদী প্রকল্প মিঠা পানি ও সামুদ্রিক কেন্দ্রে বাস্তবায়িত হবে। দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প প্রস্তাবিত মুক্তা গবেষনা কেন্দ্র বাস্তবায়িত হবে।
* প্রয়োজন বোধে বিদেশ থেকে মুক্তা চাষ বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশ সরকার নিয়োজিত করতে পারেন।
* মুক্তা বহন কারী ঝিনুক এলাকাগুলিকে সরকার কর্তৃক আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে এই সব এলাকা থেকে অধিক ঝিনুক আহরন করে এদের আবাস স্থল ও প্রজনন ক্ষেত্র বিনস্ট না করা হয় । এ বিষয়ে সরকারের সুষ্ঠ নীতিমালা থাকা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে মুক্তা চাষের সম্ভাবনা

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশে প্রাকৃতিক উৎস হতে মুক্তা আহরিত হচ্ছে যুগ যুগ ধরে। দেশের খাল বিল, নদ-নদী, হাওড় বাওড় ও পুকুরে পরিপূর্ন মুক্তা বহন কারী ঝিনুকের প্রাচুর্য্যে ভরপুর। বাংলাদেশের কক্সবাজারের মহেশখালী, সোনাদিয়া, সেন্টমার্টিন, শাহপরীর দ্বীপ ইত্যাদি এলাকাকে অতিতে ' পার্ল ওয়েষ্টার বেড' বলাহত। এই সব এলাকায় মুক্তা উৎপাদন কারী লোনা পানীর ঝিনুকের প্রচুর্য্যে ভরপুর। বর্তমানে দেশে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক মুক্তা আহরন করে জীবিকা নির্বাহ করছে। এক পরিসংখ্যান তথ্যে জানাযায় যে সরকার যদি প্রনোদিত উপায়ে মুক্তা চাষের জন্য উদ্বেগ গ্রহণ করেন তাহলে এই মুক্তা বিদেশে রপ্তানি করে ১৫০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মূদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এছাড়া প্রনোদিত উপায়ে মুক্তা চাষের ফলে দেশে ২০ - ৩০ লক্ষ লোকের কর্ম সংস্থান এর সুযোগ হবে। প্রনোদিত উপায়ে মুক্তা চাষের পাশাপাশি মুক্তা বহনকারী ঝিনুক প্রজাতি চাষের উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আহরন এবং পোল্ট্রি খাদ্যের জন্য যে পরিমান ঝিনুক আহরন করে নষ্ট করা হয় তা যদি অনতি বিলম্বে সরকারী নীতি মালার মাধ্যমে এর সংরক্ষন ও চাষের ব্যাবস্থা না করা হয় তাহলে এই মূল্যবান ঝিনুক প্রজাতি এক সময়ে বিলীন হয়ে যাবে।

উপসংহার

বিভিন্ন সংবাদ তথ্য থেকে জানাযায় যে, বাংলাদেশে বিক্ষিপ্ত ভাবে মোহনা এবং উপকুলীয় অঞ্চলে মুক্তার চাষ হয় সামান্য পরিমানে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে এধরনের কোন তথ্য নেই বললেই চলে। বাংলাদেশে যে মুক্তা পাওয়া যায় তা প্রাকৃতিক ভাবে সংগৃহীত হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক উপায়ে সংগৃহীত মুক্তার কদর বিশ্ববাজারে রয়ে গেছে। তবে প্রাকৃতিক মুক্তার যোগান দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তাই প্রনোদিত উপায়ে মুক্তা চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে মাছ -চিংড়ি চাষের পাশাপাশি মুক্তার চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও তা মৎস্য চাষীদের কাছে সম্প্রসারনের মাধ্যমে দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ণে উপকৃত হবে এবং এর ফলে বাংলাদেশ মুক্তা রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে বিশ্বে স্থান করে নিতে পারবে। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে প্রনোদিত উপায়ে মুক্তা চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এর জন্য চাই সরকারের সুষ্ঠ নীতিমালা যার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে মুক্তা চাষের কর্মকান্ডকে সফলতার সহিত এগিয়ে নিতে হবে।

মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় রোগ প্রতিরোধ

কৃষিবিদ মো: আমিনুল ইসলাম
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার শাশ্বত তথ্য 'প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ শ্রেয়' এই ভিত্তিতেই মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মূলনীতি রোগ প্রতিরোধ। প্রতিরোধের পাশাপাশি মাছে রোগের প্রাদূর্ভাব দেখা দেওয়ার যথাশীঘ্র সম্ভব রোগ নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। পানিতে বসবাস করে বিধায় মাছের বিভিন্ন কার্যাবলী ও আচরণ সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা যায় না। এ কারণে নির্ভূলভাবে মাছের রোগ নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য। ফলে রোগ সংক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করাও অধিকতর কষ্টসাধ্য। আবার মাছের অনেক রোগই মাছকে খাদ্য প্রদানের পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট। একারণে মুখে ওষুধ খাওয়ানোর পদ্ধতি রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ততটা কার্যকরী হয় না। অন্যদিকে রোগাক্রান্ত মাছকে জীবাণুমুক্ত (dis-infect) করার জন্য কোন দ্রবণে ডুবানো বা গোসল করানোর পদ্ধতি বড় খামার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত নয়। এসব বিবেচনায় সুষ্ঠুভাবে মাছচাষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে রোগ প্রতিকারের চেয়ে রোগ প্রতিরোধই উত্তম।

সফলভাবে রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ-

১. সুস্থ-সবল পোনা মাছ মজুতকরণ
২. জলজ পরিবেশের গুণাবলী যথাযথ মাত্রায় সংরক্ষণ
৩. দুষণ নিয়ন্ত্রণ
৪. জলাশয়ের স্থান নির্বাচন
৫. সুষ্ঠু মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা
৬. নিয়মিত মনিটরিং এবং
৭. জলজ পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।

লাভজনকভিত্তিতে মাছ চাষের লক্ষ্যে চাষ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে রোগ প্রতিরোধের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। নিচে মাছের রোগ প্রতিরোধের কয়েকটি উপায় সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো।

পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ (Water Quality)

জলজ পরিবেশের বিভিন্ন গুণাবলী, যেমন- পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা, পি.এইচ, তাপমাত্রা, অ্যামোনিয়া, মুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড, মোট ক্ষারত্ব ইত্যাদি মাছের জীবনযাত্রায় নিয়ন্ত্রক হিসেবে ভূমিকা রাখে। এসব গুণাবলী কাঙ্খিত মাত্রার না হলে মাছ পরিবেশগত পীড়ণের শিকার হয় ও বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়। পানির বিভিন্ন ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলীর মাত্রা অনুকূল সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করে মাছকে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়। পানির বিভিন্ন গুণাবলীর অনুকূল মাত্রায় থাকলে মাছ সুষম হারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং মাছের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

মজুত ব্যবস্থাপনা (Rearing Management)

মাছের রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে পুকুরে ভাল পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। মাছের প্রজাতি সংমিশ্রণ এবং মজুদ ঘনত্ব অর্থাৎ পোনা ছাড়ার হার রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এজন্য মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে এমনভাবে পোনার প্রজাতি নির্বাচন করা উচিত যাতে সকল স্তরের প্রাকৃতিক খাদ্যের সদ্ব্যবহার হয়, কিন্তু বিভিন্ন প্রজাতির পোনার মধ্যে বাসস্থান ও খাদ্যের জন্য প্রতিযোগীতা হয় না। সতর্কতার সাথে পরিবহন, সুস্থ সবল পোনা মাছ সঠিক সংখ্যায় মজুতকরণ, নমুনায়নের সময় যত্নের সাথে মাছ নাড়া-চাড়া করা ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম মাছের রোগ প্রতিরোধের অন্যতম শর্ত।

খাদ্য প্রদান (Feeding)

অধিক উৎপাদনের জন্য পোনা মজুতের পর পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক খাদ্য গ্রহণে মাছের পূর্ণ পুষ্টিসাধন হয় না। মাছের পরিপূর্ণ পুষ্টিসাধনের লক্ষ্যে পুকুরে সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করতে হয়। সুষম খাদ্য গ্রহণে মাছ সুস্-

সবল থাকে এবং এতে মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এন্টিবায়োটিক যুক্ত সম্পূরক খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট রোগ প্রতিরোধ করা যায়। অতিরিক্ত খাদ্য বা সার প্রয়োগে পুকুরের পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে মাছে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং প্রকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে পরিমিত সার প্রয়োগ ও সুষম সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করে মাছের বিভিন্ন রোগ সহজেই প্রতিরোধ করা যায়।

পুকুর জীবাণুমুক্তকরণ (Pond Disinfection)

পুকুর শুকানো এবং রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে পুকুর জীবাণুমুক্ত করে সফলভাবে রোগ প্রতিরোধ করা যায়। পুকুর জীবাণুমুক্তকরণের লক্ষ্যে মাঘ-ফাল্গুন মাসে পুকুর শুকিয়ে ফেলে তলায় অতিরিক্ত কাদা থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। এরপর তলায় চাষ দিয়ে রোদে কয়েকদিন শুকাতে হবে। শুকনা পুকুরে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করলে তলার মাটি জীবাণুমুক্ত হয় এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। অতঃপর উক্ত পুকুরে যথানিয়মে মাছ চাষ করা হলে সাধারণত কোন রোগ-বালাই দেখা দেয় না। চুন প্রয়োগের মাত্রা মাটির পি.এইচ-এর ওপর ভিত্তি করে কম-বেশি হতে পারে।

মজুদ পুকুরে পোনামাছ ছাড়ায় ৪-৫ দিন পূর্বে নার্সারি বা চারা পোনার পুকুরে ০.২৫ পিপিএম হারে ম্যালাথিয়ন প্রয়োগ করে চাষকৃত মাছের পরজীবীঘটিত রোগ প্রতিরোধ করা যায়। এছাড়াও পোনা মজুদের সময় পুকুর প্রস্তুতকালে একবার এবং কার্তিক মাসে আরেকবার প্রতি শতকে ১কেজি হারে চুন প্রয়োগ করে মাছের জীবাণুঘটিত (pathogenic) প্রায় সব রোগই প্রতিরোধ করা যায়। আরগুলাসজাতীয় পরজীবীর সংক্রমণের শুরুতে পুকুরে ০.৫ পিপিএম হারে ডিপটারেক্স সপ্তাহান্তে ২বার প্রয়োগ করে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

উপকরণ জীবাণুমুক্তকরণ (Disinfection of Appliences)

মাছ চাষে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ, যেমন- পোনা পরিবহন পাত্র, হাপা, খাদ্য প্রদানের পাত্র, মাছ ধরার জাল বা বিভিন্ন সরঞ্জাম অনেক সময় রোগজীবাণু ও পরজীবীর বাহক হিসেবে কাজ করে। এসব উপকরণ এক জলাশয় হতে অন্য জলাশয়ে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সেগুলো ভালভাবে পরিস্কার ও জীবাণুমুক্ত করে নেয়া উচিত। সাধারণভাবে ৪০-৫০ পিপিএম মাত্রার ব্লিচিং পাউডার দ্রবণে এসব উপকরণ ৩০ মিনিট ডুবিয়ে রাখলে জীবাণুমুক্ত হয়। অতঃপর শুকিয়ে নিয়ে তা ব্যবহার করা যায়।

বিভিন্ন বয়সের মাছ পৃথকভাবে পালন (Seperation of year-class fish Population)

অন্যান্য প্রাণির ন্যায় জীবনচক্রের বিভিন্ন সময়ে মাছও কোন বিশেষ রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে, আবার কোন বিশেষ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। যেমন- অনেক সময় প্রজননক্ষম এবং বয়স্ক মাছ অনেক রোগজীবাণুর বাহক হিসেবে কাজ করে থাকে। কিন্তু এসব মাছ ঐসব রোগজীবাণুর কারণে রোগাক্রান্ত হয় না। ইতোপূর্বে মাছ ঐসব রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে দেহে উক্ত রোগের স্বাভাবিক প্রতিরোধক ব্যবস্থা (immune system) গড়ে ওঠে। ফলে মাছ উক্ত রোগজীবাণুর উত্তরজীবী (survivor)-তে পরিণত হয়। কিন্তু ঐসব রোগ জীবাণু অপেক্ষাকৃত কম বয়সের মাছ বা ভিন্ন বয়সগ্রুপের মাছে রোগের সংক্রমণ ঘটায়। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন বয়স গ্রুপের মাছকে আলাদা ভাবে পালন করে মাছের রোগ প্রতিরোধ করা যায়। এতে খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির মাছের মধ্যে সুষম প্রতিযোগিতা হয় বিধায় মাছের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

মরা বা রোগাক্রান্ত মুমূর্ষ মাছ অপসারণ (Removal of dead / Moribund Fish)

এক পোষক হতে অন্য পোষকে গমন বা স্থানান্তরের মাধ্যমে রোগজীবাণুর সংক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। রোগাক্রান্ত মরা মাছে বা মুমূর্ষ মাছে রোগজীবাণু দ্রুত বংশ বিস্তার করে। তাই মরা ও মুমূর্ষ মাছ পুকুর থেকে যথাশীঘ্র সম্ভব অপসারণ করে রোগ সংক্রমণের তীব্রতা হ্রাস করা যায়।

রাসায়নিক প্রতিরোধ (chemoprophylaxis)

বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য মাছকে খাইয়ে, রাসায়নিক দ্রবণে মাছকে ডুবিয়ে রেখে বা ঐসব রাসায়নিক দ্রব্য পুকুরে প্রয়োগ করে রোগ প্রতিরোধ করা যায়। নির্দিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্য রোগজীবাণু মেরে ফেলে বা পানির গুণাবলীর উন্নয়ন ঘটিয়ে রোগ প্রতিরোধ করে থাকে। মাছের রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে রোগের ধরন ও তীব্রতার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য বিভিন্ন মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ২-৩% সাধারণ লবণ দ্রবণ ব্যবহার করে অল্প ব্যয়ে এবং সহজেই বিভিন্ন ধরনের পরজীবী ও অণুজীবঘটিত রোগ প্রতিরোধ করা যায়। মাঝে মাঝে ২-৩ পিপিএম হারে পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট প্রয়োগ করে পুকুরের পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ানো যায় এবং এতে মাছের রোগ প্রতিরোধ হয়। নমুনায়ন বা অন্য কোন কারণে ধরা মাছ ৫০০-১০০০ পিপিএম পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট দ্রবণে কয়েক সেকেন্ড ডুবিয়ে রেখে পুকুরে ছাড়া হলে মাছের সাধারণ রোগ-বালাই প্রতিরোধ হয়।

শারীরবৃত্তীয় প্রতিরোধ সৃষ্টি (immunization)

কৃত্রিমভাবে শারীরিক প্রতিরোধক সৃষ্টি করে মাছের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা যায়। কোন কোন সংক্রামক রোগে ব্যাপকহারে মাছের মড়ক দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে শারীরবৃত্তীয় প্রতিরোধ সৃষ্টি করে রোগ প্রতিরোধ করা যায়। নিম্নোল্লোখিত কয়েকটি পদ্ধতিতে মাছে শারীরবৃত্তীয় প্রতিরোধক সৃষ্টি করা যায়। যথা-

১. নিমজ্জনের (immersion) মাধ্যমে
২. দ্রবণের ধারা দিয়ে (spary shower)
৩. ভাকসিন দিয়ে (vaccination)

সাধারণত মাছের ছোট পোনা (১-৪ গ্রাম) এবং রেণু নির্দিষ্ট রাসায়নিক দ্রবণে নিমজ্জনের মাধ্যমে মাছের অনেক সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা যায়। আঙ্গুলে পোনা দ্রবণের ধারা দিয়ে ইমুনাইজেশন করা হয়। ভাকসিনেশনের মাধ্যমে কার্পজাতীয় মাছের ব্যাকটেরিয়াজনিত কলামনারিস রোগ, রক্তক্ষরণ সেপটিকেমিয়া (Haemorhagic septicaemia) এবং ভাইরাসজনিত রোগ এসভিসি (SVC) সহজেই সফলভাবে প্রতিরোধ করা যায়। প্রজননে ব্যবহৃত পরিপক্ব মাছে ভাকসিন দিয়ে অনেক সংক্রামক রোগ খুবই সহজে প্রতিরোধ করা যায়। এতে পোনার শরীরে নির্দিষ্ট রোগের প্রতিরোধক সৃষ্টি হয় ও রোগ প্রতিরোধ হয়।

সংগনিরোধ (quarantine)

প্রতিটি প্রাণী তার ভৌগলিক অবস্থানে খাপ খাইয়ে নেয়। ভৌগলিক অবস্থান এবং জলাবায়ুগত ভিন্নতার কারণে কোন স্থানের সাধারণ রোগ অন্যস্থানে মহামারী হিসেবে দেখা দিতে পারে। দুরবর্তী ভিন্ন কোন জলাশয় বা ভিন্ন কোন দেশ হতে মাছের কোন প্রজাতি চাষের জন্য আনা হলে তা সরাসরি কোন পুকুর বা জলাশয়ে অন্য কোন মাছের সাথে ছাড়া উচিত নয়। আমদানীকৃত নতুন মাছ কোন সংক্রামক রোগের বাহক হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে চাষকৃত মাছে ব্যাপক মড়ক দেখা দিতে পারে। তাই দূরবর্তী কোন স্থান হতে বিশেষ করে ভিন্ন কোন দেশ হতে নতুন প্রজাতির কোন মাছ আমদানীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মাছকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংগনিরোধ ব্যবস্থায় রাখতে হবে। এতে উক্ত মাছে কোন লক্ষণ দেখা দিলে তা চাষের পুকুরে ছাড়া উচিত হবে না। সংগনিরোধ ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট মাছ কোন রোগে আক্রান্ত কিনা বা কোন রোগ জীবাণুর বাহক কিনা তা জানা যায়। এ প্রেক্ষিতে সংগনিরোধ ব্যবস্থা মাছের রোগ প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাছের রোগ প্রতিরোধে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গুলো অনুসরণ করা যেতে পারে ঃ

১. পুরাতন পুকুর প্রতি ৩ বছরে ন্যূনতম একবার শুকিয়ে ফেলতে হবে এবং তলায় অতিরিক্ত কাদা থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে ও যথাযথ মাত্রায় চুন প্রয়োগ করতে হবে।

২. সুস্থ-সবল পোনা সঠিক সংখ্যায় মজুদ করতে হবে এবং মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রজাতির আনুপাতিক হার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৩. পানির গুণাগুণ কাঙ্ক্ষিত মাত্রাসীমায় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং মাছকে পরিমিত পরিমাণে সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

৪. পুকুরের মাছ, বিশেষ করে পোনা ও কৈশোর অবস্থায় মাছের স্বাস্থ্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে; লক্ষ্য করতে হবে মাছে কোন রোগ দেখা দিয়েছে কিনা, কোন পরজীবী দেখা যায় কিনা?

৫. রোগ জীবাণু ও পরজীবীমুক্ত মাছ প্রজননের জন্য নির্বাচন করতে হবে। জীবনচক্রের কোন পর্যায়ে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত মাছ পরবর্তীতে পুরোপুরি সুস্থ হলেও তা প্রজননের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

৬. মাছ চাষের বিভিন্ন উপকরণ ভিন্ন ভিন্ন খামারে ব্যবহারের মধ্যবর্তী সময়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। পরিবেশগত পীড়ণ দূর করতে হবে। নমুনায়ন বা অন্য কোন কারণে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সর্তকতা ও যত্নের সাথে মাছ নাড়া-চাড়া করতে হবে।

৭. দুরবর্তী স্থানের বা ভিন্ন দেশের কোন মাছ মজুদ করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সংক্রমণ রোধ করার লক্ষ্যে উক্ত মাছকে সংগনিরোধ ব্যবস্থায় রাখতে হবে।

মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে বায়োটেকনোলজির ভূমিকা

প্রফেসর ডঃ মোঃ সাইফুদ্দিন শাহ
ফিশারিজ এন্ড মেরিণ রিসোর্স টেকনোলজি ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

বায়োটেকনোলজি প্রয়োগের রীতি বা কৌশল এবং যে প্রানির মধ্যে প্রয়োগ করা হবে তা বিবেচনা করলে বায়োটেকনোলজির বিভিন্ন রকম সংজ্ঞা হতে পারে। কোন বিশেষ জৈব পণ্যের উন্নয়নের নিমিত্ত কোন জীব বা তার অংশ বিশেষ যখন বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্য জীব দেহে প্রয়োগ করা হয় তখন তাকেই বায়োটেকনোলজি হিসাবে অভিহিত করা হয়। বর্তমান আলোচনায় মাছের ক্ষেত্রে যা বিধৃত তাকে আসলে কৌলী প্রকৌশল বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারীং বলা হয় এবং সাধারণ ভাবে তা বাংলাদেশে মাছ চাষ এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োগের সম্ভাবনার নিরিখে আলোকপাত করা হলো।

বায়োটেকনোলজির পন্থাগুলো আসলে এক একটি কৌশল যা দ্বারা ব্রুড মাছের মধ্যে কাংখিত বৈশিষ্ট্যর দ্রুত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয় কিংবা মুক্ত জলাশয়ের মাছে পপুলেশনের বৈশিষ্ট্যও কাংখিত পরিবর্তন ঘটিয়ে মুক্ত জলাশয়ে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সুবিধা সৃষ্টি করা যায়। মাছের জেনেটিক গুণাগুন উন্নয়নের জন্য প্রচলিতভাবে কিছু জেনেটিক সিলেকশন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। প্রচলিত এই সব পদ্ধতির মাধ্যমে ব্রুড মাছে সৃষ্ট উন্নয়ন, বায়োটেনোলজির প্রয়োগ জনিত উন্নয়নের থেকে অনেক আলাদা। যা হোক স্বতন্ত্র গুণাগুন দিক থেকে বায়োটেকনোলজির পন্থা সমুহ পৃথক হলেও এবং এসব কৌশল প্রয়োগ দ্বারা বিস্ময়কর ফলাফল লাভ সম্ভব হলেও এগুলো আসলে প্রচলিত জেনেটিক সিলেকশন পদ্ধতির দ্বারা প্রাপ্ত ফলাফল সমুহকে একেবারে ছাড়িয়ে গেছে এরকম ভাববার কোন অবকাশ নেই। বরং একথা ঠিক যে, জেনেটিক সিলেকশন পদ্ধতির মাধ্যমে ইতিমধ্যে পৃথিবীর নানা দেশে বিভিন্ন জাতে মাছের অনেক সুন্দর এবং বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয়েছে । ফলে এ কথা সত্যি যে প্রচলিত জেনেটিক সিলেকশন পদ্ধতি কিংবা বায়োটেকনোলজি প্রয়োগের দ্বারা মাছের মধ্যে কাংখিত উন্নয়ন আনতে হলে এ কথা আজ মানতে হবে যে এ দুটি পদ্ধতির মধ্যে একটি সার্বিক এবং সফল সমন্বয় প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রচলিত পদ্ধতির উপর পারদর্শিতা অর্জন ছাড়া আধুনিক বায়োটেকনোলজি বিষয়ে যে সব বিস্ময়কর ফলাফলের খবর আমরা শুনে থাকি তা আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে আমাদের মাছের মধ্যে ঘটানো কিছুতেই সম্ভব হবে না।

বায়োটেকনোলজির প্রয়োগ এবং প্রাণী হিসাবে মাছের উপযোগীতা

নানা বৈশিষ্ঠ্যগত দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় যে বায়োটেকনোলজি প্রয়োগের জন্য মাছ অন্যান্য প্রাণী থেকে বেশী উপযোগী। এ প্রেক্ষিতে মাছের সব থেকে ভাল উপযোগীতা হলো এর বাহ্যিক প্রজনন। মাছ পানিতে মুক্ত পরিবেশ প্রজনন করে অর্থাৎ স্ত্রী এবং পুরুষ গ্যামেটের মিলন ঘটে মাছের শরীরের বাইরে। বায়োটেকনোলজির বিভিন্নধর্মী প্রয়োগের জন্য মাছের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে প্রজনন ঘটানো প্রয়োজন হয়। মাছের মধ্যে প্রজনন বাহ্যিকভাবে হয়ে বলে স্ত্রী এবং পুরুষ গামেটকে সহজেই মাছের দেহের বাহিরে পাওয়া যায় এবং স্ত্রী ও পুরুষ গ্যামেটাকে পৃথক ভাবে নাড়া চাড়া করে তাদের উপর কাংখিত প্রভাব এবং প্রতিবেশ খাটানো সম্ভব হয়। তাছাড়া মাছ বেশি ডিম পাড়ে এবং অনেক প্রজাতির মাছের মধ্যে হরমোন অথবা পরিবেশের প্রভাব খাটিয়ে ডিম পাড়ানো আজ কাল আয়ত্ব আনা সম্ভব হয়েছে। মাছের ক্ষেত্রে বায়োটেকনোলজি প্রয়োগের দ্বিতীয় সুবিধা হলো মাছ ছাড়া অন্যান্য প্রাণী যেমন গরু, ছাগল মহিষ ভেড়া ইত্যাদি বৃহদাকারের প্রাণী লালন পালন করতে অপেক্ষাকৃত বেশি খরচ পড়ে অথচ তুলনামূলকভাবে অনেক কিছু স্বল্প পরিসর স্থানে কম খরচে এবং কম জনশক্তি অবলম্বনে অনেক সংখ্যক মাছ একত্রে চাষ করা য়ায়। এ কারনেই মৎস্য

প্রজাতি বিশেষ করে কিছু সংখ্যক ছোট মাছের প্রজাতি প্রাণী বিজ্ঞানে তথা বায়োটেকনোলজির জন্য আদর্শ গবেষণার বস্তু হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে।

ক্রোমোজোমের সংখ্যার উপর প্রভাব খাটানো সম্পর্কীত যে জৈব প্রযুক্তি অর্থাৎ মাছের প্লয়ড়ি সংখ্যা বাড়ানো বা কমানো কিংবা একক ভাবে মাতৃ কিংবা পিতৃকুল থেকে ক্রোমোজোমের সঞ্চালন ঘটিয়ে যখন সন্তান উৎপাদন করা হয়, মৎস্য কুলের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি সহজেই সহনীয় থাকে। অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম ম্যানুপুলেশন সম্পর্কীত বায়োটেকনোলজি প্রায়শই হয় না, ফলে এ পদ্ধতিতে উৎপাদিত সন্তানও বাঁচে না। এ দিক থেকেও গবেষণার বস্তু হিসাবে মাছ বাস্তবিকই বেশি উপযোগী।

জেনেটিক গবেষণা তথা কৃত্রিম কিংবা প্রাকৃতিক সিলেকশনের জন্য জীবকুলের জেনেটিক প্রকরণ সমূহকে জীবের জন্য কাঁচামাল বা রসদ হিসাবে অভিহিত করা চলে। এই জেনেটিক প্রকরণ সমূহ সাধারণভাবে চাষের কাজে নিয়োজিত পপুলেশন ঘনিষ্ট প্রজননের ফলে অনায়াসে লোপ পায়, যাকে আন্ত প্রজনন বা ইনব্রিডিং বলা হয়। এ বিষয় বিশদ আলোচনা এ অংশে সম্ভব নয়। যাহোক, মৎস্য কুলের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে স্বাভাবিক সুবিধা এই যে, চাষ কাজে নিয়োজিত সকল প্রজাতির মাছের পপুলেশনই প্রাকৃতিক জলাশয়ে পাওয়া যায়। ফলে, চাষে নিয়োজিত পপুলেশনের ক্ষেত্রে এ রূপ ঘাটতি পূরণ যত সহজে সম্ভব অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে তা সহজে নয়।

মাছে ব্যবহৃত বায়োটেকনোলজির পন্থা সমূহ

মাছের যৌনতা পরিবর্তন

বাজারের চাহিদা এবং মুক্ত জলাশয়ের ব্যবস্থাপনার সুবিধার উপর বিবেচনা করে কেবল স্ত্রী কিংবা পুরুষ যে কোন একটি যৌনের মাছ উৎপাদন করা যায়। বাজারে অনেক সময়েই ক্রেতা সাধারণ হয়তো কেবল পুরুষ মাছ কিংবা কেবল স্ত্রী মাছ কিনতে বেশি পছন্দ করেন। ইলিশ অথবা রুই জাতীয় মাছের বেলায় ডিম ছাড়া মাছ কিনতে ক্রেতারা বেশি আগ্রহী কারণ ডিমওয়ালা মাছ খেতে কম সুস্বাদু। অবার প্রজনন মৌসুমে ডিম ওয়ালা টেংরা, পাবদা পুটি ইত্যাদি ছোট ছোট মাছ কিনতে অনেকেই আগ্রহী দেখা যায়। ঠিক তেমনি বিদেশেও শ্যালমন মাছের ডিম ক্রেতারা ভীষণ পছন্দ করে তেমনি কৃষ্ণ সাগরীয় অঞ্চলে বিশেষ করে ইরান ও তুরস্কে ষ্টারজিয়ন নামক একটি মাছের ডিম উৎপাদনের উপর গুরুত্বপূর্ন বাণিজ্য গড়ে উঠেছে।

অতি অল্প খরচে এবং অপেক্ষাকৃত সহজ পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে মাছের যৌন পরিবর্তন করা যায়। মাছ প্রজননের পর নিষিক্ত ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়ে এলে ডিম তা শেষ হবার পর থেকে কেজি প্রতি ৬ লি.ঃ গ্রাঃ হারে ১৭ -আলফা- মিথাইলটেস্টোসটারন হরমোন মিশ্রিত খাদ্য পোনা মাছকে এক নাগারে ৬০ দিন খাওয়ালে সব মাছ পুরুষে রূপান্তরিত হয়। আবার কেজি প্রতি ২০ লিঃ গ্রাঃ হারে ১৭-বেটা এস্ট্রাডিওল হরমোন মিশ্রিত খাদ্য পোনা মাছকে এক নাগারে ৪০-৬০ দিন খাওয়ালে সব মাছ স্ত্রী মাছে রুপান্তরিত হয়। জন্মের ঐ বয়সে একটি মাছ পুরুষ হবে নাকি স্ত্রী হবে তা অনির্ধারিত থাকে, ফলে স্ত্রী কিংবা কোনো এক জাতীয় হরমোন প্রয়োগ করলে মাছ সেই যৌনতা প্রাপ্ত হয়।

চাষের ক্ষেত্রে অনাকাংখিত প্রজনন ঠেকানোর জন্য পুকুরে কেবল এক যৌনের মাছ মজুদ করা যায়। তেলাপিয়ার চাষ এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। স্ত্রী ও পুরুষ তেলাপিয়া একত্রে এক পুকুরে চাষ করলে অতিদ্রুত প্রজননের কারণে পুকুরে মাছের সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পায় এবং শীঘ্রই ছোট মাছে পুকুর ভরে গিয়ে চাষ কাজ মারত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। এ ক্ষেত্রে কেবল এক যৌনের তেলাপিয়া মাছ চাষ করলে প্রজনন ঠেকানো সম্ভব হয়। তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু পুরুষ তেলাপিয়া স্ত্রীদের চেয়ে দ্রুত বাড়ে তাই পুরুষ তেলাপিয়ার চাষ পৃথিবীর নানা দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

মজুদকৃত মাছের পপুলেশনে প্রজনন ঠেকিয়ে মুক্ত জলাশয়ের সফল ব্যবস্থাপনার জন্যও এক যৌনের মাছ চাষ করার উদাহরন পৃথিবীর নানা দেশে দেখা যায়। হরমোন মিশ্রিত খাদ্য খাইয়ে যৌন রুপান্তরিত মাছ বাজারজাত করতে অনেক ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা সৃষ্টি হতে পারে। আজকাল কার স্বাস্থ্য সচেতন সমাজে মানুষ তাদের শরীরে মাছের দেহে হরমোনের অবশিষ্টাংশের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়তে পারে, ফলে উক্ত প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট মাছ সহজেই বাজার হারাতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে মৎস্য চাষী প্রভূত ক্ষতির সম্মখীন হতে পারে। কারণ পরীক্ষায় যদিও দেখা গেছে যে মাছের দেহের যে পরিমাণ হরমোন অবশিষ্ট থাকে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য তা

কোনক্রমেই হুমকি নয়। তথাপি প্রচার মাধ্যমে বাড়াবাড়ির ফলে ক্রেতা সাধারণ সহজেই প্রভাবিত হতে পারে এবং বাজারে প্রবল মন্দাভাব সৃষ্টি করতে পারে।

এ সমস্যাকে অতিক্রম করার জন্য হরমোন জনিত যৌনতা পরিবর্তন পদ্ধতির সাথে মাছের ক্রোমোজোম ম্যানুপুলেশন বায়োটেকনোলজি সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। অথার্ৎ মাছের যৌন ক্রোমোজেমের উপর নির্ভর করে মাছের যৌনতা নির্ধারণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে পুবাহ্নে ধারনা লাভ করে হরমোণ সৃষ্ট এক যৌনের মাছকে ব্রুড মাছ হিসাবে ব্যবহার করা যায় এবং সে ভাবে তাদের থেকে পুরুষ কিংবা স্ত্রী পোনা মাছ উৎপন্ন করা যায় এবং চাষের জন্য কিংবা মুক্ত জলাশয় মজুদের জন্য ব্যবহার করা যায়। এ পদ্ধতি খাটিয়ে তেলাপিয়া সুপার **YY** পুরুষ তেলাপিয়া তৈরি করা হয়েছে যা ব্রুড হিসাবে ব্যবস্থা করে প্রত্যেক বংশে ১০০% পুরুষ পোনা মাছ তৈরি সম্ভব হচ্ছে। একক যৌনের মাছ চাষের ক্ষেত্রে এটি এক নব দিগন্তর সূচনা করেছে। পদ্ধতিটি নিম্নরূপ :

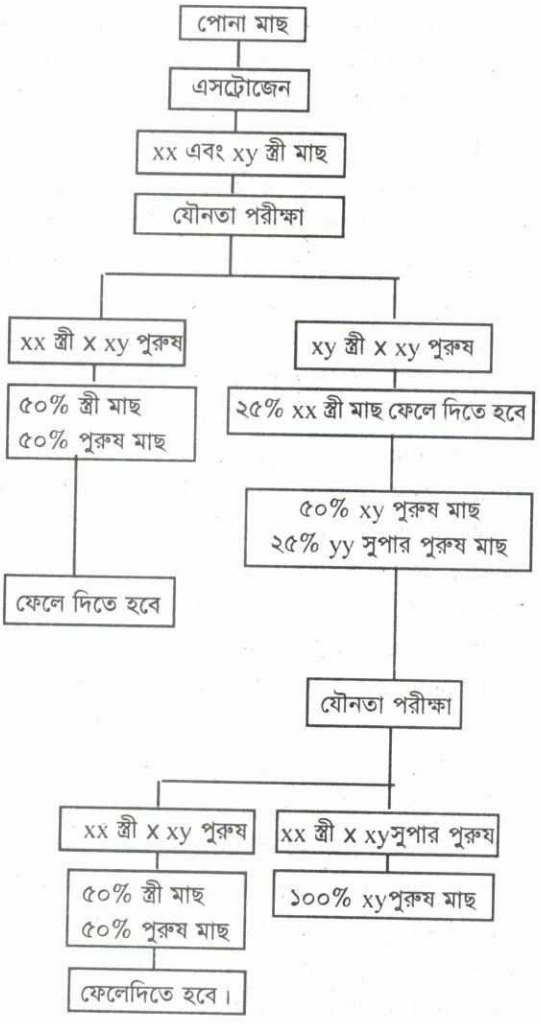

ছবিঃ yy সুপার পুরুষ তেলাপিয়া তৈরী এবং ১০০% পুরুষ পোনা মাছ তৈরীর নকশা

মাছের ক্রোমোজোম ম্যানুপুলেশন বায়েটেকনোলজি

আগেই বলা হয়েছে মাছে প্রজনন যেহেতু দেহের বাইরে সংগঠিত হয় সেহেতু স্ত্রী এবং পুরুষ গামেটকে পৃথক ভাবে নাড়া চাড়া করা সম্ভব হয়। মাছের ক্রোমযমের ম্যানুপুলেশন এ কারণেই সম্ভব যে, জনন কোষের বিভাজনের সময় ক্রোমোজোম সমুহ বিশেষ বৈশিষ্টপূর্ন নড়া চড়ার মাধ্যমে বিভাজন ক্রিয়া সম্পন্ন করে। এ প্রক্রিয়ার ঠান্ডা কিংবা গরমের তাপ , উচ্চ চাপ অথবা নানা রকম রাসায়ণিক দ্রব্যের প্রভাব দ্বারা উৎপন্ন জাইগটে জনন কোষের দ্বিতীয় পোলার বডিস্থ হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজিয়ামের যোগ কিংবা বিয়োগ ঘটিয়ে কাংখিত **ম্যানুপুলেশন** সৃষ্টি করা হয়।

এভাবে ডিম নিষিক্ত হবার পর উৎপাদিত জাইগটে কত পরে সেই তাপ চাপ অথবা রাসায়নিক প্রভাব প্রয়োগ করা হবে তার উপর নির্ভর করে ট্রিপ্লয়েড **(3n** অথবা টেট্রাপ্লয়েড **4n)**মাছ উৎপন্ন করা সম্ভব। ডিম নিষিক্তকরন অব্যবহিত পরে যদি জাইগটে প্রভাব খাটানো হয় তবে দ্বিতীয়-পোলার-বডিস্থ হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম গুচ্ছ কে জাইগটের মধ্যে আটকানো যায় এবং তাতে ট্রিপ্লয়েড মাছ উৎপন্ন হয়। আর যদি অপেক্ষাকৃত একটু দেরিতে প্রভাব প্রয়োগ করা হয়, তবে ততক্ষনে দ্বিতীয়-পোলার-বডিস্থ হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম গুচ্ছ জাইগট থেকে বেরিয়ে যাবে এবং হ্যাপ্লয়েড ডিম ক্রোমোজোমের প্রথম দেহকোষীর বিভাজন থামিয়ে দেয়া সম্ভব হবে, ফলে উৎপাদিত মাছে ৪ জোড়া হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম গুচ্ছ পাওয়া যাবে এবং সেসব মাছকে টেট্রাপ্লয়েড মাছ বলা হবে। আবার টেট্রাপ্লয়েড মাছ হ্যাচারিতে মজুদ থাকলে তাদেরকে ব্রুড হিসাবে ব্যবহার করে সাধারণ ডিপ্লয়েড মাছের সাথে প্রজনন ঘটিয়ে প্রতি বংশে ট্রিপ্লয়েড মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। এটি এ কারনেই সম্ভব যে, টেট্রাপ্লয়েড মাছে যে ডিম বা শুক্র তৈরী হবে তাতে যথারীতি দুই প্রস্থ হ্যাপ্লয়েড

ক্রমোজোম বিদ্যমান থাকবে ফলে তার সাথে একটি সাধারণ ডিপ্লয়েড মাছের হ্যাপ্লয়েড ডিম বা শুক্রের মিলন ঘটলে তা দ্বারা সৃষ্ট মাছ এমনিতেই ট্রিপ্লয়েড মাছ হিসাবে উৎপন্ন হবে।

ট্রিপ্লয়েড মাছ প্রধানত তিনটি কারণে উৎপাদন করা হয়। প্রাথমিকভাবে অন্ততঃ তাত্ত্বিকভাবে হলেও ট্রিপ্লয়েড মাছের বাড়নের হার বেশি আশা করা হয়। ট্রিপ্লয়েড মাছে তিন প্রস্থ সমসত্ব ক্রোমোজোম বিদ্যমান থাকায় বয়ঃ প্রাপ্তিতে এদের মধ্যে জনন কোষের বিভাজনে সমস্যা সৃষ্টি হয়। এর ফলে কার্যকর স্ত্রী কিংবা পুরুষ গামেট তৈরি হয়না ফলে প্রজনন ক্ষমতা ও থাকেনা। এ কারনে ট্রিপ্লয়েড মাছ বন্ধা হয়ে থাকে। ট্রিপ্লয়েট মাছ বন্ধা হওয়ার ফলে যেহেতু জনন কোষের বিভাজন তথা প্রজনন সংশ্লিষ্ট শরীরবৃত্তিয় কাজে তাদের শক্তি ব্যয় করতে হয় না, তারা সহজেই সেই শক্তি দেহ গঠন তথা দ্রুত বাড়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারে। বিভিন্ন প্রজাতির মাছের ক্ষেত্রে ট্রিপ্লয়েড মাছের বর্ধনের উপর পরীক্ষা মূলক গবেষণায় তাদের দ্রুত বর্ধনের বিষয়ে সিদ্ধান্তধর্মী ফলাফল পাওয়া যায়নি।

ট্রিপ্লয়েড মাছের বন্ধাত্যকে চাষের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায়। যে সব প্রজাতিতে অনাকাংখিত প্রজনন ঘটে অর্থাৎ বেশী প্রজননই সে সব প্রজাতির বেলায় সমস্যা সৃষ্টি করে তাদের বেলায় ট্রিপ্লয়েড মাছ চাষ করলে চাষের ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়। যেমন তেলাপিয়া মাছে অধিক প্রজননের জন্য সমস্যা দেখা দেয়, ফলে ট্রিপ্লয়েড তেলাপিয়া চাষ করলে সজেই উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়।

এছাড়া আন্ত প্রজাতি সংকরায়নের ক্ষেত্রে ট্রিপ্লয়েড তৈরীর পদ্ধতি কাজে লাগানো যায় এবং দেখা গেছে এতে শংকর মাছের বাচার এবং বর্ধনের হার উল্লেখযোগ্য পরিমানে বেড়ে যায়। ব্যাপারটি এরকম যে, ভিন্ন দুইটি প্রজাতির স্ত্রী এবং পুরুষ গ্যামেটের নিষিক্ত করনের পর একই পদ্ধতিতে ঠান্ডা, গরমের তাপ, চাপ কিংবা রাসায়নিক প্রভাব প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের দেশী মাগুর এবং আফ্রিকান মাগুরের সংকরকে ট্রিপ্লয়েড করলে তাদের গুনাগুন নিশ্চিতভাবে বাড়ানো সম্ভব হবে বলে ধারনা করা যায়।

টেট্রাপ্লয়েড মাছের বাড়নের হারও তেমনি স্বভাবতই বেশি মনে করা হয়। টেট্রাপ্লয়েড মাছে যেহেতু ৪ প্রস্থ সমসত্ত্ব ক্রোমোজোম বিদ্যমান থাকে, শারীরবৃত্তিয় বিবেচনায় তারা স্বাভাবিক মাছ থেকে এমনিতেই বড় আকারের হবে বলে আশা করা যায়। এ ছাড়া পূর্বের পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে ট্রিপ্লয়েড পিতা মাতা থেকে অতি সহজেই ট্রিপ্লয়েড মাছ উৎপাদন করা যায়।

গাইনোজেনেটিক মাছ উৎপাদন কৌশল

গাইনোজেনেটিক মাছ উৎপাদনের কৌশল ট্রিপ্লয়েড মাছ উৎপাদনের মতই একটি কৌশল। কেবল এটুকু তফৎ যে গাইনোজিনেটিক প্রক্রিয়ায় নিষিক্তকরণের কাজে ব্যবহৃত শুক্রগুলোকে নির্ধারিত মাত্রায় আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি দ্বারা রেডিয়েট করতে হবে। ঐ রূপ রেডিয়েট করা শুক্র দ্বারা নিষিক্ত ডিমের পর পরই ঠান্ডা বা গরমের তাপ, চাপ অথবা রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাব প্রয়োগ করতে হবে। এ প্রকৃয়ায় যা ঘটে সেটি হলো আল্ট্রা বায়োলেট রশ্মি দ্বারা রেডিয়েট করা শুক্রের মধ্যস্থ ডি, এন, এ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যায় ফলে এ রূপ শুক্র নিষিক্ত করনের কাজ শুরু করতে পারলেও এ ক্ষেত্রে শুক্র এবং ডিমের মধ্যেকার জেনিটিক বৈশিষ্টের আদান প্রদান সংঘটিত হয় না। ফলে, ঐ ডিমের মধ্যে কেবল মাতৃকূলের হ্যাপ্লয়েড নিইক্লিয়াসটিই বর্তমান থাকে। এ পর্যায়ে ঐ ডিমের উপর প্রভাব প্রয়োগ করলে ডিমের তখনো অবস্থিত দ্বিতীয় পোলার বড়িসস্থ হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম গুচ্ছ আর অপসৃত হতে পারে না এবং তা ডিমের মধ্যে আটকে গিয়ে ডিমে দুই প্রস্থ সমসত্ত্ব ক্রোমোজোম গুচ্ছের সৃষ্টি করে।

একই প্রক্রিয়ায় যদি শুক্রের উপর আল্ট্রাভায়েলেট রশ্মি প্রয়োগ না করে ডিমের উপর প্রয়োগ করা হয় এবং তা থেকে মাছ উৎপন্ন করা হয় তবে তাকে এনড্রোজিনেটিক মাছ বলা হয়। গাইনোজেনিটিক এবং এড্রোজেনেটিক মাছ নানারকম জেনেটিক পরীক্ষা এবং বানিজ্যিক উৎপাদন এই দুই ভিত্তিতেই উৎপন্ন করা হয়। উৎপন্ন জাইগটে দুই প্রস্থ সমসত্ত্ব ক্রোমোজোমের সমাবেশ দ্বিতীয় পোলার বডিস্থ ক্রোমোজোম থেকে সঞ্চালিত নাকি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের প্রথম দেহকোষীও বিভাজন ঠেকিয়ে করা হয় তার উপর নির্ভর করে সৃষ্ট মাছে জেনিটিক সাদৃস্য কত বেশী হবে অথবা কম হবে। যদি প্রথম দেহকোষীও বিভাজন ঠেকিয়ে মাছের ডিপ্লয়েড অবস্থা সৃষ্টি করা হয় তবে তা দ্বিতীয়-পোলার-বডিস্থ হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম আটকিয়ে সৃষ্ট ডিপ্লয়েড মাছের সাদৃস্য থেকে অনেক অনেক কম হয়।

পথম দেহকোষীও বিভাজন ঠেকিয়ে সৃষ্ট ডিপ্লয়েড মাছের জেনেটিক গুনাগুনের সাদৃস্যতা ১০০% অভিন্ন হয়। এরুপ মাছকে মাইটোটিক গাইনোজেন বলাহয় এবং সৃষ্ট মাছকে বায়োটেকনোলজির ভাষায় ক্লোন (**Clone**) মাছ বলা হয়।

গাইনোজেনেটিক এবং এন্ড্রোজেনেটিক প্রকৃয়ার দ্বারা মাছের লিংঙ্গ নির্ধারণ প্রকৃয়া বিষয়ে পরীক্ষা করা যায়। যেহেতু এটি একটি নিবিড় আন্ত প্রজনন প্রকৃয়া; মিউটেশন প্রজনন কার্যক্রমে এ প্রজনন পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে পপুলেশন মধ্য থেকে অতি বিরল মিউটেন্ট জিন সহজে খুঁজে বের করা যায়। এ ছাড়া জিন মানচিত্র তৈরির কাজেও গাইজেনিটিক প্রজনন পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়।

জিন ট্রান্সফার বায়োটেকনোলজি

এটি একটি নীরেট মলিকুলার কৌশল যেখানে এক বা একাধিক জিন, এক জীব থেকে অন্য জীবে স্থানান্তর করা হয়। এ প্রকৃয়ায় যে জিন বা জিন সমূহকে স্থানান্তর করা হয় অর্থাৎ যে দাতা প্রানী থেকে জিন বা জিন সমূহ নেয়া হয় সে জিন বা জিন সমূহকে আগে তাদের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিশদভাবে জানতে হয়। সম্পূর্ন জানা হলে তখনই কেবল তা পৃথক করে নিয়ে অন্য একটি কাংখিত জীবে প্রবেশ করানো হয়।

এ পদ্ধতিতে দাতা প্রজাতি থেকে কাংখিত জিনকে রেস্ট্রিকসন এনজাইম ব্যবহার করে কেটে এনে তা ব্যাকটেরিয়াস্থ প্লাজমিড-এর মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। তারপর লাইগেজ নামক এনজাইম ব্যবহার করে প্লর্জমিডের ডি, এন, এ এর সাথে প্রবেশ করানো জিনের জোড়া লাগানো হয়। ঐ জিনসহ প্লাজমিডকে তখন ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে আবারো প্রবেশ করানো হয় এরপর ঐ ব্যাকটেরিয়ার চাষ করা হয়। এভাবে চাষের ফলে যথন বিপুল সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া উৎপন্ন হয় তখন ঐ সব বাকটেরিয়া পরীক্ষাগারে মেরে ফেলে প্লাজমিডগুলোকে আলাদা করা হয় এবং প্লাজমিড মধ্যস্ত জিনের কপি গুলোকে উদ্ধার করা হয়। পরবর্তী পদক্ষেপে কাংখিত কোন মাছের ডিমের মধ্যে ঐ সব জিনের কপির প্রবেশ ঘটানো হয় এবং আশা করা হয় যে ঐ মাছের ক্রোমোজেমের মধ্যে প্রবেশ ঘটানো জিন মিশে যাবে এবং প্রতি বংশে তা সঞ্চালিত হতে থাকবে। প্রবেশ করানো জিন একবার সঞ্চালিত হতে থাকলেই জিনট্রান্সফার সার্থক হয়েছে বুঝতে হবে, যদিও উল্লেখিত প্রত্যক পর্যায়ে নানা প্রতিকুলতা সৃষ্টি হতে পারে কেননা পুরো বিষয়টি আসলে অত্যন্ত জটিল এবং ব্যয় বহুল। উন্নত বিশ্বে এ ক্ষেত্রে কিছু সাফল্য অর্জিত হলেও বানিজ্যিক ভিত্তিতে এর প্রচলন শুরু হয়েছে বলে জানা যায়নি। বাংলাদেশে দুর ভবিষ্যতে এ পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে মৎস্য চাষ উন্নয়নের সম্ভাবনাকে একবারে কি উড়িয়ে দেয়া যায়?

বেকার সমস্যা সমাধানে মাছ চাষ

কৃষিবিদ মোঃ মাহমুদল হক
মৎস্য অধিদপ্তর, শরীয়তপুর

জনবহুল বাংলাদেশে প্রচুর সংখ্যক বেকার রয়েছে। শুধুমাত্র সরকারি প্রয়াসে কোন দেশে কোন কালেই বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তবে সরকারি নীতির প্রয়াসে বেকার সমস্যা সমাধানের পথ প্রসস্থ হতে পারে। এ'ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগ ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। তা ছাড়া চিহ্নিত ক্ষেত্রে যেমন মাছ চাষে যদি বেকারগণ স্বউদ্যোগে আত্মকর্মসংস্থানের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাতেও তারা সফলকাম হবেন বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যায়। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন তা হলো- জলাশয় ব্যবহারের সুযোগ, পুঁজি সরবরাহ, অল্প বিনিয়োগে বেশি মুনাফার ক্ষেত্র নির্বাচন, বাজারজাতকরণ সুবিধা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের মাছ চাষ মূলত অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় ভিত্তিক। বর্তমানে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পরিমাণ ৪৩ লক্ষ ৩৮ হাজার হেক্টর। তাতে মাছ চাষের যে কার্যক্রমগুলো জড়িত তাহলো - (১) উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ, (২) বাওড়ে মাছ চাষ এবং (৩) পুকুর-দীঘিতে মাছ চাষ। উপকূলীয় চিংড়ি চাষ অঞ্চলে ১ লক্ষ ৪০ হাজার হেক্টর জলাশয়ের বাগদা চিংড়ি চাষ কার্যক্রমের সাথে বিপুল সংখ্যক জনশক্তি জড়িত হতে পারেন। এ ক্ষেত্রে চিংড়ির প্রাকৃতিক পোনা আহরণ, হ্যাচারি-নার্সারি ব্যবস্থাপনা, ঘের ব্যবস্থাপনা, চিংড়ি আহরণ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ থেকে রপ্তানি কার্যক্রম পর্যন্ত বিষয়াদিতে বেকারগণ ব্যাপক অবদান রাখতে পারেন। তাছাড়া বাংলাদেশে বর্তমানে চিংড়ি চাষ কার্যক্রম সনাতন পদ্ধতির তাতে হেক্টর প্রতি উৎপাদন মাত্র ১৫০-২০০কেজি। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার জনগণকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করে এ উৎপাদন হার বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। বাওড় এ বর্তমানে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন মাত্র ৪০১ কেজি। এ ক্ষেত্রে বেকার জনগণকে সংগঠিত করে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে বাওড়ে মাছ চাষের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি উৎপাদন আরো বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। বাংলাদেশে পুকুরদিঘীর জলায়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার হেক্টর। এসব জলাশয়ের মধ্যে -৭৬ হাজার হেক্টর চাষাধীন; ৪৫ হাজার হেক্টর চাষযোগ্য এবং ২৬ হাজার হেক্টর পতিত জলাশয় রয়েছে। বদ্ধ জলাশয় থেকে গড়ে হেক্টর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র ১,৫১৫ কেজি যা অনায়াসেই ৩,০০০-৪,০০০ কেজিতে উন্নীত করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রেও বেকার জনগণকে সংগঠিত করে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে পুকুর-দিঘী ব্যবস্থাপনার কাজে লাগিয়ে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাগানো যেতে পারে। তা ছাড়া পতিত ও চাষযোগ্য জলাশয় সংস্কার করে বেকারগণকে কাজে লাগিয়ে অধিক পরিমাণ জলাশয় মাছ চাষের আওতায় আনায়ন করা যেতে পারে।

মাছ চাষের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন জলাশয়। অথচ বেকারদের অনেকেরই জলাশয় নেই, যদিও দেশের আনাচে-কানাচে প্রচুর জলাশয় অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। তা ছাড়া তাদের প্রশিক্ষণ এবং পুঁজির অভাবও তাদেরকে স্বউদ্যোগে মাছ চাষের পথে বাধা হয়ে আছে।

মাছ চাষের মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু চিহ্নিত সমস্যা সমাধান করা প্রয়োজন। এসব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে বেকার জনগোষ্ঠীকে মাছ চাষে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। যেমন-

ক. পতিত পুকুর-দিঘী বাধ্যতামূলকভাবে মাছ চাষের আওতায় আনয়নের জন্য পুকুর উন্নয়ন আইন, ১৯৩৯-এর আওতায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ জন্যে জলাশয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকারগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা যেতে পারে।

খ. পতিত পুকুর-দিঘী সরকারের নিজস্ব সম্পদের মাধ্যমে উন্নয়ন করে পার্শ্ববর্তী সংগঠিত বেকারগণকে মাছ চাষের সুযোগ প্রদান করা যেতে পারে। বেকারগণকে

সংগঠিত করার ক্ষেত্রে এন.জি.ও প্রতিষ্ঠান ভূমিকা রাখতে পারে।

গ. সরকারি জলাশয়ের প্রাপ্যতা ও ব্যবহারের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে জলাশয়ের পার্শ্ববর্তী বেকার জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে কমপক্ষে ৫ থেকে ৭ বৎসরের জন্য জৈবিক ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক ইজারা প্রদান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য হতে পারে স্বল্প ইজারা মূল্যের বিনিময়ে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

ঘ. প্রশিক্ষণের অভাব মাছ চাষের একটা বড় অন্তরায়। বেকার জনগণকে মাছ চাষে ব্যাপক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করা যেতে পারে।

ঙ. ব্যক্তিগত পুঁজি স্বল্পতা মাছ চাষে একটি চিহ্নিত বাধা। আর মাছ চাষের জন্য প্রয়োজন মূলত ক্ষুদ্র ঋণ। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ব্যাংকিং সেক্টর এসব ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। কাজেই বেকারদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ভিন্নতর কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

চ. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকারগণকে ছোট ছোট গৃহাংগন চিংড়ির হ্যাচারি স্থাপনে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। তাতে চিংড়ির বাজার মূল্য অধিক হওয়ার কারনে এক্ষেত্র থেকে বর্ধিত হারে আয় বাড়ানো সম্ভব হবে।

ছ. দেশে এখনও চিংড়ি/ মাছের সসম্পূরক খাদ্যের ঘাটতি রয়েছে। এক্ষেত্রে বেকারগণকে এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহ প্রদান করা যেতে পারে।

এভাবে জলাশয় ব্যবহারের সুযোগ প্রদান, প্রশিক্ষণদান এবং পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে বেকার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে মাছ চাষের মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য অত্যন্ত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

অভিনন্দন

মৎস্য সপ্তাহ / ৯৯

মেসার্স রশিদ ফিস পিটুইটারী-ইন্ডাস্ট্রী কঠোর মান নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে দীর্ঘ ১৩ বৎসর যাবত নিরলসভাবে দেশের মৎস রেনু উৎপাদনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আসছে। মৎস'রেনু উৎপাদনে আমাদের অবদান

(১) ড্রাই পি. জি
১ গ্রাম ও
১/২ গ্রাম

(২) H.C.G
৫০০০ I/U

(৩) ওভাক্লিন
একবার প্রয়োগ
১০,০০০ I/U
এবং ২০,০০০ I/U

প্রত্যেক প্রকার ঔষধের সঙ্গে ব্যবহার বিধি অনুসারন করে সুফল ভোগ করুন।

প্রাপ্তিস্থান

১। **হেড অফিস ঃ** ফোন (০৪২১) ৩৯০৫
মেসার্স রশিদ ফিস পিটুইটারী ইন্ডাস্ট্রী
পুলের হাট, বেনাপোল রোড, যশোর।
বিসিক অনুমোদিত ; রেজিঃ - ৩৫৪/৯৪/১৬১।
২। পূর্ণমনি এন্টারপ্রাইজ
মাসকান্দা, ময়মনসিংহ। ফোন নং- ৫৪১৫৮
৩। মোঃ শাহাজান মিয়া
ধলা বাজার, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
৪। কন্টাক্টর হাজী মোঃ আব্দুল ওহাব
৮১/৩ শুক্রবাদ - ঢাকা।
ফোন ঃ ৯১৩১৬৯২
৫। শ্রী বিশ্বনাথ সরকার
শাহাপুর, শান্তাহার, নওগা রোড, বগুড়া।
৬। কল্পতরু মৎস হ্যাচারী
প্রোঃ ডাঃ সুলতান আহম্মেদ (M. B. B. S)
কোম্পানীগঞ্জ, কুমিল্লা।
৭। মোঃ মফিজ মজুমদার
রায়পুর, লক্ষিপুর।
৮। আলমদিনা মৎস হ্যাচারী, তেমুহনী
মহিপাল, ফেনী। ফোন নং- ৭৩৬৬৫
৯। নবীন মৎস হ্যাচারী
প্রোঃ মোঃ মোস্তফা মিয়া,
রেল ষ্টেশন গেট, নাটোর। ফোন নং- ৬৬৮৩

স্থায়ীত্বশীল প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ দক্ষতার উন্নয়ন

কৃষিবিদ হুমায়ুন কবির
এলান ব্রুক্স
ফেরদৌস পারভীন
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

কোন প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদের কর্ম দক্ষতার উন্নয়ন ও জোরদারকরণের জন্যে প্রয়োজন সে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রশিক্ষণ দল। যদি ঐ প্রতিষ্ঠানে সম্প্রসারণ বিষয়ক কার্যক্রম থাকে তবে সে ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক দলের ভূমিকা থাকবে অপরিসীম। কারন মাঠ পর্যায়ের জনবলের সম্প্রসারণ, যোগাযোগ ও কারিগরী দক্ষতার উন্নয়ন করা একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। এ কাজগুলো পেশাদার প্রশিক্ষক ছাড়া পরিপূর্ণভাবে করা যায় না। যা ঐ প্রতিষ্ঠানের জনবল উন্নয়ন কার্যক্রমের স্থায়ীত্বশীলতার প্রভাব ফেলে।

স্থায়ীত্বশীল দক্ষ জনবল উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করা যায় প্রশিক্ষণের একটি মূল দল গঠন ও উন্নয়নের মাধ্যমে। যাদের মূল দায়িত্ব থাকবে উপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জনবলের প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ দক্ষতার উন্নয়ন করা।

এ ধরণের প্রশিক্ষক দলটি হওয়া উচিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভিত্তিক। কারন প্রয়োজনীয় অর্থ প্রাপ্তিতে যখন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে তখন আমন্ত্রিত বা অন্য পদবীর প্রশিক্ষকদের দ্বারা গুনগত প্রশিক্ষণ নাও হতে পারে। বর্তমানে মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রভিত্তিক তেমন কোন প্রশিক্ষক দল না থাকায়, মৎস্য অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন ও যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগের (Department for International Development) সাহায্যপুষ্ট মৎস্য প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ প্রকল্প, দ্বিতীয় পর্যায় (Fisheries Training and Extension Project - II এর ক্ষেত্রে থানা মৎস্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে বিশেষজ্ঞ দল উন্নয়নের জন্যে নির্বাচিত করা হয়েছে। যারা হবেন মৎস্য অধিদপ্তরের নিজস্ব ও বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক।

বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক দল উন্নয়ন

এফটিইপি-২ এর মুল প্রশিক্ষক দলটি বিভাগীয় প্রশিক্ষক দল (Divisional Training Team) হিসেবে পরিচিত যার সদস্যরা সকলেই থানা মৎস্য কর্মকর্তা। এফটিইপি-১ এর 'থানা মৎস্য কর্মকর্তা উন্নয়ন কর্মসূচীর" আওতায় প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে সফল ৮০ জন কর্মকর্তা যাদের সকলেরই প্রশিক্ষকের প্রয়োজনীয় গুণাবলী রয়েছে। এদের সকলকে এফটিইপি-২ এর বেসিক কোর্স-১ এ প্রশিক্ষণে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এর সফলতার ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে ৩৬ জনকে নির্বাচিত করা হয়।

প্রশিক্ষক দল উন্নয়ন কাজটি স্বল্পমেয়াদী কোন কোর্সের মাধ্যমে করা যায় না। 'শিক্ষক প্রশিক্ষণের' মতই এ কাজটি বেশ কয়েকটি কোর্স ও অনুশীলনীর মাধ্যমে একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়া। বর্তমানে বিভাগীয় প্রশিক্ষকগণ **"কাজ করে শেখা"** নীতিতে প্রশিক্ষক হিসেবে নিবিড় তত্ত্বাবধানে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে (১২ দিনের বেসিক সম্প্রসারণ কোর্স ও ৫ দিনের মাছ চাষ সম্প্রসারণ কোর্স) কাজ করে যাচ্ছেন। প্রতিটি কোর্সে প্রথমবার শিক্ষানবীশ প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও প্রকল্প প্রশিক্ষককে সহায়তা দিয়ে থাকেন। দ্বিতীয়বার থেকে বিভাগীয় প্রশিক্ষকগণ প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন এবং প্রকল্প প্রশিক্ষক তাদের সহায়তা দিয়ে থাকেন। এছাড়াও তাদের প্রশিক্ষণ দক্ষতার মান উন্নয়নে প্রকল্প প্রশিক্ষকগন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকেন। যেমন প্রতিদিন প্রশিক্ষণ শেষে সে দিনের ও পরবর্তী দিনের প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ভাল মন্দ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে থাকেন।

বিভাগীয় প্রশিক্ষক দল উন্নয়নের চূড়ান্ত পর্যায় হলো "প্রশিক্ষণ - অনুশীলনী - প্রতিভাব" পদ্ধতিতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ। এ প্রশিক্ষণ কোর্সটির কাঠামো হবে ৪ সপ্তাহের তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেক বিভাগীয় প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে অনুশীলনীর জন্যে কিছু ব্যবহারিক কাজ দেয়া হবে। এ ব্যবহারিক কাজগুলো অনুশীলনকালে কোর্স প্রশিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং বিভাগীয় প্রশিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রতিভাব দেবেন। বিভাগীয় প্রশিক্ষকগন তখনই অধিদপ্তরের মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা, প্রস্তুতি, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবে বলে প্রকল্পের প্রত্যাশা। **"শিক্ষানবীশ পদ্ধতিতে বিভাগীয় প্রশিক্ষক দল উন্নয়নের"** বর্তমান প্রচেষ্টাই হলো মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রাথমিক ও উচ্চ বিনিয়োগ।

মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ দক্ষতার উন্নয়ন

মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ কাজে নিয়োজিতরা হলেন থানা মৎস্য কর্মকর্তা, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা ও ক্ষেত্র সহকারী। এদের মাঝে সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা ও ক্ষেত্র সহকারীগণ মাছ চাষীদের প্রয়োজনীয় সেবা দানে কার্যকরী ভুমিকা রাখতে পারেন। তাই বিভাগীয় প্রশিক্ষক দল প্রকল্পের সহায়তায় মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষকদের (এএফও/এফএ) সহজে প্রযুক্তি হস্তান্তরের দক্ষতা উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছেন। মুলতঃ তাদের উন্নয়নের এ কাজটি হচ্ছে পূর্বে উল্লেখিত কোর্স দু'টির মাধ্যমে (১নং ও ২নং বক্স দেখুন)। এ কোর্স দু'টিতে প্রশিক্ষণার্থীরা বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ কৌশল শিখে থাকেন। যেমন ঃ প্রশ্ন- উত্তর পদ্ধতি, মুক্ত চিন্তার ঝড়, দলের সাথে কাজ, দলীয় সদস্য ব্যবস্থাপনা, ভুমিকা অভিনয়, নাট্যাভিনয় ও চাষীর কাছে কার্যকরীভাবে প্রযুক্তি হস্তান্তর পদ্ধতি।

এছাড়াও মাছ চাষ সম্প্রসারণ কোর্সের অংশ বিশেষে চাষীর বসত বাড়ী বা খামার থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সম্পদ বা সম্পদের উচ্ছিষ্টাংশ পুকুরের সাথে সমন্বয়করণের পদ্ধতিও শিখে থাকেন।

পুকুর পাড়ে দলীয় প্রশিক্ষণ অধিবেশন সম্পর্কিত কিছু কথা

অংশগ্রহনমূলক ও বাস্তবমূখী এ পিজিটিএসগুলো প্রত্যেকটি স্বল্পমেয়াদী (দুই থেকে আড়াই ঘন্টার)। যা

বক্স নং - ১ঃ বেসিক সম্প্রসারণ কোর্স

এ কোর্সটির মেয়াদকাল ১২ দিন। এ ক্ষেত্রে পুকুর পাড়ে দলীয় প্রশিক্ষণ অধিবেশন (Pond Group Training Session PGTS) 'র পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও উপস্থাপনার অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে যা সম্পূর্ণ রূপে চাহিদাভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক। কোর্সে এএফও/এফএদের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়নে এবং মনোভাবের পরিবর্তনের জন্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ হলো-

* সম্প্রসারণ পদ্ধতি ও বয়স্ক শিক্ষণের ত্বাত্তিক জ্ঞানের উন্নয়ন করা
* প্রশিক্ষণ অধিবেশনের পরিকল্পনা, প্রস্তুতি, দলের সাথে কাজ করা ও দলীয় সদস্য ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উন্নয়ন করা
* চাষীর সাথে সম্পর্ক, উপর-নীচ সম্প্রসারণে পদ্ধতি ও প্রশিক্ষক কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে মনোভাবের পরিবর্তন করা

বক্স নং-২ঃ মাছ চাষ সম্প্রসারণ কোর্স

বয়স্ক শিক্ষণের মূল নীতি হলো বয়স্করা নিজেদের পরিবেশে, চাহিদার ভিত্তিতে ও আনন্দঘন অধিবেশনে বেশি শেখে। এ শিক্ষণ আরও কার্যকরী হবে যদি সমস্যাসমূহ সনাক্তকরণ ও সম্ভাব্য সমাধানে তাদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা যায়। এ নীতিকে অনুসরণ করেই এফটিইপি-২ **'বাংলাদেশে প্রথমবারের'** মত ৫ দিনের "মাছ চাষ সম্প্রসারণ কোর্স" প্রবর্তন করেছে। এ কোর্সে এএফও/এফএদের কার্যকরী পিজিটিএস উপস্থাপনার মান ও কারিগরী জ্ঞানের উন্নয়নে সহায়তা করবে।

এ কোর্সের প্রধান বশিষ্ট্য হলোঃ

* পূর্বের বেসিক সম্প্রসারণ কোর্সে প্রাপ্ত সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ দক্ষতার আরও উন্নয়ন করা
* ছবির মাধ্যমে অংশগ্রহনমূলক পদ্ধতিতে ঋতুভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপন করা
* চাষীর বর্তমান অবস্থা ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা
* পুকুরে ব্যবহারিক কার্যাদি প্রদর্শনের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে কারিগরী তথ্যের উপস্থাপন করা
* চাষী তার প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহকৃত "চাষীর তথ্য রেকর্ড শীটে (এফআরএস)" সংরক্ষণ করবেন যা তাদের পরবর্তীতে কাজে লাগবে।
* প্রশিক্ষক চাষী দলের সমস্ত তথ্য " প্রশিক্ষকের টালী শীটে (টিটিএস)" সংরক্ষণ করবেন

চাষীদের চাহিদা ও নির্দেশিত সময় অনুযায়ী এক বছরে ৬ বারে (মোট সময়ের প্রয়োজন হয় ১২ -১৫ ঘন্টা) উপস্থাপন করা হবে। এ কাজটি একটি দলে শুধুমাত্র একজন প্রশিক্ষকই করে থাকবেন। পিজিটিএসগুলোর সহায়ক সামগ্রী হবে বৈচিত্রপূর্ণ ও তথ্য বহুল যা কাঁধে ঝুলানো ব্যাগে পরিবহন করা যাবে। দীর্ঘ মেয়াদী স্থায়ীত্বশীল সম্প্রসারণ পদ্ধতিতে অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকে। তার মাঝে সাধারণ সমস্যাগুলো হলো ব্যয় বহুলতা, পরিবহন এবং পরিবর্তনশীল প্রশিক্ষণ সামগ্রীর অপর্যাপ্ততা। এ ধরণের সমস্যাগুলো সমাধানে পিজিটিএসের ভূমিকা হলো-

১. সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা/ক্ষেত্র সহকারীগন স্থানীয় পরিবহন যেমনঃ রিক্সা বা ভ্যান ব্যবহার করে থাকেন।
২. প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রীসমূহ প্রয়োজনে প্রশিক্ষকগণই প্রতিস্থাপন করে থাকেন এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত উপকরণাদি চাষীরাই সরবরাহ করে থাকেন।
৩. চাষীদের ভাতা বা পরিবহন খরচ বহন করতে হয় না কারণ পিজিটিএসে চাষীরা নিজেদের গ্রামে এবং তাদেরই সুপারিশকৃত সময়ের মাত্র দু'ঘন্টা সময় ব্যয় করে থাকেন।
৪. পিজিটিএসের স্থান গ্রামের সুবিধাজনক যে কোন পুকুর পাড়ে হতে পারে।

পিজিটিএসের গঠন প্রকৃতি

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বয়স্করা তাদের পরিবেশে, চাহিদার ভিত্তিতে এবং আনন্দঘন পরিবেশে বেশী শেখে। তাই প্রতিটি পিজিটিএসকে উপভোগ্য ও আনন্দদায়কভাবে সাজানো হয়েছে। যেমন প্রতিটি অধিবেশন দুই থেকে আড়াই ঘন্টার। চাষীর মনোযোগ দীর্ঘ সময় ধরে রাখার জন্যে প্রতিটি পিজিটিএসের মধ্যবর্তী সময়ে ১০ - ১৫ মিনিটের চা পানের বিরতি দেয়া হয় এবং বিরতির পর বয়স্কদের উপযোগী উপভোগ্য কোন খেলা দিয়ে পরবর্তী অংশ শুরু করা হয়। প্রতিটি পিজিটিএসে চাষীদের মনোযোগ ধরে রাখার জন্যে যা করা হয়, তা হলো -

ক. ফ্লাশ কার্ডের ছবির সহায়তায় ও অংশগ্রহনমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষণীয় বিষয়ের উপস্থাপন।
খ. "করে শেখা" প্রক্রিয়ায় ব্যবহারিক কাজগুলো শেখানো।
গ. পূনরালোচনা।
ঘ. প্রত্যেক চাষীর পুকুরের বর্তমান অবস্থা ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।

ক. ফ্লাশ কার্ডের ছবির সহায়তায় ও অংশগ্রহনমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষণীয় বিষয়ের উপস্থাপন

এএফও/এফএদের সাদা কালো প্রায় ১০০ টি ফ্লাশ কার্ডের ছবি ও রং পেন্সিল সরবরাহ করা হয়। তারা ফ্লাশ কার্ডগুলোকে আকর্ষণীয় করার জন্যে সেগুলোকে রঙ্গীন করে, ১-৫ নং পিজিটিএসের জন্যে আলাদা আলাদা ৫ রং এর কাগজে লাগিয়ে তা অধিবেশনে ব্যবহার করে থাকে। এ ফ্লাশ কার্ডগুলো সরবরাহকৃত "প্রশিক্ষক নোটের" সহায়তায় এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কিত আলোচনার মাধ্যমে প্রদর্শন করে থাকে। তবে **'ঘটনা'** সম্পর্কিত বিষয়গুলো যা সহজে স্মরণ করা যায় যেমনঃ সার পানির রং সবুজ করে। অন্যদিকে **'ধারণা'** যা বুঝতে হয় তা অনেক সময় উপস্থাপন করা জটিল হয়ে থাকে যেমনঃ সার কিভাবে কাজ করে এবং এর মাত্রা কি কি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এ ধরণের সকল জটিল ও সহজ বিষয়গুলো সাবলীলভাবে ছবির সহায়তায় চাষীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। ফ্লাশ কার্ডগুলো ধারাবাহিকভাবে চাষীদেরকে দেয়া হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয় সম্পর্কে তাদের ধারণা পরিষ্কার না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফ্লাশ কার্ডের সহায়তায় আলোচনা চলবে।

খ. "করে শেখা" প্রক্রিয়ায় ব্যবহারিক কাজগুলো শেখানো

বিভিন্ন ভাবে শিক্ষণের বিষয়টি হলো নিম্নরূপঃ

"আমি যা শুনি তার কিছুটা বুঝতে পারি.
আমি যা দেখি তা স্মরণ করতে পারি ও
আমি যা করি তা ভালভাবে জানি।"

শিক্ষণ তত্ত্বের এ বিষয়টি প্রমানিত সত্য যে সবচেয়ে বেশী কার্যকরী এবং শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণ কৌশল হলো - শুনা, দেখা ও করা ক্রিয়া তিনটির সমন্বিত প্রশিক্ষণ কৌশল। যা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়টি দীর্ঘ দিন ধরে মনে রাখা যায় ও স্মরণ করা যায়। তাই পিজিটিএসের এ পর্বে এমনভাবে শিক্ষণ পরিবেশ সাজানো হয় যাতে সকল চাষী (সর্বোচ্চ ১২ জন) ভালভাবে দেখতে ও শুনতে পারে এবং পরবর্তীতে তারা শিক্ষণীয় দক্ষতা করে দেখাতে পারে এবং ভুল হলে প্রশিক্ষক তা সংশোধন করে দিতে পারেন।

গ. পুনরালোচনা

সকল প্রশিক্ষণেরই শিক্ষণের উদ্দেশ্য থাকে। সে

প্রশিক্ষণই কার্যকরী হবে যার শিক্ষণ উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। শিক্ষণের উদ্দেশ্য যাচাই করা হয় পিজিটিএসের পুনরালোচনা পর্বে। এ পর্বে **"প্রশ্ন - বিরতি - নাম"** পদ্ধতিতে মূল শিক্ষণীয় বিষয়গুলো পুনরালোচনা করা হয়। শিক্ষণীয় মূল বিষয়গুলো যদি চাষীরা সকলেই বলতে পারে তা হলে ধরে নেয়া হয় যে শিক্ষণের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। পুনরালোচনা শেষে চাষীদের ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্যে লিফলেট দেয়া হয়।

ঘ. বর্তমান অবস্থা ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

অনেক ক্ষেত্রেই চাষীদের বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি না রেখেই তাদের বিভিন্ন কাজের সুপারিশ করা হয়। যা সাধারনতঃ চাষীর কাজে লাগে না বা চাষীর দ্বারা বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না । পিজিটিএসের এ অংশে চাষীদের বাস্তব বা বর্তমান অবস্থা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে তার পুকুরের ভবিষ্যত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে সহায়তা করা হয় (চিত্র-১)। এটা হতে পারে পুকুরের জন্যে প্রয়োজনীয় কোন উপকরণের পরিমান বা সময় নির্ধারণে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে একজন চাষী গত বছরে সে কোন সার ব্যবহার করেনি। প্রশিক্ষণে সুপারিশ করা হলো প্রতি দিন সার প্রয়োগ করতে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে প্রতি দিন সার প্রয়োগ করতে পারবে না। প্রতি সপ্তাহে একবার সার প্রয়োগ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে পূর্বে সার ব্যবহার করেনি এটা তার বর্তমান অবস্থা, প্রতি দিন সার প্রয়োগ করতে হবে এটা হলো সুপারিশ এবং প্রকৃত পক্ষে সে সপ্তাহে একবার সার প্রয়োগ করতে পারবে তা হলো লক্ষ্যমাত্রা। এ তথ্যগুলো চাষী সরবরাহকৃত এবং প্লাস্টিক ওয়ালেটে সংরক্ষিত চাষীর তথ্য রেকর্ড (Farmers Record Sheet- FRS) শীটে লিখে রাখবে (চিত্র-২ দেখুন)।

অধিবেশনের এ অংশটি খুবই উপভোগ্য হয়ে থাকে। কারন একজন চাষী আর একজন চাষীকে তার পুকুর ব্যবস্থাপনায় কর্ম পদ্ধতি নির্ধারণে সহায়তা দিয়ে থাকেন। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে চাষীর বর্তমান অবস্থা ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের সময় কারিগরী তথ্যগুলো বিভিন্ন আঙ্গিকে সকল চাষীর দ্বারা বেশ কয়েক বার আলোচিত হয়ে থাকে যার ফলে চাষীরা শেষ সময় পর্যন্তও অধিবেশনকে প্রাণবন্ত করে রাখে।

চিত্র-১ঃ পিজিটিএসে চাষীর বর্তমান অবস্থা ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হচ্ছে

চিত্র - ১ঃ পিজিটিএসে চাষীর বর্তমান অবস্থা ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হচ্ছে

চাষীদের জন্যে মাছ চাষ কোর্সের অধ্যায়সমূহ

এ কোর্সের প্রথম অধিবেশনের প্রথম অংশে মাছ চাষের বিভিন্ন কাজের ধারাবাহিক পরিচিতি ও ঋতুভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপন করা হয়। শেষ অধিবেশন বা অধিবেশনের প্রথম অংশে সম্প্রসারণের অগ্রগতির পরীবিক্ষণ (Monitoring) করা এবং এর শেষ অংশে পরবর্তী বছরের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপন করা হবে। এ ছাড়া প্রথম অধিবেশনের দ্বিতীয় অংশ থেকে পঞ্চম অধিবেশন পর্যন্ত শিক্ষণীয় অধিবেশনে প্রযুক্তিগত বিস্তারিত বিষয় উপস্থাপিত করা হবে। মাছ চাষ সম্প্রসারণ কোর্সের প্রতিটি অধিবেশনকে পিজিটিএস (PGTS) হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। নিম্নের সারণী-১'এ ৬টি পিজিটিএস এর বিস্তারিত বিষয় উল্লেখ করা হলো -

ফলো আপ বা সহায়ক দল

আবাসিক প্রশিক্ষণগুলো মাঠ পর্যায়ে স্থানান্তরের সময় পরীবিক্ষণ (Monitoring), সহায়তা (Assistance) মূল্যায়ন (Evaluation)দরকার। এটা আমরা তুলনা করতে পারি 'শিক্ষক প্রশিক্ষণ' কলেজের সাথে। সেখানে যেমন একজন নতুন শিক্ষক প্রশিক্ষণ নেয়ার পর পরবর্তী কয়েক মাস অভিজ্ঞ একজন শিক্ষক দ্বারা তাদের তালিম দেয়া হয়। এফটিইপি'র ক্ষেত্রেও ফিল্ড ট্রেইনারগন চাষীর প্রশিক্ষক দের (এএফও/এফএ/এনজিও কর্মীদের) প্রত্যেকের প্রথম পিজিটিএসগুলোয় সহায়তা দেবেন এবং পরবর্তীতে মাঝে মাঝে সহায়তা দেবেন। এর মাধ্যমে প্রশিক্ষকগন পিজিটিএস উপস্থাপনায় আস্থাশীল হবেন এবং

পাশাপাশি সম্পূর্ণ সম্প্রসারণ পদ্ধতিটি বুঝতে পারবেন। এছাড়াও ফলোআপ টীম প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত প্রতিভাব (Feedback) প্রশিক্ষণ দলকে জানাবেন এবং প্রশিক্ষণ দল সে কোর্সের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনবেন।

বক্স-৩ঃ প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ দলের দক্ষতা উন্নয়ন ও গঠনের ধারাবাহিক ধাপগুলো

১. প্রাথমিক সুবিধাভোগীদের (চাষীদের) চাহিদা সনাক্তকরণ
২. মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষকদের (থানা মৎস্য কর্মকর্তা, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা ও ক্ষেত্র সহকারী) চাহিদা সনাক্তকরণ
৩. মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষক (বিভাগীয় প্রশিক্ষক ও প্রকল্প প্রশিক্ষক) চাহিদা সনাক্তকরণ
৪. চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষকদের সম্প্রসারণ, যোগাযোগ ও কারিগরী দক্ষতায় সমৃদ্ধ করা-
   ক. সম্ভাব্য সকল প্রার্থীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন, নির্বাচন করা ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রদান।
   খ. দক্ষ প্রশিক্ষকদের সাথে প্রকৃত প্রশিক্ষণে অনুশীলনী করনো (প্রথমে পর্যবেক্ষক ও রিসোর্স পারসন হিসেবে কাজ করা এবং পরবর্তীতে প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করে শেখা)
   গ. শিক্ষানবীশ প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করার পর বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণে প্রদত্ত কাজ অনুযায়ী দেশে অনুশীলনী ও অনুশীলনী পর্যবেক্ষণের পর কর্মশালার মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নে প্রতিভাব।
৫. মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষকদের বেসিক সম্প্রসারণ কোর্স প্রদান
৬. মাঠ প্রশিক্ষকগণ দু'কোর্সের মধ্যবর্তী কার্যাদি সম্পাদন করবেন
৭. মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষকদের আবারও ৫দিনের মাছ চাষ সম্প্রসারণ কোর্সে এনে তাদের মাছ চাষ কারিগরী দক্ষতা ও অধিবেশন উপস্থাপনার মান উন্নয়ন করা হবে।
৮. মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষকদের দক্ষ ও আস্থাশীল করার জন্যে তাদের প্রতিটি পিজিটিএস উপস্থাপনের আগে প্রকল্পের ফিল্ড ট্রেইনারগণ ১-২ বার কোচিং দেবেন।
৯. পিজিটিএস উপস্থাপনার পদ্ধতি, অভীষ্ট দলের উপর এ সম্প্রসারণ পদ্ধতির প্রভাব এবং প্রকল্প সম্পাদিত কার্যক্রমের মানের পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।
১০. সমস্ত প্রতিবেদনগুলো সংকলন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিভাব দেয়া।

টেবিল -১ঃ পিজিটিএসের বিস্তারিত বর্ণনা

ক্রমিক নং	পিজিটি এসের নাম	পিজিটিএসের অংশসমুহ	
		প্রথম অংশ	দ্বিতীয় অংশ
পিজিটিএস- ১	চাষীর অবস্থা	প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপন, চাষীর বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ	পুকুর প্রস্তুতি; আগাছা দূরীকরণ, পাড় ও তলা মেরামত এবং অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণ
পিজিটিএস- ২	সবুজ পানি	চুন প্রয়োগ	সার প্রয়োগ
পিজিটিএস- ৩	মজুদ ব্যবস্থাপনা	প্রজাতি নির্বাচন ও মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ	ভাল মন্দ পোনা সনাক্তকরণ, পরিবহণ ও ছাড়া
পিজিটিএস- ৪	চাষীর সম্পদ	চাষীর সম্পদসমূহ সনাক্তকরণ এবং সম্পদের প্রবাহ	মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা; মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ ও খাদ্য প্রয়োগ
পিজিটিএস- ৫	মাছ চাষে লাভ	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	আংশিক আহরণ ও পূনঃমজুদ
পিজিটিএস- ৬	অংশগ্রহণমুলক .পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন	সম্পসারণ পাদ্ধতির প্রভাব যাচাই। এ ছাড়া চাষীরা নিজেরাই তাদের সম্পাদিত কাজ ও প্রাপ্ত ফলাফলের মূল্যায়ন করতে পারবে যা তারা পিজিটিএস ১-৫'এর এফ আরএস' এ লিখে রাখবে।	চাষীদের অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ

চিত্র-১ঃ চাষীর তথ্য রেকর্ড শীট (Farmers Racord Sheet-FRS)
মৎস্য প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ প্রকল্প-২ কর্তৃক প্রণীত ও বাস্তবায়িত

নাম-

অধিবেশন -১

আগাছা দূরীকরণ ও পাড় মেরামত	করি	করবো	প্রকৃত সম্পাদন
	√	√	√
	×	×	×
রাক্ষুসে ও বাজেমাছ দূরীকরণ	**করি**	**করবো**	**প্রকৃত সম্পাদন**
	√	√	√
	×	×	×
চুন প্রয়োগ	**করি**	**করবো**	**প্রকৃত সম্পাদন**
	√	√	√
	×	×	×
প্রস্তুত কালীন সার প্রয়োগ	**করি**	**করবো**	**প্রকৃত সম্পাদন**
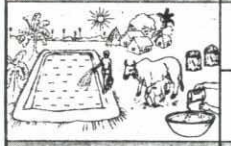	√	√	√
	×	×	×
মজুদ	**করি**	**করবো**	**প্রকৃত সম্পাদন**
	√	√	√
	×	×	×

পুকুরের আয়তন.....শতাংশ

চাষীর তথ্য রেকর্ড সিট

মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ	করি	করবো	প্রকৃত সম্পাদন
	√	√	√
	×	×	×
খাদ্য প্রয়োগ	**করি**	**করবো**	**প্রকৃত সম্পাদন**
	√	√	√
	×	×	×
আংশিক আহরণ ও পুনঃমজুদ	**করি**	**করবো**	**প্রকৃত সম্পাদন**
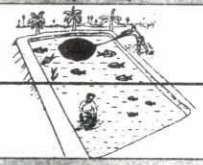	√	√	√
	×	×	×
	√	√	√
	×	×	×
সম্পূর্ণ আহরণ	**করি**	**করবো**	**প্রকৃত সম্পাদন**
	√	√	√
	×	×	×
মাছ উৎপাদন	**বর্তমান উৎপাদন**	**উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা**	**প্রকৃত উৎপাদন**
প্রতি শতাংশে			

আইডি নং.....

অধিবেশন - ২

উপকরণ সরবরাহ	কতটুকু করি	সুপারিশকৃত পরিমাণ	কতটুকু করবো	প্রকৃত সম্পাদন

অধিবেশন - ৩

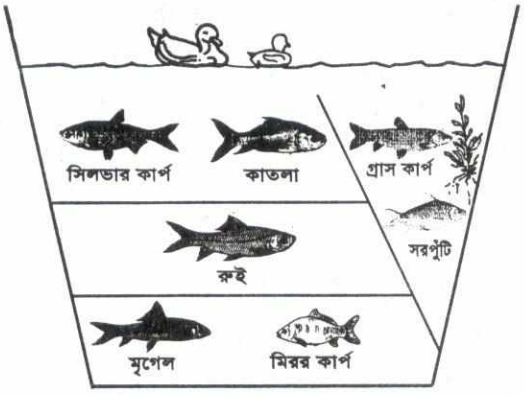

		কতটুকু করি	সুপারিশকৃত পরিমাণ	কতটুকু করবো	প্রকৃত সম্পাদন
	সিলভার কার্প				
	কাতলা				
	বিগহেড				
	রুই				
	মৃগেল				
	কার্পিও				
	মিরর কার্প				
	সরপুঁটি				
	গ্রাস কার্প				
	মোট				

অধিবেশন -৪

		মোটেই নয়	প্রতিদিন	সাপ্তাহিক	পাক্ষিক	মাসিক	মাসের অধিক
	করি						
	সুপারিশকৃত						
	করবো						
	প্রকৃত সম্পাদন						
	কল্লি						
	সুপারিশকৃত						
	করবো						
	প্রকৃত সম্পাদন						

অধিবেশন -৫

	করি						
	করবো						
	প্রকৃত সম্পাদন						
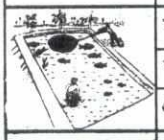	করি						
	করবো						
	প্রকৃত সম্পাদন						
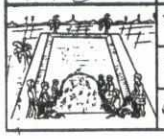	করি						
	করবো						
	প্রকৃত সম্পাদন						

মৎস্য সম্প্রসারণে জিও-এনজিও সহযোগীতা

কৃষিবিদ মোঃ আব্দুস সাত্তার
মৎস্য অধিদপ্তর, ফরিদপুর

নদীমাতৃক বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। জাতীয় পুষ্টি জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য সম্পদ এক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। জাতীয় আয়ের ৫%, কৃষি সম্পদ হতে আয়ের ১৬% এবং রপ্তানী আয়ের ১০% মৎস্য সম্পদের অবদান। প্রায় ১২ লক্ষাধিক লোক সার্বক্ষণিক এবং ১.২ কোটি লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত।

প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কারণে বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদের বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে। নদী, নালা-বিলসহ আভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের পরিমাণ ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর। পুকুর, দিঘি চিংড়ি খামারসহ বদ্ধ জলাশয় ২.৯০ লক্ষ হেক্টর। একান্ত অর্থনৈতিক এলাকাসহ সামুদ্রিক জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ১.৬৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। বিশাল এই সম্ভাবনাময় জলজ সম্পদকে পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে পারলে ব্যাপক কর্মসংস্থান সহ প্রয়োজনীয় আমিষের অভাব পূরণ করেও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এই জন্য প্রয়োজন জাতীয় মৎস্য নীতির সঠিক ও যুগোপযোগী মৎস্য সম্প্রসারণ নীতিমালা। সরকারের পাশাপাশি জাতীয় ও স্থানীয় বেসরকারি সংস্থার অংশীদারিত্বমূলক সহযোগীতা।

মৎস্য সম্প্রসারণে সরকারি কৌশল ও বেসরকারি সংস্থার সম্পৃক্ততার পটভূমি

মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিগত কয়েক দশকে মৎস্য অধিদপ্তর বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্পের (থানা পর্যায়ে মৎস্য সম্প্রসারণ প্রকল্প, দারিদ্র বিমোচন, এফসিডিআই ইত্যাদি) আওতায় পুকুর দিঘিতে মৎস্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব হলেও এই ক্ষেত্র সংকুচিত হওয়ায় আমাদের মুক্ত জলাশায় ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করতে হয়। মুক্ত জলাশয়সমুহে পোনা মজুত কার্যক্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও এই প্রক্রিয়াকে টেকসই করতে না পারার কারণে আমরা কাংখিত লক্ষ্যে পৌছতে পারি নাই। কারণ মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনার সাথে ভূমি মালিক, মৎস্যজীবী ও সরকার সম্পৃক্ত।

এই তিন পক্ষের মধ্যেও সমন্বয় সাধন পূর্বক সম্প্রসারণ কার্যক্রম তরান্বিত করার জন্য জিও-এনজিও পর্যায়ে সহযোগীতার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়।

সহযোগীতার ক্ষেত্রসমূহ

ক) পুকুর দিঘিতে মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা।
খ) বিল ও বাওড় ব্যবস্থাপনা।
গ) মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদ ব্যবস্থপনা।
ঘ) সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাল ও বরোপিট মৎস্য ব্যবস্থাপনা।
ঙ) ক্ষুদ্র পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা।
চ) প্রযুক্তি হস্তান্তর।
ছ) জলমহাল ব্যবস্থাপনা।

ক) পুকুর দিঘিতে মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে প্রায় ১.৪৭ লক্ষ হেক্টর আয়তনের প্রায় ১৩ লক্ষাধিক পুকুর আছে। উন্নত জাতের প্রয়োজনীয় পোনা সরবরাহ, আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি ৩.৫-৭.০ মেট্রিক টন উৎপাদন সম্ভব হলেও সমস্ত পুকুর দিঘিকে এখনও মৎস্য চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। সকল পুকুর দিঘিকে মৎস্য চাষের আওতায় আনার জন্য সহায়তায় মৎস্য সেক্টরে পল্লীউন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাও ব্যক্তি মালিকানা পুকুরসমূহ সংস্কার (পুনঃখনন) করে মৎস্য চাষের আওতায় আনছে। ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, কারিতাসের মত বৃহদাকার জাতীয় পর্যায়ের এনজিও ছাড়াও অনেক স্থানীয়

এনজিও এই কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তারা পূনঃখনন করে পুকুর গুলোতে মৎস্যজীবি সুফল ভোগীদের মাধ্যমে মৎস্য চাষ করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সহ প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা প্রদান করে। এছাড়াও মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক তালিকা ভুক্ত এনজিও সমুহ সংস্কারকৃত সরকারি জলাশয়সমুহে মৎস্য চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাভোগী দল গঠন, উদ্বুদ্ধ করণ ও প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে মৎস্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অবদান রেখে আসছে। এ ভাবে মৎস্য সেক্টরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন হচ্ছে।

খ) বিল ও বাওড় ব্যবস্থাপনা

বাংলদেশের ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর আভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের প্রায় ২৮ লক্ষ হেক্টর জুরে রয়েছে প্লাবন ভূমি। বিস্তির্ণ প্লাবন ভুমির এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে বিল। একদা এই বিল গুলোই ছিল মৎস্য প্রজনন ও আহরনের ক্ষেত্র। দেশের মৎস্য উৎপাদনের সিংহ ভাগ আসতো এই বিল এলাকা থেকে। কাল ক্রমে পলি পড়ে ভরাট হয়ে প্রজনন ক্ষেত্রের সংকোচন, অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ, সার ও কীটনাশকের প্রভাব ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট কারণে বিলগুলোর প্রাকৃতিক উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পায়। বিলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্থানীয় মৎস্য জীবিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজ ভিত্তিক মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থাপনায় সরকারের নৈতিক ও আইনগত সহায়তায় বেসরকারি সংস্থা সমূহ মৎস্যজীবি সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে এবং প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা প্রদান করে নির্বাচিত জলাশয় সমূহের পোনা মজুদের মাধ্যমে মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। প্রকল্পটিতে মৎস্য অধিদপ্তরের পাশাপাশি ব্র্যাক, প্রশিকা, বাচতে শিখা, কারিতাস ইত্যাদি এনজিও মৎস্য জীবি সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করছে টাঙ্গাইল জেলার হামিল বিল, দিনাজপুর জেলার আশুরার বিল ইত্যাদিতে সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় জিও এনজিও পর্যায়ে অংশীদারিত্ব মূলক সহযোগীতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বদ্ধ জলাশয়ের এক ক্ষুদ্রতম অংশ বাওড় যার আয়তন প্রায় ৫৪৮৮ হেক্টর। পরিসরে কম হলেও সঠিক ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব। উন্নত পদ্ধতিতে বাওড় ব্যবস্থাপনার অধীনে যশোর ও ঝিনাইদহ জেলায় রাজস্বখাত ভুক্ত ৬টি বাওড়ের গত উৎপাদন হেক্টর প্রতি ১৩৩ কেজি হতে ৫৩০ কেজিতে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে (১৯৯১-৯২)। বাওড় ব্যবস্থাপনার এই সাফল্যের প্রেক্ষাপটে ইফাদ এর সাহায্য পুষ্ট বাওড় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৩০টি বাওড় মৎস্য ব্যবস্থাপনার অংশীদার হিসাবে বেসরকারি সংস্থা ব্রাক মৎস্যজীবি দল গঠন, উদ্বুদ্ধকরন, প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা প্রদান করে মৎস্য অধিদপ্তর ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থাপনার সুফলভোগী মৎস্য জীবিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমুল পরিবর্তন এনেছে। মৎস্য চাষ ছাড়াও ব্রাকের আয় বৃদ্ধি মূলক কার্যকান্ডে সম্পৃক্ত হওয়ায় দরিদ্র মৎস্য জীবিদের জীবনমান পরিবর্তিত হয়েছে।

গ) মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের ৪০.৪৭ লক্ষা হেক্টর উন্মুক্ত জলাশয়ের মধ্যে ২৮ লক্ষ হেক্টর প্লাবন ভূমি। এক সময় এই সমস্ত প্লাবনভূমি মৎস্য প্রজনন ও বিচরনের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হতো। মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৭০% আসত এই ক্ষেত্র থেকে। কিন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় বিগত কয়েক দশকে প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট নানা কারনে প্লাবন ভূমির উৎপাদন আশংকা জনক ভাবে হ্রাস পায়। প্লাবন ভুমির উৎপাদনের নিম্নমুখী মান রোধকল্পে মূল জলাশয়ে পোনা মজুদ ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। বিগত ১৯৮৮ সাল থেকে মৎস্য অধিদপ্তর রাজস্বখাত হতে দেশের বিভিন্ন নদ-নদীতে পোনা মজুদের কর্মসূচী হতে নেয়। এ ছাড়াও ১৯৯১ সাল হতে ৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের (২য়, ৩য় মৎস্য প্রকল্প ও সমন্বিত মৎস্য প্রকল্প) আওতায় নির্বাচিত বিভিন্ন জলাশয় ৫ বছরে প্রায় ৪৫ কোটি রুই জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্তি করা হয়। ইতিমধ্যেই এই কর্মসূচীর সুফল পাওয়া গেছে। পোনা মজুদ কর্মসূচীকে সফল করার জন্য সরকারের পাশাপাশি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের অনেক এনজিও গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন। ব্রাক, প্রশিকা, কারিতাস ইত্যাদি ছাড়াও অনেক স্থানীয় এনজিও প্লাবন ভূমিতে মৎস্য জীবি সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে পোনা মজুদ কর্মসূচীর গুরুত্ব, মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, মৎস্য জীবিদের অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাখ্যা করে তাদের সচেতন করে তোলে এবং পোনা মজুদ কমিটিতে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে। পোনা মজুদ কর্মসূচীকে টেকসই করতে হলে প্রয়োজন অর্থ,প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন ও মৎস্যজীবি সম্প্রাদয়ের কার্যকর অংশগ্রহণ। সরকারের পক্ষে এককভাবে এ দায়িত্ব পালন দুরূহ ব্যাপার হবে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠন সমূহ মৎস্যজীবি সম্প্রাদায়কে সংগঠিত করে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে পোনা মজুদের জন্য সহায়ক সঞ্চয় ও ঋণ কর্মসূচী

চালু করে পোনা মজুদ কর্মসূচীকে টেকসই করার প্রয়াস চালাচ্ছে।

ঘ) সেচ খাল ও বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধের পাশে সৃষ্ট বরোপিট মৎস্য ব্যবস্থাপনা

সেচ খাল ও বাঁধের পাশে বরোপিটে মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা প্রচলিত আছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১৮টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের বরোপিট ও সেচ খালে সমন্বিত মৎস্য চাষ উন্নয়ন কার্যক্রমে বেসরকারি সংগঠন সমূহ সহযোগীতা করে আসছে। দলগঠন, উদ্বুদ্ধ করণ, প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে এনজিওরা মৎস্যজীবি সম্প্রদায়কে এই প্রকল্পে সম্পৃক্ত রেখেছে।

ঙ) জলমহাল ব্যবস্থাপনা

ব্রিটিশ আমলে জমিদারের মাধ্যমে নামমাত্র রাজস্ব আদায়ের বিনিময়ে জলমহাল সমূহে মৎস্যজীবিদের মৎস্য আহরণের অধিকার দেয়া হয়। ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা বিলোপ সাধন করে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জলা ভূমি মন্ত্রণালয়ে ন্যাস্ত করা হয়। গতানুগতিক ভাবে ভূমি মন্ত্রাণালয়ের পক্ষে জেলা প্রশাসকগণ জলাশয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী ১ থেকে ৩ বৎসরের জন্য উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ডাক দাতার কাছে জলাশয়গুলি ইজারা দিয়ে থাকেন। নীতিমালা অনুযায়ী প্রকৃত মৎস্যজীবিদের মাঝে জলমহাল ইজারা দেওয়ার নিয়ম থাকলেও ভূমিহীন দরিদ্র মৎস্য জীবিরা কখনও জলমহাল ইজারা পায় না। অধিকন্তু এক শ্রেণীর মধ্যস্বত্বভোগী মহাজন মৎস্যজীবি সমিতির নাম ভাঙ্গিয়ে জলমহালগুলি ইজারা নেয় এবং মৎস্য সংরক্ষণ আইনের তোয়াক্কা না করে নির্বিচারে পোনা ও ডিমওয়ালা মাছ আহরণ করে জলমহাল গুলি মৎস্য শুণ্য করে ফেলে। মৎস্য সম্পদ ও জলমহাল ব্যবস্থাপনার মধ্যস্বত্বভোগী ইজারা প্রথা বিলোপ ঘটিয়ে সুফলভোগী প্রকৃত মৎস্যজীবিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে নয়া জলমহাল ব্যবস্থাপনা বা জৈবিক ব্যবস্থাপনার নীতি প্রবর্তন করা হয়। এই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হলো জলাভূমিতে পোনা মজুদের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রকৃত মৎস্যজীবিদের মাধ্যমে জলাভূমির পরিচর্যা ও অধিকার পত্রের মাধ্যমে সহনশীল মাত্রায় মৎস্য আহরণ করে ভারসাম্যপূর্ণ মজুদ নিশ্চিত করা

এই নীতিমালার কার্যকারিতা ও উপযোগীতা যাচাইয়ের জন্য সরকার ফোর্ড ফাউন্ডেশনের আর্থিক ও ইকলার্মের কারিগরি সহায়তায় একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প (মুক্ত জলাশয় উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্য ব্যবস্থাপনা) গ্রহণ করে। প্রকল্পটিতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ অংশীদারিত্ব মূলক ভূমিকা পালন করে।

নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনার আওতায় প্রাথমিক ভাবে নির্বাচিত ১০টি জলমহাল (হাওড়, বাওড়, নদী ইত্যাদি) মৎস্য অধিদপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এই প্রকল্পের সফলতার আলোকে পরে ২৬৪টি জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা হয়। জলমহাল সমূহের জৈবিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দলগঠন, উদ্বুদ্ধকরণ, ঋণ সুবিধা প্রদান করে বেসরকারি সংগঠন সমূহ এবং কারিগরি সহায়তা ও অধিকার পত্র প্রদান করে মৎস্য অধিদপ্তর। ১৯৯৫ইং সালে ভূমি মন্ত্রণালয় জৈবিক ব্যবস্থাপনা ভূক্ত প্রবাহমান নদীর ইজারা প্রথা বিলোপ করায় মৎস্যজীবিরা যথেচ্ছভাবে মৎস্য আহরণ শুরু করে। এতে সরকার রাজস্ব থেকে যেমন বঞ্চিত হচ্ছে তেমনি মৎস্য আহরণের চাপ বেড়ে যাওয়ায় মজুদ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে।

এই সন্দেহপূর্ণ জলমহাল ব্যবস্থাপনা থেকে উত্তোরণের জন্য জৈবিক জলমহাল ব্যবস্থাপনার সুফল ও লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে সমাজ ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনা (সি, বি, এফ, এম) প্রকল্প চালু করা হয়। প্রকল্পটিতে ফোর্ড ফাউন্ডেশন আর্থিক ও ইকলার্ম কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে। বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক, প্রশিকা, কারিতাস, বাঁচতে শেখা ইত্যাদি প্রকল্পভুক্ত জলাশয়ে মৎস্যজীবি জনগোষ্ঠীর সাথে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কাজ করছে। সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার ইতিহাস আমাদের দেশে বেশি দিনের নয়। ইজারার মাধ্যমে প্রভাবশালী ব্যক্তি জলাশয়ের কর্তৃত্ব করত মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্বে প্রকৃত মৎস্যজীবিগণ ক্রমে নিঃস্ব হয়ে উঠছে। ফলে পারিবারিক অর্থনৈতিক সংকট নিরসনকল্পে অনেককে প্রকৃত পেশা ত্যাগ করে বিকল্প পেশা খুজে নেয় এমন পরিস্থিতি উত্তোরণে সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কতিপয় মুক্ত জলাশয়ে বিজ্ঞান সম্মত ও সময়োপযোগী কার্যক্রমের মাধ্যমে সুফল ভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভুমিকা রাখে। এই ব্যবস্থাপনায় এনজিও সমূহ দলভুক্ত সুফল ভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধি, নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা, হিসাব, পেশাগত দক্ষতা, ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পোনা মজুদের প্রয়োজনীয় ঋণ কার্যক্রম চালু রেখে মানব সম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি মৎস্য

সম্প্রসারণের এক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখে আসছে।

চ) প্রযুক্তি হস্তান্তর

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় মৎস্য সেক্টরে জিওএনজিও পর্যায়ে অংশীদারিত্ব মূলক প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প চালু আছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের অনেক এনজিও সরকারের সাথে ও যৌথভাবে ৫টি ক্ষেত্রে যথাক্রমে ধানক্ষেতে মাছ চাষ, পোনা মাছ চাষ, খাচায় মাছ চাষ, গলদার পোনা উৎপাদন ও ব্রুড মাছ লালন পালন শীর্ষক প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। পরিবেশগত ও কিছু সামাজিক সমস্যা সত্বেও এখানে প্রকল্পের ও এনজিও এর সমন্বিত প্রচেষ্টা বাস্তাবায়নের ফলে ইতি মধ্যেই মৎস্যচাষী ও খামার মালিকদের কাছে টেকসই ও উন্নত প্রযুক্ত হস্তান্তরিত হয়েছে। ফলে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রাম পর্যায়ে কর্ম সংস্থানেরও যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ছ) ক্ষুদ্র পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বেসরকারি সংস্থা ও মৎস্য অধিদপ্তরের সমন্বয়ে ক্ষুদ্র পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য চাষ বৃদ্ধির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

এনজিও পর্যায়ে সহযোগী সাফল্যের উদাহরণ ঃ -

১। মৎস্য অধিদপ্তর বনাম কারিতাস

কারিতাস একটি দক্ষ ও কর্মঠ বেসরকারি সংস্থা। মৎস্য অধিদপ্তরের সহিত ৫টি বিল ব্যস্থাপনার ক্ষেত্র কারিতাস অংশীদারিত্ব মূলক সফল ভুমিকা পালন করে আসছে। টাঙ্গাইলের হামিল বিল ব্যবস্থাপনায় ১৯৯৬ সালের ১০ই অক্টোবর মৎস্য অধিদপ্তরের সংগে কারিতাস সমাজ ভিত্তিক অভ্যন্তরীন উন্মুক্ত ব্যবস্থাপনা প্রকল্প কার্যকর করার লক্ষ্যে স্মারক চুক্তি নামা সম্পাদিত হয়। সম্পাদিত চুক্তি নামার আলোকে কারিতাস মৎস্যজীবি দল গঠন, উদ্বুদ্ধকরণ, কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি সহায়ক প্রশিক্ষণ দিয়ে মানব সম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি রেকর্ড পরিমাণ মৎস্য উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। এতে মৎস্যজীবিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

২। মৎস্য অধিদপ্তর বনাম প্রশিকা

মৎস্য অধিদপ্তর -প্রশিকা ৮টি স্রোতাশীল নদীতে সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে অংশীদারীত্ব মূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে প্রশিকার ভুমিকা হচেচ্ছ মৎস্যজীবি সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে ঋণদানের মাধ্যমে দরিদ্র ও ভুমিহীন মৎস্যজীবিদের মহাজন ও মধ্য স্বত্বভোগীদের উপর থেকে নির্ভরশীলতা কমিয়ে তারা বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করায় মৎস্য আহরণের চাপ সহনশীল মাত্রায় নেমে আসছে।।

৩। মৎস্য অধিদপ্তর বনাম ব্রাক

ব্র্যাক বদ্ধ জলাশয়ে চাষ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, চিংড়ি চাষ ও পোনা উৎপাদন, পুকুর পুণঃখনসহ সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারে সাথে অংশীদারিত্বমূলক ভুমিকা পালন করে আসছে। জানামতে ব্রাক ১৯৯৭ সনের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত ৫টি জেলা নিয়ে কাজ করছিল। ডানিডার অর্থায়নে ব্রাক বিল বাওড় প্রকল্পের আওতায় মৎস্য অধিদপ্তর এর সহযোগীতায় পোনা মজুদ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

৪। মৎস্য অধিদপ্তর বনাম ক্রেড

বাংলাদেশে কয়েক শতাধিক স্থানীয় এনজিও পল্লী উন্নয়নে অবদান রেখে আসছে। ক্রেড তাদের মধ্যে একটি। ক্রেডকে মৎস্য অধিদপ্তর এর সহিত সিবিএফএম এর প্রকল্পে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জাননো হয়। ক্রেড ১৫কিঃ মিঃ প্রবাহমান আড়িয়ালখা নদী নিয়ে কাজ করছে এবং সেখানে ২২৫ জনের একটি গ্রুপ গঠন করে দলীয় সদস্য ও স্থানীয় নেতাদের নিয়ে নদী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটি নদীর একাংশে মৎস্য অভয়াশ্রম এবং অন্য অংশে পেনে থাই সরপুটি ও সিলভার কার্প চাষ করছে।

৫। মৎস্য অধিদপ্তর বনাম বাঁচতে শেখা

বাঁচতে শেখা একটি আঞ্চলিক বেসরকারী সংস্থা। যার টার্গেট গ্রুপ হলো ভুমিহীন দুঃস্থ মহিলা। এইসংস্থা গোয়াখোলা- হাতিয়ারা বিলে ১৭৫টি মহিলা দলের সহিত সরাসরি কাজ করে সংস্থা দলগঠন, প্রশিক্ষণ ও ঋণ বিতরণের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে আসছে। সংস্থা বিল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করেছে যারা বিলে মৎস্য সংরক্ষণে ও অভয়াশ্রম পাহারা দেয়ার কাজে

তৎপর।

সুপারিশ মালা

১) জিও-এনজিও পর্যায়ে সফল সমন্বয়

মৎস্য চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্য অর্জনে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন সমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধন অপরিহার্য। যতদূর সম্ভব সরকারকে প্রকল্প প্রনয়নে এনজিওদের মতামত নেয়া দরকার।

২) কমন প্রপার্টি রক্ষায় কার্যকরী জুডিশিয়াল পদ্ধতির ব্যবহার

সাধারন সম্পত্তি রক্ষার্থে উদ্ভাবিত সমস্যা নিরসনে আইনগত সহায়তায় সরকার রাষ্ট্রায়ত্ব জলাভুমি ও বনজ সম্পদে দরিদ্র জনগোষ্ঠির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। যেখানে কায়েমী-স্বার্থ এনজিওদের কার্যক্রমে ব্যঘাত সৃষ্টি করে সেখানে বিশেষ ট্রাইবুনাল সৃষ্টি করে হলেও সরকারকে জুডিসিয়াল পদ্ধতিকে দ্রুততর করার জন্য আদালতকে সহযোগীতা করা উচিৎ।

৩) উদ্ভাবিত নতুন কর্মসূচির প্রতি জোরালো সমর্থন

গবেষণালব্ধ নতুন এবং ব্যয়-সাশ্রয়ী পদ্ধতির ক্ষেত্রে এনজিওদের বিনিয়োগ করা উচিৎ। মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নের গতি ধারাকে টেকসই করার লক্ষ্যে এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি চালু রাখা সমীচীন।

৪) বৃহত্তর ভৌগলিক অঞ্চলের আওতায় আনা

একই অঞ্চলে কর্মসূচির পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে দেশব্যাপী কর্মসূচির বিস্তার ঘটানো উচিৎ।

৫) অভিষ্ট দল নির্ধারণে নমনীয়তা

স্থানীয বাস্তাবতার ভিত্তিতে অভিষ্ট দল গঠন করতে হবে যা পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞা (বিশ্বজনীন) পরিহার করতে হবে।

৬) প্রান্তিক মৎস্য জীবিদের কাছে পৌঁছানোর জন্য টাস্কফোর্স গঠন

মৎস্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একক কোন এনজিও এর অদক্ষতা খোজার পরিবর্তে সাধারণ সমস্যা নিরুপণ করতে হবে। কোন যৌক্তিক সমাধানে পৌঁছানোর জন্যে এনজিও, সরকার ও সমাজ বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে।

৭) জাতীয় ভাবে মাছের ঘাটতি পুরণে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগীতায় উন্নয়ন এবং যৌথ উদ্যোগে নানাবিধ কর্ম অব্যাহত রাখতে হবে। সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সার্বক্ষণিক সহযোগীতায় মৎস্য সেক্টরকে প্রকৃত উন্নয়নের শীর্ষে পৌঁছাতে মৎস্য সম্পদের সুষম বন্টন ও সময়োপযোগী পরিকল্পিত প্রয়োগিক দক্ষ ব্যস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশ উন্নয়নে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বনায়ন ইত্যাদি সকল সেক্টরের ন্যায় মৎস্য সেক্টরেও সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি জাতীয় ও স্থানীয় সংস্থাগুলে দীর্ঘ দিন যাবৎ কাজ করে আসছে। বদ্ধ জলাশয় মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা, হাজা মজা পুকুর পুনঃখনন, মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদ কার্যক্রমে তদারক, বিল ও বাওড় ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি হস্তান্তর সহ মৎস্য চাষ সম্প্রসারণের সর্ব ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থা সমূহ সরকারের সাথে যে অংশী দারিত্বমূলক ভুমিকা পালন করে আসছে তা প্রশংসার দাবী রাখে। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি-বেসরকারি সংস্থারমধ্যে মতানৈক্য থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তবুও জনস্বার্থে সেসব সমস্যা উৎরিয়ে দেশের উন্নয়নে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্ব মৎস্য অধিদপ্তরের উপর ন্যাস্ত হলেও সরকারের সীমিত সম্পদ ও জনবলের পক্ষে এ দুরুহ দায়িত্ব পালন কর অসম্ভব প্রায়। অথচ এ সম্ভাবনাময় সেক্টরে আমিষের যোগানে গ্রামীণ জন গোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থানে যথেস্ট সুযোগ আছে। বেসরকারি সংস্থা সমূহ প্রত্যন্ত ও দুর্গম জনপদে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করে এবং তাদের নিয়মকানুন অনেকটা সহনশীল। তারা স্থানীয়ভাবে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সেদিক বিবেচনায় বেসরকারি সংস্থাসমূহ সরকারের পাশাপাশি মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে অংশীদারিত্ব মূলক ভুমিকা পালন করলে মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি সহ মৎস্য জীবিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমুল পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষের সমস্যা ও সম্ভাবনা

মোঃ মাসুদুর রহমান
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

১। ষাটের দশক হতে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ারের পানি বাঁধ দিয়ে আটকিয়ে রেখে পানির সাথে আগত চিংড়ি ও মাছের পোনাকে ৩-৪ মাস লালন পালন করে তা আহরিত করা হত। পরবর্তী কালে বিশ্ববাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশে চিংড়ি চাষের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। আশির দশকের দিকে চিংড়ি চাষের পদ্ধতিগত উন্নয়ন হয়ে উপকূলীয় অঞ্চলের কক্সবাজার, সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় ব্যাপকভাবে চিংড়ি চাষ এলাকা বৃদ্ধি পেয়ে কক্সবাজার ছাড়া অন্য তিনটি জেলায় মূলতঃ ধানক্ষেতগুলোতে ধান উৎপাদনের পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে চিংড়ি চাষ শুরু করা হয়।

চিংড়ি চাষের মাধ্যমে ১৯৮৩-৮৪ সনে ৪৩৮৬ মেঃ টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়। যা ১৯৯০-৯১ সনে ১৯৪৮৯ মেঃ টনে, ১৯৯৬-৯৭ সনে ৫২২৭১ মেঃ টনে দাঁড়ায়। চিংড়ি চাষে এ ব্যাপক ও ত্বড়িৎগতিতে উন্নয়নের ধারা প্রকৃত পক্ষে বেসরকারী পর্যায়ের একক প্রচেষ্টার ফল। তবে এ বিষয়ে একক সম্প্রসারণের ফলে নানাবিধ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টিও হয়েছে। বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়ে চিংড়ি চাষীদের চিংড়ি চাষে প্রশিক্ষণ দেয়া সহ চিংড়ি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় চিংড়ি পোনার উৎপাদনের জন্য হ্যাচারী স্থাপনে সহায়তা করার লক্ষ্যে সরকারী পর্যায়ে ১৯৮৫ সনে একটি চিংড়ি চাষ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়।

২। চিংড়ি চাষাধীন এলাকা

বর্তমানে বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ১.৩০ লক্ষ হেক্টর জমি ব্যবহার করা হচ্ছে। যার মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ জমি বৃহত্তর খুলনা জেলায় অবস্থিত। এ ছাড়াও দেশের ১৬টি জেলায় প্রায় ১২ হাজার হেক্টর জমি গলদা চাষের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩। চিংড়ি চাষ পদ্ধতি

দেশে চিংড়ি চাষের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও সত্যিকার অর্থে কোন পদ্ধতিতেই পদ্ধতিগত দিক হতে রীতি-নীতি মেনে চলা হচ্ছে না। যে কোন পদ্ধতিতেই চাষ হোক না কেন খামারে প্রকৃত পক্ষে কি ধরনের ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান তা খামার মালিকদেরও ধারণা কম থাকে। বিশেষ করে বৃহৎ আকারের খামারগুলোতে খামার মালিকগণ নিজেরাই চাষ করে থাকেন বলে এ ক্ষেত্রে খামার পরিচালনায় জটিলতার উদ্ভব কম হবার সম্ভাবনা থাকে।

দেশে বর্তমানে যে পদ্ধতিগুলোতে চিংড়ি চাষ হচ্ছে তা প্রধানতঃ প্রচলিত ও আধা-নিবিড় পদ্ধতি। শতকরা ৭৫ শতাংশ জমিতে প্রচলিত পদ্ধতিতে চাষ হচ্ছে। যার উৎপাদন হার হেক্টর প্রতি ২০০-২৫০ কেজি।

৪। চিংড়ি চাষে বিভিন্ন সমস্যা

দেশে চিংড়ি চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এ সেক্টরে নানাবিধ সমস্যারও উদ্ভব হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ

৪.১ প্রকৃত চিংড়ি চাষ এলাকা চিহ্নিতকরণ

বর্তমানে যে সকল এলাকায় চিংড়ি চাষ হচ্ছে সেগুলো প্রকৃতপক্ষে কতখানি চিংড়ি চাষের জন্য উপযোগী তা যাচাই বা পরীক্ষা করে দেখা হয়নি বা দেখার সুযোগও হয়নি। শুধুমাত্র জমি প্রাপ্তির সুবিধার উপর নির্ভর করেই খামার স্থাপিত হয়েছে। বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলের অধিকাংশ চিংড়ি খামার ধান ক্ষেতগুলোতে স্থাপিত। এগুলো সাধারণতঃ কয়েক মাসের জন্য ধান চাষীর নিকট হতে লীজ নিয়ে চিংড়ি চাষ করা হয়। ফলে একটি আদর্শ চিংড়ি খামারের জন্য যে সকল অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা থাকার কথা তা এতে থাকে না । পানির গভীরতা কোন কোন স্থানে মাত্র ১২ ইঞ্চি বা তারও নীচে থাকে। এ সকল কারণে প্রয়োজনের তুলনায় অযথা বিস্তীর্ণ এলাকায় লবণ পানি প্রবেশ করিয়ে চাষ করা হচ্ছে। অর্থাৎ অবকাঠামোগত দিক বিবেচনা করে খামার স্থাপন করা হলে এক দিকে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে সুবিধা হ'ত আবার অন্য দিকে আরও

অনেক কম আয়তনের জমি ব্যবহার করে খামার স্থাপন করা যেত এবং সে সংগে খামারের অবকাঠামোগত প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাও বৃদ্ধি করা যেত। বর্তমানে তা করা সম্ভব হচ্ছে না।

৪.২ অবকাঠামোগত ও ব্যবস্থাপনা সমস্যা

খামার মালিক অথবা খামার পরিচালনার জন্য নিয়োজিত খামার ব্যবস্থাপকের চিংড়ি চাষের উপর ব্যাপক কারিগরি জ্ঞান থাকলেও বর্তমান খামারগুলোর অবকাঠামোগত সমস্যার জন্য ইচছা থাকলেও উন্নত কারিগরি ব্যবস্থায় পরিচালনা করা সম্ভব নয় এবং এখন তা হচ্ছে না। তা ছাড়া বৃহৎ খামারগুলোর মালিক প্রকৃত পক্ষে খামার পরিচালনার ক্ষেত্রে তার দ্বারা নিয়োজিত খামার ব্যবস্থাপকের দেয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করেই খামার পরিচালনার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন ও অর্থ বিনিয়োগ করে থাকেন। খামার ব্যবস্থাপনায় যে সকল তথ্য পরিবেশিত হয়ে থাকে তা কতটুকু নির্ভরযোগ্য তা যাচাই করে দেখা হয় না। ফলে যে কোন কারণে উৎপাদন ব্যাহত হলে সাধারনতঃ চিংড়ি রোগ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। যা সর্বক্ষেত্রে সত্য নয়।

৪.৩ উপকরণ সমস্যা

চিংড়ি চাষের জন্য চিংড়ি পোনা ও চিংড়ির খাদ্যই হচেছ মূল উপকরণ। দেশের বাগদা চিংড়ি বিভিন্ন পদ্ধতিতে চাষের জন্য প্রতি বছর প্রায় ৪৬০ কোটি পোনার প্রয়োজন হয়। এর থেকে বর্তমানে হ্যাচারী থেকে প্রায় ১০০ কোটি এবং প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রায় ২০০ কোটি পোনা সরবরাহ হয়। আহরিত পোনার মৃত্যুহার ধরা হলে এ হিসেবে প্রতি বছর প্রায় ২০০ কোটিরও অধিক সংখ্যক পোনার ঘাটতি থেকে যায়।

দেশের বাগদা চিংড়ি পোনার মোট চাহিদার প্রায় ৭০ শতাংশ প্রয়োজন হয় খুলনা অঞ্চলে যার সংখ্যা প্রায় ৩২২ কোটি। এ অঞ্চলে প্রাকৃতিক উৎস ও হ্যাচারী হতে মাত্র ৫৭ কোটি পোনা পাওয়া যায় বলে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়। ফলে এ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পোনার ঘাটতি থেকে যায়। এ জন্য কক্সবাজার অঞ্চল হতে সড়ক পথে খুলনা অঞ্চলে পোনা পরিবহন করা হয়ে থাকে। সড়ক পথে পরিবহনের সময় পোনার মৃত্যু হার ৩০ শতাংশেরও অধিক হয়। তা ছাড়া খুলনা অঞ্চলের চাহিদার তুলনায় পরিবহনকৃত পোনা সংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল। যার ফলে প্রায় ক্ষেত্রেই খামারগুলোতে পোনা মজুদ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হয় ও উৎপাদন ব্যাহত হয়।

কক্সবাজার অঞ্চলেই মূলতঃ বাগদা চিংড়ি হ্যাচারীগুলো অবস্থিত এবং বর্তমানে হ্যাচারীগুলো অতি সন্তোষজনক ও লাভজনক উপায়ে পোনা উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ সুযোগ লাভে সমর্থ হয়েছে। এ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে আকাশ পথে চিংড়ি পোনা পরিবহনের সৃষ্টি হবার কারণে। খুলনা অঞ্চলে চিংড়ি উৎপাদনের স্বার্থে এ বছর আকাশ পথে চিংড়ির পোনা পরিবহনের জন্য মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নেয়। ফলে বর্তমানে নিয়মিতভাবে দুটি ভাড়া করা বিমানে কক্সবাজার থেকে যশোর বিমান বন্দর পর্যন্ত আকাশ পথে পোনা পরিবহন করা হচেছ। যশোর বিমান বন্দর হতে তা ট্রাকযোগে সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার বিভিন্ন খামারে পরিবহন করে নেয়া হচেছ। কক্সবাজার থেকে যশোর হয়ে খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন চিংড়ি খামার পর্যন্ত পোনা পরিবহনে মোট সময় লাগে প্রায় ৪-৪.৩০ ঘন্টা। এ প্রক্রিয়ায় পোনা পরিবহনের সময় মৃত্যুহার ২-৩ শতাংশ হয়ে থাকে। ফলে আকাশ পথে পোনা পরিবহন কার্যক্রম লাভজনকভাবে পরিচালিত হচেছ। বিগত ফেব্রুয়ারী '৯৯ হতে ১৫ই জুন পর্যন্ত আকাশ পথে এ যাবৎ প্রায় ৫০-৫৫ কোটি পোনা পরিবহন করা হয়েছে। পোনার মৃত্যুহার ধরে ট্রাক যোগে পরিবহনের জন্য প্রতিটির জন্য ব্যয় হ'ত ০.০৭ টাকা। কিন্তু পোনার মৃত্যুহার বিবেচনা করলে তুলনামূলকভাবে আকাশ পথে এ ব্যয় হচেছ ০.০৪-০.০৫ টাকা। এ বছর খুলনা অঞ্চলের খামারগুলোতে পূর্বের তুলনায় পোনা মজুদের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এ অঞ্চলে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

উন্নত পদ্ধতিতে বাগদা চাষের জন্য যে খাদ্যের প্রয়োজন হয় তা সাধারণতঃ পিলেটেড ফুড, যার প্রতি কেজির মূল্য প্রায় ৪০ টাকা। দেশে বর্তমানে উন্নত প্রচলিত ও আধানিবিড় চাষের জন্য এ সকল খাদ্য ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্থানীয়ভাবে তৈরী চিংড়ি খাদ্য ব্যবহার করা হয়।

৪.৪ পোনা বাজারজাত করার সমস্যা

খুলনা অঞ্চলে এ বছর প্রায় ৫ কোটি পোনা উৎপাদিত হয়েছে বলে জানা যায়। কক্সবাজার অঞ্চলে বর্তমানে যে ১৯টি হ্যাচারী আছে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা যথেষ্ট না হলেও অতি অল্প অবকাঠামোগত পরিবর্তন করে

এর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু কক্সবাজার অঞ্চলে পোনার চাহিদার তুলনায় হ্যাচারী ও প্রাকৃতিক উৎস হতে যে পরিমাণ পোনা উৎপাদিত হয় তাতে এ অঞ্চলে পোনা বাড়তি থেকে যায়। বাজারজাত ও পরিবহনের সমস্যার জন্য কক্সবাজার অঞ্চলের হ্যাচারীগুলোতে উৎপাদন ক্ষমতার নীচে পোনা উৎপাদন করা হচেছ। তবে এ বছর আকাশ পথে খুলনা অঞ্চলে পোনা পরিবহনের ফলে কক্সবাজার অঞ্চলের হ্যাচারী গুলোতে বিগত বছরের তুলনায় দ্বিগুণের চেয়েও বেশী পোনা উৎপাদিত হবে বলে ধারণা করা হয়।

৪.৫ আর্থ-সামাজিক সমস্যা

চিংড়ি চাষের জন্য বিশেষ করে খুলনা অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতি পরিলক্ষিত হয়। এ অঞ্চলে চিংড়ি চাষের জন্য চিংড়ি চাষীগন বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধান চাষীদের নিকট থেকে তাদের জমি ইজারা গ্রহণ করে থাকেন। অর্থাৎ চিংড়ি আহরণ শেষ হবার পরেই ধান চাষীর জমিতে ধান চাষ শুরু করার কথা। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যার কারণে বিশেষ করে সময় মত খামারের জন্য পোনা না পাওয়ার কারণে বিলম্বে পোনা মজুদ করতে হয়। যার ফলে ধান চাষীকে যে সময় জমি খালি করে দেয়ার কথা তার চেয়ে বিলম্বে দেয়া হয়ে থাকে বলে সঠিক সময়ে ধান চাষ শুরু করা সম্ভব হয় না। এ জন্য চিংড়ি চাষীর সাথে ধান চাষীর এক ধরনের বিবাদ/ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া অধিকাংশ চিংড়ি খামার বছরের অধিক সময় ধরে লোনা পানিতে পরিপূর্ণ থাকে বলে জমির লবণাক্ততাও দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। যা ফসল উৎপাদনের জন্য হানিকর। দীর্ঘকাল চিংড়ি চাষ এলাকা লবণ পানিতে নিমজ্জিত থাকে বলে গ্রামের মাটির ঘর বাড়ী বিনষ্ট হয় এবং অন্যান্য গাছপালা লবণাক্ততার কারণে মারা যায়। বিস্তৃর্ণ এলাকা ডুবে যায় বলে গ্রাম্য এলাকার জনপথ ডুবে যায়। গ্রাম্য শিশুদের খেলাধূলার স্থানের সংকুলান থাকে না। এমনকি গরু ছাগলের জন্য চারণভূমির বিলুপ্তি ঘটে। দীর্ঘকাল লবণ পানি জলবদ্ধ অবস্থায় থাকার কারণে এলাকার নলকূপগুলোর পানিতে লবণক্ততা দেখা যায়। ফলে পানীয় জল ও দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য বিশুদ্ধ পানির অভাব দেখা দেয়। এ সকল অসুবিধাসমূহ নিরসনের কোন উপায় না পেয়ে অনেক স্থানীয় অধিবাসী এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়ে থাকে।

৪.৬ ঋণ গ্রহীতা ও ঋণ দাতার দায়িত্ব

চিংড়ি চাষ একটি অধিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম। চিংড়ি চাষ করতে হলে একজন চিংড়ি চাষীকে অর্থায়নের জন্য ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। বর্তমানে ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ একটি জটিল প্রক্রিয়া। এ কারণে অনেক উৎসাহী উদ্যোক্তা এ সেক্টরে বিনিয়োগ করতে নিরূৎসাহীত হয়ে থাকেন। অপরদিকে দেশে ঋণ গ্রহীতাগন ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করে প্রকৃত কাজে ঐ ঋণ ব্যয় না করে অন্য খাতে বিনিয়োগ করে থাকেন। ফলে গৃহীত ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। তা ছাড়া প্রায় ক্ষেত্রেই চিংড়ি চাষীগন নিজেরা চিংড়ি খামারের জমির মালিক নন বলে ঐ সকল খামারে ব্যাংক ঋণ প্রদানের সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৪.৭ দক্ষ জনশক্তি

সরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নত পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করার জন্য এ যাবৎ মাঠ পর্যায়ে চিংড়ি চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং এখনও তা অব্যাহত রয়েছে। এতদসত্বেও দেশে চিংড়ি চাষী ও হ্যাচারী ব্যবস্থাপনার উপর এ যাবৎ যে জনশক্তির সৃষ্টি হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে মৎস্য বিষয়ক যে সকল শিক্ষা প্রদান করা হয় তা মাঠ পর্যায়ে প্রকৃত কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সর্বোপরি এ কথা স্বীকৃত যে, দেশে চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ যে হারে বৃদ্ধি পাচেছ সে হারে এ সেক্টরে কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তির বৃদ্ধি হয়নি। মৎস্য অধিদপ্তরের চিংড়ি অবতরণ কেন্দ্র ও সার্ভিস সেন্টার প্রকল্প এবং চিংড়ি রোগ নিরাময় প্রকল্পের অধীনে এ যাবৎ প্রায় ৬২৯৭৮ জন চিংড়ি চাষী ও পোনা আহরণকারীকে মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪.৮ চিংড়ি চাষ ও পরিবেশ

চিংড়ি চাষের কারণে পরিবেশ দূষণ, ইকোলজিক্যাল ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি বিষয় বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অতি সাম্প্রতিক জটিল সমস্যা বলে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ৬,৮৭,০০০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল রয়েছে যা উপকূলভাগকে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, প্লাবন ইত্যাদি হতে রক্ষা করে। তাছাড়া ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল অনেক বন্যপ্রাণী ও সামুদ্রিক মৎস্য ও চিংড়ি প্রজাতির চারণভূমি হিসেবে কাজ করে। মাটির

উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি ও ভাংগনরোধে এ বনাঞ্চল কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

উপকূলীয় এলাকায় প্রাকৃতিক পরিবেশ নানাবিধ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সম্প্রসারণের ফলে হুমকির সম্মুখীন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন প্রকার কৃষি, ফসল উৎপাদন, লবণ উৎপাদন এবং চিংড়ি চাষের জন্য জনগণ উপকূলীয় বনাঞ্চল নিধন করে ঐ সকল ভূমি ব্যবহার শুরু করেছে। বিশ্ববাজারে চিংড়ির চাহিদা ও মূল্যবৃদ্ধির কারণে অনেক ক্ষেত্রে উপকূলীয় জমি চিংড়ি খামারে রূপান্তর করা হয়েছে।

ম্যানগ্রোভ বন কেটে তা চিংড়ি চাষ খামারে রূপান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয় মূলতঃ ১৯৭৮ সন হতে। শুধুমাত্র কক্সবাজার জেলাতেই প্রায় ২০,০০০ হেক্টর জমির ম্যানগ্রোভ বন পরিস্কার করে চিংড়ি চাষের আওতায় আনা হয়। ধারণা করা হয়, এ ম্যানগ্রোভ অঞ্চল ধ্বংসের কারণে কক্সবাজার অঞ্চলের এ অংশে উপকূলীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিংড়ি চাষের জন্য প্রাকৃতিক উৎস হতে বছরে যে প্রায় ২০০ কোটি চিংড়ির পোনা ধরা হচেছ যা পরীক্ষা করে দেখা গেছে এ ২০০ কোটি পোনার সাথে আরও প্রায় ২০,০০০ কোটি অন্যান্য মাছ, চিংড়ি ও জলজ প্রাণীর ডিম ও ক্ষুদ্র পোনা বিনষ্ট হয়ে যাচেছ। পরীক্ষা করে দেখা গেছে পোনা আহরণের সময় সংগৃহীত পানিতে ১৪-২১টি অন্যান্য চিংড়ির পোনা, ২১-৩১ মাছের পোনা এবং ৪৭-৫০ প্রজাতির অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর পোনা বিদ্যমান থাকে। যা আহরণকারীরা সমূদ্রের অথবা নদীর বেলাভূমিতে নিক্ষেপ করে থাকে।

এ ছাড়া ত্রুটিপূর্ণ পরিচর্যা ও পরিবহনের ফলে প্রাকৃতিক উৎস হতে ধৃত পোনার প্রায় ৭০ শতাংশ চিংড়ি চাষের বিভিন্ন স্তরে মারা যাচেছ। এ সকল কার্যক্রম সামুদ্রিক জীব বৈচিত্রের উপর এক বিরাট বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে এবং সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ধ্বংসের জন্য অনেকাংশে দায়ী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৫। চিংড়ির কাংখিত উৎপাদন ও রোগ-বালাই

বাংলাদেশে চিংড়ি চাষের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটলেও হেক্টর প্রতি বাৎসরিক গড় উৎপাদন ৩০০-৩৫০ কেজি। এ উৎপাদন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ইজারাকৃত কক্সবাজারস্থ রামপুরের ১০ ও ১১ একর চিংড়ি চাষ এষ্টেটের প্রায় ৭০০০ একর জমিতে হেক্টর প্রতি গড় বাৎসরিক উৎপাদন মাত্র ৭০-৮০ কেজি। দেশের বিভিন্ন খামারে যে সকল কারণে চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি পাচেছ না তার প্রধান কারণগুলো হচেছ,

প্রথমতঃ চাষ এলাকার মাটি ও পানির স্বল্পপুষ্টি। তাছাড়া উপাদান বৃদ্ধিকল্পে প্রায় ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় জৈব-অজৈব সার ব্যবহার করা হয় না। খামারগুলো অনেক বড় আয়তনের বলে এতে সার প্রয়োগসহ পরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষ করার সুযোগ থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ রাক্ষুসে মাছ ও অন্যান্য প্রজাতির মাছ জোয়ারের পানির সাথে খামারে প্রবেশ করে। অনেক খামারে পানি ঢোকানো ও বের করার সময় যথাযথ স্ক্রীনিং পদ্ধতি অবলম্বনের ব্যবস্থা নেই। ফলে পোনা মজুদ ও চাষ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যত্নবান হলেও উৎপাদন আশানুরূপ হয় না।

তৃতীয়তঃ উপকূলীয় এলাকায় জটিল প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে বিশেষ করে মাটির পি এইচ, পানির লবণাক্ততা ও তাপমাত্রার অস্বাভাবিক তারতম্যের ফলে চিংড়ি উৎপাদনে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

চতুর্থতঃ চিংড়ি রোগ-বালাই চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধিতে এক বড় ধরনের হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। চাষের নিবিড়তা বৃদ্ধির ফলে চাষীরা একদিকে চিংড়ি পোনা মজুদের হার বৃদ্ধি করছে অপরদিকে দুর্বল কারিগরী ব্যবস্থাপনা চিংড়ি চাষ ক্ষেত্রে রোগ বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। ১৯৯৪ সনে সর্ব প্রথম কক্সবাজার অঞ্চলে ২১টি আধা-নিবিড় খামারে হোয়াইট স্পট ভাইরাস রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সনে দেশের চিংড়ি চাষ এলাকায় ব্যাপক হারে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। প্রায় ৭৮৬৪১ হেক্টর জমির চিংড়ি ফসল রোগাক্রান্ত হয়ে আনুমানিক ১৩২৮৪ টন উৎপাদিত চিংড়ির ক্ষতি সাধন হয়।

৬। চিংড়ি চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও রপ্তানী আয়

চিংড়ি রপ্তানী করে জাতীয় আয়ের প্রায় ৯ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৮১-৮২ সনে চিংড়ি রপ্তানী করে ৯০.০৮ কোটি টাকা আয় করে। ১৯৯০-৯১ সনে ১৭৯৮৫ মেঃ টন চিংড়ি রপ্তানী করে ৪৫১.২২ কোটি টাকা, ১৯৯৪-৯৫ সনে ২৬২৭৭ মেঃ টন রপ্তানী করে ১০৪৫.৬৭ কোটি টাকা, ১৯৯৬-৯৭সনে ২৫৭৪২ মেঃ টন রপ্তানী করে

১১৮৮.৯১ কোটি টাকা, এবং ১৯৯৭-৯৮ সনে ১১৮১.৪৮ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। দেশে চিংড়ি শিল্পের উন্নয়নের ফলে এ সেক্টরে ব্যবসা করে অনেক শিল্পপতি লাভবান হয়েছেন এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৪.০০ লক্ষেরও অধিক লোক এ কাজে জড়িত রয়েছে।

৭। পরিবেশ সহনীয় চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা

চিংড়ি সেক্টরের উন্নয়নের ধারাকে টিকিয়ে রাখতে হলে চিংড়ি চাষে অথবা চিংড়ি চাষের জন্য যে সকল সমস্যা গুলোর উদ্ভব হচেছ তা অবিলম্বে সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশে প্রধানত বিদ্যমান সনাতন অথবা প্রচলিত পদ্ধতির চাষ নির্ভর। চিংড়ি চাষ শিল্পকে দ্রুত সম্প্রসারণের পাশাপাশি ১৯৯৪ সনে আধা-নিবিড় পদ্ধতি অবলম্বনের কারণে এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কারিগরী প্রযুক্তি প্রয়োগের অভাবে রোগ বিপর্যয় প্রকট রূপে দেখা দেয়। আধা -নিবিড় পদ্ধতি প্রচলনের ফলে অতিরিক্ত পোনার চাহিদা মেটানোর জন্য ১৯৯৫ সনে প্রায় ৪০ কোটি চিংড়ির পোনা বিদেশ থেকে অনুমোদিত উপায়ে আমদানি করা হয়। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পোনার সাথে এক ধরনের ভাইরাস জীবানু প্রবেশ করে। যা ভয়াবহ আকারে দেশের চিংড়ি চাষের সকল অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে ফসল হানি ঘটায়। সকল দিক বিবেচনা করে দেশে উন্নত প্রচলিত পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা যেতে পারে। যার গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি প্রায় ৫০০০ কেজি।

৮। চিংড়ি চাষ উন্নয়নে চিংড়ি চাষী সমিতি ও সরকারের ভূমিকা

ইহা দুঃখজনক হলেও সত্য যে বাংলাদেশে বর্তমানে জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে যে সকল চিংড়ি চাষী সমিতি রয়েছে, চিংড়ি চাষের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অস্পষ্ট। বিশ্বের অন্যান্য দেশে চিংড়ি চাষী সমিতি সংশ্লিষ্ট সেক্টরের উন্নয়নে এবং কারিগরি দিক নির্দেশনার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশের চিংড়ি চাষী সমিতি সাধারণতঃ চিংড়ি চাষের সুবিধার জন্য সরকার পক্ষের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়া সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব নিয়ে আসার দায়িত্ব পালন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু পরিবেশ সহনীয় উপায়ে চিংড়ি সম্পদের উন্নয়নের জন্য এবং কারিগরি কোন সমস্যার আলোকপাত ও তার সমাধানের বিষয়ে কোনরূপ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় না। যার ফলে চিংড়ি চাষের উন্নয়নের জন্য প্রকৃত সমস্যাদি সমাধান কল্পে সরকার পক্ষ হতে কোনরূপ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয না এবং কোন পদক্ষেপ গৃহীত হলেও তা সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে শুধু মাত্র উন্নয়নের স্বার্থে বিপুল পরিমাণ অর্থায়নে বিশালাকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয় ও তা বাস্তবায়ন করা হয়। যার ফলে এ সকল প্রকল্প সমাপ্তির পর দেশে চিংড়ি সম্পদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য এ সকল প্রকল্প এমন কোন চিহ্ন রেখে যায়নি যা চিংড়ি সম্পদ উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে মৎস্য অধিদপ্তরের এডিবি সাহায্যপুষ্ট দ্বিতীয় মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প এবং বিশ্বব্যাংক সহায়তাপুষ্ট তৃতীয় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পের নাম উল্লেখ করতে হয়। অর্থাৎ প্রকৃত উন্নয়ন সাধন ও সহনীয় পর্যায়ে এর উন্নয়নের ধারা ও সঞ্চারিত গতিকে অক্ষুন্ন রাখার ব্যবস্থা নেয়ার কার্যকর ভূমিকার অভাব রয়েছে। চিংড়ি চাষী সমিতি ও সরকার পক্ষকে সহাবস্থানে থেকে বাস্তব ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দেখতে হবে।

৯। চিংড়ি চাষে বিদ্যমান সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ

৯.১ চিংড়ি চাষ এলাকায় পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব যেমন- বেড়ীবাঁধ, পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন খাল, স্লুইচগেট, যাতায়াত ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সংযোগ ইত্যাদি কারণ চিংড়ি চাষ উন্নয়নে অন্যতম প্রতিবন্ধক। পরিকল্পিতভাবে সরকারী পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে চিংড়ি চাষ এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা জরূরী।

৯.২ সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশের সহনশীলতা নির্ভর চাষ পদ্ধতি অনুসরণে খামার পরিচালনা এবং প্রাকৃতিক নদী বা খালের পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রয়াস রোধ করা প্রয়োজন।

৯.৩ বর্তমানে চিংড়ি চাষের উপযুক্ততা বিচার বিবেচনা না করেই উপকূলীয় অঞ্চলের যে কোন স্থানে চিংড়ি খামার নির্মিত হয়েছে সেগুলোকে পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে দেয়া প্রয়োজন। তা ছাড়া থানা ও জেলা পর্যায়ে বর্তমানে যে চিংড়ি চাষ উন্নয়ন কমিটি রয়েছে তার কার্যকারিতা সুস্পষ্ট নয়। তাই মৎস্য অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে যে কমিটির রূপরেখা পেশ করা হয়েছে তা অবিলম্বে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন হওয়া আবশ্যক।

৯.৪ উপকূলীয় জেলাসমূহের যে সকল স্থানে চিংড়ি চাষ উপযোগী জমি রয়েছে তা চিহ্নিত করে চিংড়ি চাষের আওতায় আনা যেতে পারে।

৯.৫ বর্তমানে চিংড়ি চাষের জন্য ব্যবহৃত বিস্তীর্ণ এলাকাকে সংকুচিত করে শুধুমাত্র চিংড়ি চাষের জন্য উপযোগী অংশকে চিহ্নিত করে তাতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করে চিংড়ি চাষ করা যেতে পারে।

৯.৬ বিদ্যমান কারিগরী প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন জনবলের দ্বারা আধা-নিবিড় বা নিবিড় পদ্ধতির পরিবর্তে উন্নত প্রচলিত পদ্ধতিতে পরিবেশ সহনীয় পর্যায়ে চিংড়ি চাষের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।

৯.৭ চিংড়ি পোনা আহরণের প্রাক্কালে ব্যাপক হারে অন্যান্য প্রজাতির চিংড়ি ও মাছের পোনা ধ্বংস হয়। যা সামুদ্রিক মাছের মজুদের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। তাই চিংড়ি পোনা আহরণ ও পরিবহনে যত্নবান হওয়ার জন্য মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। বর্তমানে পোনা আহরণকারীরা ঠেলা জালের পরিবর্তে বেহুন্দী জালের আকারে তৈরী ছোট জাল ব্যবহার করে আরো ক্ষতি সাধন করছে যা আইনের মাধ্যমে বন্ধ করতে হবে।

৯.৮ আমাদের দেশে চিংড়ি চাষ প্রধানতঃ প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহীত চিংড়ি পোনার উপর নির্ভরশীল। তাই সময়মত চিংড়ি পোনার সরবরাহ অনিশ্চিত বলে খামারীগণ কোন সময়ই একসাথে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোনা মজুদ করতে ব্যর্থ হন। ফলে কয়েক মাস ধরে পোনা মজুদ ও আহরণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এতে চাষের সময় দীর্ঘ হয় এবং খামার পরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধি পায়। খামারে বিভিন্ন সময়ে পোনা ছাড়ার ফলে বড় আকারের চিংড়ি অতি সহজেই ছোটগুলোকে ভক্ষণ করে ফেলে।

তাই চিংড়ির পোনা উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা আহরণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার লক্ষ্যে বেসরকারী পর্যায়ে হ্যাচারীতে চিংড়ি পোনা উৎপাদনের জন্য উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করতে হবে।

৯.৯ সাম্প্রতিক রোগ প্রাদুর্ভাবের কারণে চিংড়ি চাষীরা বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন এবং চিংড়ি চাষে নিরুৎসাহিত হন। রোগ প্রতিরোধ করে পরিবেশ সহনীয় পর্যায়ে চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে চাষীদের মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী নিয়মিতভাবে চালু রাখা প্রয়োজন।

৯.১০ অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে প্রায় ক্ষেত্রেই চিংড়ি খামারীগণ আদর্শ চিংড়ি চাষের জন্য খামারের যে সকল তথ্য রাখা প্রয়োজন এবং খামার পরিচালনায় যাহা অবশ্যই করনীয় তা না করে খামারে কম উৎপাদনের জন্য শুধুমাত্র সাম্প্রতিক চিংড়ি রোগের প্রাদুর্ভাবকেই দায়ী করে থাকেন। চাষীদের মাঝে এ ধরনের প্রবনতা দেখা যাচেছ। সঠিক তথ্য উদঘটন করে তা বন্ধ করতে হবে। খামারের সঠিক তথ্যের অভাবে কোন চাষীকে কোন রূপ কারিগরী সহায়তা যথার্থভাবে প্রদান করা সম্ভব হয় না।

৯.১১ চিংড়ি খামারসমূহ উপকূলীয় প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় প্রায়শঃই প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস এর সম্মুখীন হয়। চিংড়ি চাষ খামারে কর্মরত শ্রমিক ও কারিগরী জনগণ যাতে দুর্যোগের প্রাক্কালে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারে তদজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯.১২ চিংড়ি চাষী ও উৎপাদিত চিংড়ি ফসলের নিরাপত্তার জন্য প্রত্যন্ত চাষ এলাকায় আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯.১৩ বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এনে চিংড়ি চাষ শিল্পকে সহনশীল পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট চিংড়ি চাষী, হ্যাচারী উদ্যোক্তা, প্রক্রিয়াজাতকারী, সরকারী-বেসরকারী চিংড়ি বিশেষজ্ঞ, মাঠকর্মী, ও বিজ্ঞানীদের মতামতের ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ চিংড়ি চাষ নীতিমালা প্রণয়ন এবং মাঠ পর্যায়ে তার সফল বাস্তবায়ন।

৯.১৪ চিংড়ির কম উৎপাদনের জন্য মূলতঃ খামারে (ক) প্রয়োজনীয় খাদ্যেও অভাব, (খ) অসহনীয় পরিবেশ, (গ) চিংড়ি রোগ, (ঘ) চিংড়ি ভূক প্রাণীর উপস্থিতি ও (ঙ) চিংড়ির খাদ্য গ্রহণে প্রতিযোগীদের উপস্থিতি প্রভৃতি চিহ্নিত করা হয়। সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ও চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যকর সমস্যার সমাধান অতি সহজেই করা যায়। আর এ সকল সমস্যার সমাধান করা হলে খামারে চিংড়ি উৎপাদন দিনে দিনে বৃদ্ধি পাবে।

চিংড়ি চাষ উন্নয়নে নার্সারি ব্যবস্থাপনা

কৃষিবিদ মোঃ রেজাউল করিম
মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা

বাংলাদেশে উপকূলীয় এলাকায় বাগদা চিংড়ির চাষ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। তবে চাষ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রচলিত সম্প্রসারিত চাষ (Extensive) পদ্ধতি এবং উন্নত সম্প্রসারিত চাষ (Improved Extensive) পদ্ধতি সর্বত্র অব্যাহত আছে। বর্তমান চিংড়ি চাষ পদ্ধতিতে চিংড়ি ঘেরে একক চিংড়ি চাষ হয় না বরং বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি এবং মাছ পাওয়া যায়। ঘেরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও চিংড়ির অনুপ্রবেশের ফলে মজুতকৃত চিংড়ির বেঁচে থাকার হার খুবই কম (২৫-৩০%)। বিভিন্ন ঘেরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট উৎপাদনের ৬০% বাগদা এবং ৩০-৪০% মাছ ও অন্যান্য চিংড়ি পাওয়া যায়। কিন্তু বাগদা চিংড়ি থেকে আয় হয় ৮০-৯০% এবং মাছ ও অন্যান্য চিংড়ি থেকে আয় হয় ১০-২০%। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা এবং স্থানীয় বাজারে চিংড়ির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় চিংড়ি চাষ এখনো লাভজনক। চিংড়ি চাষ আজকের প্রেক্ষাপটে চাষীদের কাছে এক বিরাট শিল্প বিপ্লব। এ শিল্পকে আরো লাভজনক এবং সাস্‌টেইনেবল (Sustainable) বা টেক্‌সই করার প্রত্যয়ে চিংড়ি চাষীরা নীরবে পরিশ্রম করে যাচ্ছে। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা, পোনার দুষপ্রাপ্যতা, মূল্য বৃদ্ধি এবং চাষকালীন সময়ে ব্যাপকহারে পোনা মৃত্যুর জন্য সাসটেইনেবল বা টেকসই প্রযুক্তি আদৌ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যার ফলে উৎপাদন ও আয় খুবই কম এবং চাষীরা কি পরিমাণ উৎপাদন পাবে সে বিষয়ে নিশ্চিত নহে। বর্তমান চাষ পদ্ধতিতে প্রতি হেক্টরে বার্ষিক গড় উৎপাদন ১৫০-২০০ কেজি। এ অবস্থা উত্তরণের লক্ষ্যে এবং উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে এ মুহূর্তে প্রয়োজন পোনার মৃত্যুর হার কমানো। পোনার মৃত্যুর হার কমানোর জন্য প্রয়োজন সুস্থ, সবল ও নিরোগ পোনা মজুত করা। সুস্থ সবল ও নিরোগ পোনা পেতে হলে নার্সারিতে ২০-২৫ দিন প্রতিপালনের পর ঘেরে পোনা মজুত করতে হবে।

নার্সারি কি ?

যে স্থানে পোষ্ট লার্ভা/পোনা যত্ন সহকারে লালন করে ৫-৬ সেঃ মিঃ পর্যন্ত বড় করা হয় উহাই নার্সারী বা আতুর পুকুর। চিংড়ি ঘের সংলগ্ন বা পার্শ্ববর্তী স্থানে অপেক্ষাকৃত ঢালু এবং যে স্থানে সব সময়ের জন্য পানি রাখা যায় এমন স্থানে নার্সারি স্থাপন করা উচিৎ। নার্সারির আয়তন ১ একর হওয়া ভাল। ঘেরের আয়তন বেশী বড় হলে একাধিক নার্সারি স্থাপন করতে হবে।

নার্সারি কেন করবো ?

চিংড়ী পোনা সাধারণতঃ পরিবেশের তারতম্যে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তাছাড়া দূর পাল্লায় পরিবহনজনিত কারণে পোনা পীড়িত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। এসব দুর্বল পোনা সরাসরি ঘেরে ছাড়া হলে অধিক হারে মারা যায়। পোনার মৃত্যুর হার কমানোর জন্য নার্সারিতে ২৫-৩০ দিন প্রতিপালন করা অপরিহার্য। নার্সারিতে পোনা প্রতিপালনের উপকারিতা নিম্নরূপঃ -

* নার্সারিতে পর্যাপ্ত খাদ্য থাকে।
* পরিবহনকৃত দুর্বল পোনা সহজেই নতুন পরিবেশ মানিয়ে নিতে পারে।
* স্বল্প সময়ে পোনা শক্তিশালী ও বড় হয়।
* ক্ষতিকর প্রাণীর আক্রমন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
* অবাঞ্চিত চিংড়ী বাছাই করা যায়।
* পোনার মৃত্যুর হার কমানো যায়।
* বেঁচে থাকার হার নির্ণয় করা যায়।
* উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়।
* সর্বোপরি ঘেরে সুস্থ ও সবল পোনা মজুত করা যায়।

নার্সারি নির্মাণ

এঁটেল দোঁয়াশ, এঁটেল মাটি কিংবা বেলে দোঁয়াশ মাটিতে নার্সারি নির্মাণ করতে হবে। এসিড সালফেটযুক্ত

বেলে অথবা পাথরযুক্ত মাটিতে নার্সারি নির্মাণ করা যাবে না। পাড়ের উচ্চতা প্লাবনমুক্ত হতে হবে। একটি উপযুক্ত নার্সারির বৈশিষ্ট্য হলোঃ-

* আয়তন = ১ (এক) একর
* তলা সমতল হওয়া
* মজবুত বেড়ী বাঁধের বেষ্টনী থাকা।
* পানি আদান-প্রদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা।
* নেট স্থাপনের মাধ্যমে ছেঁকে পানি তোলা।
* প্রাকৃতিক খাদ্য বিদ্যমান থাকা।
* রাক্ষুসে বা ক্ষতিকর প্রাণী নিয়ন্ত্রণে রাখা।
* ৫০-৬০ সেঃ মিঃ পানি থাকা।
* পরিমিত পোনা মজুত করা (একরে ৫০,০০০ টি)

নার্সারি প্রস্তুতের নিয়মাবলী

চিংড়ি পোনার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরীর প্রাথমিক পদক্ষেপ নেওয়াই নার্সারি প্রস্তুতের মূল উদ্দেশ্য। প্রাকৃতিক খাদ্যে মূল্যবান ভিটামিন, খনিজ পদার্থ এবং দেহ বর্ধনের সহায়ক উপাদান থাকে। চিংড়ি প্রাকৃতিক পরিবেশে সাধারণত প্লাংটন, ক্ষুদে পোকা ক্ষুদে শামুক/ ঝিনুক, কেঁচো এবং পঁচা জৈব পদার্থ খেয়ে বড় হয়। এসব জীব ও ক্ষুদে প্রাণী প্রাকৃতিক উপায়ে একটি বিশেষ পরিবেশে জন্মে। তাই উপযুক্ত পরিবেশের জন্য পরিকল্পিতভাবে পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নার্সারি পুকুর প্রস্তুতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। নার্সারিতে পানির গুণগত মান নিম্নরূপ থাকতে হবে।

গভীরতা	=	৫০-৬০ সেঃমিঃ।
তাপমাত্রা	=	২৫-৩০ সেঃ
পিএইচ	=	৭.৫-৮.৫
অক্সিজেন	=	৫-৮.৫ পিপিএম।

নার্সারির প্রস্তুতির উপর উৎপাদনের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই পোনা মজুতের পুর্বে পরিকল্পিতভাবে নার্সারি প্রস্তুতির ব্যবস্থা নিতে হবে। নার্সারি প্রস্তুতির পর্যায়ক্রমিক ধাপ বর্ণনা করা হলো।

* ক্ষতিকর আগাছা পরিস্কার করতে হবে।
* রাক্ষসে ও ক্ষতিকর প্রাণী অপসারণ করতে হবে।
* পুরাতন পানি নিস্কাশন করে ৬-৭ দিন রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।
* বাঁধ মেরামতপূর্বক সকল প্রকারের গর্ত বন্ধ করতে হবে।
* তলায় হালকা চাষ দিতে হবে।
* চাষ দেওয়ার পর তলা ধৌত করতে হবে।
* প্রতি শতকে ১ কেজি পরিমান চুন ছিটিয়ে দিতে হবে।
* চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর প্রতি শতকে ৮-১০ কেজি কম্পোস্ট/ হাস-মুরগীর বিষ্ঠা ছিটিয়ে দিতে হবে।
* প্রথমত ঃ ৭-১০ সেঃ মিঃ পানি তুলে ৫-৭ দিন অপেক্ষা করতে হবে।
* অতঃপর ২০-২৫ সেঃ মিঃ পর্যন্ত পানি তুলে রাসানিক সার প্রয়োগ করতে হবে।

সার প্রয়োগের মাত্রা নিম্নরূপ

প্রতি শতকে

ইউরিয়া = ১০০ গ্রাম
টিএসপি = ১০০ গ্রাম

* ১ম বার সার প্রয়োগের ১ দিন পর পুনরায় সমপরিমাণ সার দিতে হবে।

প্রতি শতকে

ইউরিয়া = ১০০গ্রাম
টিএসপি = ১০০গ্রাম

* ২য় বার সার প্রয়োগের ১ দিন পর পুনরায় সমপরিমাণে সার প্রয়োগ করতে হবে।

প্রতি শতকে

ইউরিয়া=১০০গ্রাম
টিএসপি=১০০গ্রাম

* একদিন অন্তর ৩ বার সার প্রয়োগের পর পানির রং সবুজ হলে ৫০-৬০ সেঃমিঃ পর্যন্ত পানি বৃদ্ধি করতে হবে।
* পানিতে প্রকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের পর পোনা মজুত করতে হবে।
* নার্সারিতে বাঁশের কুঞ্চি, নারিকেল/ খেজুর গাছের ডাল কাত করে পুতে দিতে হবে।

পোনা মজুত

ভাল উৎপাদন পেতে হলে বাছাই করে সুস্থ সবল ও নিরোগ পোনা মজুত করতে হবে। নার্সারিতে প্রতি শতকে ৫০০ টি পোনা মজুত করা যাবে। কিশোর বা চারা পোনা

২০-২৫ দিন প্রতিপালনের পর ঘেরে ছেড়ে দিতে হবে।

খাবার সরবরাহ

বিভিন্ন প্রজাতির ছোট আকারের চিংড়ি, প্লাংটন ক্ষুদ্র পোকা মাকড়, প্রাণীজ দ্রব্যাদি এবং পঁচা জৈব পদার্থ চিংড়ির প্রধান খাদ্য। নার্সরিতে প্রাকৃতিক খাদ্য বিদ্যমান থাকলেও পোনা মজুতের ১ সপ্তাহ পর সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের ব্যবস্থা নিতে হবে। পরিমিত খাবার দেহ বর্ধনের সহায়ক। তবে অতিরিক্ত খাবার যে কোন মূহুর্তে পানিতে পচন ক্রিয়ার মাধ্যমে পানি দূষিত করতে পারে। যে কোন কারণে নার্সারীর পানি দূষিত হলে পোনা পীড়িত হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে মারা যাবে। তাই খাবার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। চিংড়ী সর্বভুক্ত শ্রেণীর প্রাণী। এরা সবধরনের খাবার খায়। তবে আমিষ জাতীয় খাদ্য বেশি পছন্দ করে। চাউলের কুড়া, গমের ভূষি মাছের চূর্ন, ছোট আকারের চিংড়ি, মাছ, জীবের রক্ত, সরিষার খৈল ক্ষুদের ভাত একত্রে মিশিয়ে সম্পুরক খাবার তৈরী করা যেতে পরে। চিংড়ি খাদ্যে নিম্ন বর্ণিত উপাদান থাকা আবশ্যক।

আমিষ	=	৩০-৪০ ভাগ
শর্করা	=	৩০-৩৫ ভাগ
স্নেহ/চর্বি	=	৫-৭ ভাগ
ভিটামিন/ মিনারেলস	=	১-২ ভাগ

১ (এক) কেজি খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার নিম্নরূপঃ

দ্রব্যের বিবরণ	শতাংশ	পরিমাণ
ফিসমিল	৪০	৪০০ গ্রাম
চাউলের কুড়া	৩০	৩০০ গ্রাম
গমের ভুষি	১০	১০০ গ্রাম
চাউলের খুদ	২০	২০০ গ্রাম
ভিটামিন প্রিমিয়াম	-	৩-৫ গ্রাম

অথবা

দ্রব্যের বিবরণ	শতাংশ	পরিমাণ
ট্রাস ফিস	৬০	৬০০ গ্রাম
চাউলের কুড়া	২০	২০০ গ্রাম
ভাত (খুদের)	২০	২০০ গ্রাম

এক একর নার্সারীতে প্রতিদিন খাবার প্রয়োগের পরিমাণঃ

(পোনা মজুতের পরিমাণ = ৫০,০০০ টি)

সময়	পরিমাণ (কেজি)
১ম সপ্তাহ	০.৫০ কেজি
২য় সপ্তাহ	১.০০ কেজি
৩য় সপ্তাহ	২.০০ কেজি
৪র্থ সপ্তাহ	৩.০০ কেজি

প্রত্যহ সন্ধ্যায় ট্রে অথবা খাবার পাত্রে খাবার প্রয়োগ করতে হবে। পরের দিন ট্রে উঠিয়ে খাবার গ্রহণের পরিমাণ যাচাইপূর্বক খাবার প্রয়োগ করতে হবে।

নার্সারি ব্যবস্থাপনা

পোনা বেঁচে থাকার উপর চিংড়ি ঘেরে উৎপাদনের সাফল্য নির্ভর করে। ঘেরে একটি নার্সারি স্থাপন করে পোনার মৃত্যুর হার কমানো যায়। নার্সারি ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক পদক্ষেপ হলো ক্ষতিকর প্রাণী নিয়ন্ত্রণে রাখা। মাছ ও বড় বাগ্‌দা চারা পোনার প্রধান ভক্ষক। তবে অন্যান্য প্রাণী ও পোনা নিধন করে থাকে। যেমন সাপ কুচে ব্যাঙ কাকড়া ইত্যাদি। নার্সারিতে পোনা মজুতের পূর্বে চা- বীজের খৈল ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষতিকর প্রাণী নিধন করা যায়। তা ছাড়াও পানি প্রবেশ পথে নেট স্থাপনের মাধ্যমে ক্ষতিকর প্রাণীর অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। নার্সারিতে পোনা প্রতিপালনকালীন সময়ে কতিপয় বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবেঃ যেমন ঃ-

* রাক্ষুসে প্রাণীর অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
* ক্ষতিকর প্রাণী কর্তৃক বেড়ী বাঁধে সৃষ্ট গর্ত তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করতে হবে।
* পানির গভীরতা সঠিক রাখতে হবে।
* সার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
* পানির গুণগত মান ঠিক রাখতে হবে
* দুষিত বা ঘোলাটে পানি ঢুকতে দেওয়া যাবে না।
* নার্সারির ভিতরের পানি খোলা করা যাবে না।

মনে রাখতে হবে

* চিংড়ি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ পছন্দ করে।
* এসিড সালফেটযুক্ত মাটিতে চিংড়ী মারা যায়।
* অক্সিজেন কমে গেলে চিংড়ী দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মারা যায়।
* অধিক তাপমাত্রায় চিংড়ি মারা যায়।
* ঘোলাটে পরিবেশে চিংড়ি আহার বন্ধ করে দেয়।
* চিংড়ী পোনা গাছের ডাল বা ছোট গাছ আকড়িয়ে থাকতে পছন্দ করে। তাই নার্সারিতে হালকা ঘাস বা কুঞ্চি জাতীয় ডাল থাকা আবশ্যক।

বাংলাদেশে চিংড়ি পোনার প্রাপ্যতা ও সংরক্ষণ

কৃষিবিদ মোঃ শহীদুল ইসলাম
ডঃ সালেহ উদ্দিন আহম্মেদ
বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট, খুলনা

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে লোনাপানি অধ্যুষিত এলাকায় বাগদা চিংড়ির চাষ প্রায় পুরোপুরিভাবে প্রাকৃতিক পোনার উপর নির্ভরশীল। চিংড়ির লার্ভিগুলো ঢেউ ও জোয়ারের প্রভাবে গভীর সমুদ্র থেকে নদীর মোহনা ও ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে চলে আসে। যোগ্য পরিবেশ ও বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের সমন্বয়ে উর্বর এসব অঞ্চল চিংড়ির লার্ভির দ্রুত বর্ধণের জন্য খুবই উত্তম স্থান। বর্তমান চাহিদার তুলনায় পোনা প্রাপ্যতা কম বিধায় প্রাকৃতিক পোনার উপর চাপ অনেক গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। অফুরন্ত উপকুলীয় জলাশয় থেকে আহরিত পোনার সংখ্যা পূর্বের তুলনায় দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় পোনার মূল্য ও চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাগদার পোনা ব্যতীত সংগ্রহকারীদের নিকট অন্যান্য প্রানীর কোন কদর না থাকায় প্রতিদিন শুষ্ক/ উত্তপ্ত ডাঙ্গায় সে সব অতীব মুল্যবান জলজ প্রাণীগুলো ছুড়ে ফেলে দিয়ে নির্দয়ভাবে হত্যা করছে যা সৃষ্টি করছে জীব- বৈচিত্র সংরক্ষণে মারত্মক হুমকি।

মূল্যবান প্রাকৃতিক চিংড়ি ও অন্যান্য জলজ সম্পদের উপর এ যাবৎ পর্যন্ত তেমন কোন কাজ হয়নি। সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ নিমিত্তে বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের পাইকগাছাস্থ লোনাপানি কেন্দ্র হতে উপকুলীয় বিভিন্ন জেলার নদ-নদী মোহনা ও সমুদ্র সৈকতে চিংড়ি পোনার প্রাপ্যতা, জালে আহরিত বিভিন্ন প্রজাতির সংখ্যা (Catch composition), ডাঙ্গায় ফেলে দেয়া বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের সংখ্যা, পোনা সংগ্রহকারী ও বাৎসরিক ধৃত পোনার সংখ্যা ইত্যাদি নির্ণয়ের জন্য "Survey and Assessment of Shrimp Fry Resources of Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নিম্নে বর্ণিত উদ্দেশ্যবলীর উপর ভিত্তি করে ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়।

উদ্দেশ্যবলীঃ

(১) বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন স্বাদু ও লবণাক্ত চিংড়ি প্রজাতি সনাক্তকরণ।
(২) সম্ভাবনাময় নতুন চিংড়ি পোনার ক্ষেত্র চিহ্নিত করণ।
(৩) প্রধান প্রধান চিংড়ি প্রজাতিসমূহের প্রাপ্যতা ও বিস্তৃতি নির্ধারণ।
(৪) ধৃত বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি সাদা মাছ ও অন্যান্য প্রাণীর সংখ্যা (Catch composition) নির্ধারণ।
(৫) চিংড়ি পোনার বিস্তৃতির উপর পানির গুণাগুণ জোয়ার ভাটা ও ঋতুর প্রভাব নিরীক্ষণ/ পর্যবেক্ষণ।
(৬) এলাকা-ভিত্তিক প্রাকৃতিক উৎস হতে ধৃত বাগদা পোনার পরিমাণ নির্ণয়।
(৭) প্রাকৃতিক ভারসাম্যতার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ।
(৮) পোনা ধরায় নিয়োজিত লোকদের সংখ্যা নির্ধারণ।
(৯) পরিবহনে ধৃত পোনার মৃত্যুহার সমীক্ষণ।

কার্যপদ্ধতিঃ

গবেষণা কাজ মূলতঃ ১৯৯১ সনের এপ্রিল মাস থেকে শুরু হয় এবং প্রথম বৎসরে প্রাথমিক জরীপের কাজ সম্পন্ন করা হয়। ১৯৯২ সনে খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটের নির্বাচিত নদী সমুহ হতে বিভিন্ন জলজ প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ এবং আর্থ-সামাজিক জরীপের কাজ করা হয়। তৃতীয় বৎসরে (১৯৯৩) একই ধরনের কাজ বরগুনা, পটুয়াখালী ও ভোলা জেলায় করা হয়। ১৯৯৪ সনে নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন নদী, মোহনা ও সমুদ্র সৈকতে এ ধরনের কাজ পরিচালনা করা হয়। পরিবেশের ধারাবাহিক পরিবর্তন ও পোনার প্রাপ্যতা নির্ণয়ের জন্য ১৯৯৫-৯৭ সন পর্যন্ত খুলনা, সাতক্ষীরা,

বাগেরহাট, পটুয়াখালী, ভোলা ও কক্সবাজার অঞ্চলে জরীপ কাজটি পুনরায় পরিচালনা করা হয়।

মাসিক/ পাক্ষিক ভিত্তিতে বাশের ফ্রেম যুক্ত ১ মি.মি. ফাঁক বিশিষ্ট নাইলন জাল (১.৬ মি X ০.৬মি) দিয়ে জলজ প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করা হয়। শারীরিকভাবে স্রোতের বিপরীতে অগভীর পানিতে এ জাল টানা হয়। প্রতিটি টানের সময় হলো ১০ মিনিট। প্রতিবারে জালে ধৃত জলজ লার্ভিগুলো প্লাষ্টিক পটে নিয়ে ৫% হারে বাফারিং ফরমালিন দ্রবণে সেগুলো সংরক্ষণ করা হয়। পটগুলো গবেষণাগারে নিয়ে এসে জলজ লার্ভাগুলো সনাক্ত করা হয়।

গবেষণা লব্দ ফলাফল ঃ

ধৃত জলজ লার্ভিগুলোকে প্রধানত ঃ চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ বাগদা চিংড়ি, অন্যান্য চিংড়ি, সাদা মাছ ও ম্যাক্রোজুপ্ল্যাংকটন ইত্যাদি। সনাক্তকৃত প্রধান প্রধান অন্যান্য চিংড়ি প্রজাতি গুলো হলো বাগতারা (Penaeus semisulcutes), চাপদা/চাকা (Penaeus indicus), হরিনা (Metapenaeus monoceros), হন্নি (Metapenaeus brevicornis) গোসা (Met apenaeus dobsoni), রশনাই (Palaemon styliferus), ছটকা (Macrobrachium malcolmsonii) ও গলদা Macrobrachium rosenbergii)। সাদা মাছ ঃ পাইসা (Liza parsia), খরকুনো (Rhinomugil corsula), ভাংগন (Mulgil cephalus), ভেটকী (Lates calcarifer),পাংগাস (Pangasius pangasius), ইলিশ (Tenualosa ilisha), পুটি (Puntius spp.),টেংরা (Mystus spp), লইটা (Harpodon nehereus) ও বাইলা (Glossogobius spp) ইত্যাদি। বিভিন্ন ধরনের প্ল্যাংকটন হল ঃ এসিটিস (Acetes sp), মাইসিটস, কপিপট, আইসোপট, অ্যালিমা ও কাঁকড়া লার্ভি।

গবেষণা কার্য চলাকালীন উপকূলীয় জেলাসমূহে বিভিন্ন থানাধীন নিম্নলিখিত নির্বাচিত নদী ও সমুদ্র সৈকত থেকে মাসিক/ পাক্ষিক ভিত্তিতে বিভিন্ন জলজ প্রাণীর নমুনা ও পানির গুণাগুণ সংগ্রহ করা হয়েছে।

* ভোলা জেলার চরফ্যাশন থানা হতে ৭ কি. মি. দক্ষিণে মেঘনা নদীর নিম্নাঞ্চলে একটি সম্ভাবনাময় চিংড়ি পোনা ক্ষেত্র চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে।
* বৃহত্তর খুলনা, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা ও নোয়াখালী অঞ্চলে বাগদা পোনা প্রাপ্তির সর্বোত্তম সময় হলো ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল এবং মে মাস। কক্সবাজার অঞ্চলে ডিসেম্বর- মে/ জুন মাস পর্যন্ত পোনার প্রাপ্যতা সবচেয়ে বেশী। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার

ক্রমিক নং	অধ্যয়ণ ক্ষেত্র (জেলা)	স্থান (থানা)	নমুনায়ন নদী/ সমুদ্র সৈকত
১)	খুলনা	পাইকগাছা, কয়রা, তালা, ডুমুরিয়া	শিবসা, কয়রা, ভদ্রা ও কপোতাক্ষ
২)	সাতক্ষীরা	দেবহাটা, কালিগঞ্জ ও শ্যামনগর	ইছামতি, কাকশিয়ালী, কালিন্দি, খলপেটুয়া ও মাদার
৩)	বাগেরহাট	রামপাল, মোড়েলগঞ্জ ও মংলা	মংলা, পশুর ও পানগুচি
৪)	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	আন্দারমানিক ও কোয়াকাটা সমুদ্র সৈকত
৫)	বরগুনা	পাথরঘাটা	বিশখালী ও বালেশ্বর
৬)	ভোলা	চরফ্যাশন	মেঘনা নদীর নিম্নাঞ্চল
৭)	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর ও হাতিয়া	মেঘনা নদীর নিম্নাঞ্চল
৮)	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম সদর ও পতেঙ্গা	কর্ণফুলী ও পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত
৯)	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর, চকরিয়া, টেকনাফ ও কুতুবদিয়া	কক্সবাজার, টেকনাফ ও কুতুবদিয়া সমুদ্র সৈকত, নাফ নদী ও চকরিয়া চ্যানেল।

জোয়ার ভাটায় বাগদা পোনা সবচেয়ে বেশী ধরা পড়ে।

* বাগদা পোনা ব্যতিত জলজ অন্যান্য প্রজাতির প্রাপ্যতায় বৎসরের বিভিন্ন মাসে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এদের প্রাপ্যতায় সামঞ্জস্য তেমন নেই বললেই চলে।

* জরীপ অঞ্চলে পানির বিভিন্ন এলাকার তাপমাত্রার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি কিন্তু এলাকা ভিত্তিক লবণাক্ততা খুব বেশী উঠা নামা করে থাকে। অন্যান্য অঞ্চলের (বৃহত্তর খুলনা, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম) লবণাক্ততার (০-২৪ পিপিটি) তুলনায় কক্সবাজার অঞ্চলে লবণাক্ততার মাত্রা (১৪-৩৪ পিপিটি) সবচেয়ে বেশী।

* ধৃত জলজ প্রাণীদের বাৎসরিক গড় সংখ্যায় (Catch composition) সর্বোচ্চ স্থানে আছে ম্যাক্রোজুপ্ল্যাংকটন এবং তৎপরবর্তীতে রয়েছে অন্যান্য চিংড়ি এবং সাদা মাছ। বাগদা পোনার স্থান সর্বনিম্ন। উপকূলীয় অন্যান্য জেলার (বৃহত্তর খুলনা, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, নোয়াখালী ও চট্রগ্রাম) তুলনায় কক্সবাজার এলাকায় বাগদা পোনার প্রাপ্যতা বেশী। যার সম্ভাব্য কারণ হিসাবে ঢেউ ও জোয়ারের প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং অন্যান্য এলাকার তুলনায় বেশী লবণাক্ততার মাত্রাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবস্থানগত দিক থেকে নির্বাচিত অন্যান্য স্থানগুলো (কুয়াকাটা সৈকত ব্যতিত) মূল সমুদ্র থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হওয়ায় জোয়ার ও ঢেউ এর সরাসরি কোন প্রভাব নেই এবং লবণাক্ততার মাত্রাও সেই সকল স্থানে অনেক কম। বাগদা পোনা ব্যতিত অন্যান্য প্রাণীর প্রাপ্যতা আবার কক্সবাজার এলাকার তুলনায় অন্যান্য অঞ্চলে অনেক অনেক বেশী।

* জোয়ার ভাটা অধ্যুষিত জলাশয়ে পোনা সংগ্রহকারীরা বিভিন্ন ধরনের জাল ব্যবহার করে পোনা ধরে থাকে। জালে ধৃত বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী থেকে তারা কাংখিত বাগদা পোনা বেছে নিয়ে অন্যান্য প্রজাতি গুলোকে ডাঙ্গায় ফেলে দিয়ে ব্যাপকভাবে বিনষ্ট করে যাচ্ছে।

* লবনাক্ত পানির বিভিন্ন নদী-নালা, মোহনা ও সমুদ্র সৈকত থেকে বিভিন্ন বয়সের গরীব লোকেরা জাল দিয়ে প্রায় প্রতিদিন বাগদার পোনা আহরণ করছে। উপকুলীয় জেলাসমুহের হাজার হাজার লোক এ কাজে সাথে জড়িত।

সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতিসমুহ

উপকুলীয় জলাশয় গুলোতে বাগদা পোনা আহরণ কালে পোনার সাথে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি, জুপ্ল্যাংকটন ও সাদা মাছের লার্ভি প্রচুর পরিমাণে ধরা পড়ে- যে গুলো একে অন্যের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। খাদ্য পিরামিডের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় পিরামিডে বড় প্রাণীদের তুলনায় ছোট প্রাণীরা সবচেয়ে বড় স্থান দখল করে আছে। বড় প্রানীগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ছোট প্রানীদের উপর নির্ভরশীল। প্রতিদিন বিভিন্ন প্রজাতির অসংখ্য লার্ভি বিনষ্ট হওয়ায় প্রানীকূল থেকে এক বিরাট অংশ হারিয়ে যাচ্ছে। ব্যাহত হচ্ছে তাদের প্রজনন ও ডিম দেওয়ার ক্ষমতা। উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অন্যদিকে বিনষ্ট হচ্ছে জলজ প্রানীদের বিচরণ ভূমি। জীবের বৈচিত্র ও উপকূলীয় অঞ্চলে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য অতিদ্রুত নিম্নের পদক্ষেপ সমুহ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

১. প্রতি বৎসর এপ্রিল -মে মাসে নদীর মোহনা থেকে পোনা আহরণ পুরাপুরি নিষিদ্ধ করা।

২. গন মাধ্যম (রেডিও, টেলিভিশন) এর সাহায্যে অপূরনীয় ক্ষতি সম্পর্কে পোনা সংগ্রহকারীসহ সকল পেশার লোকদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং পোনা আহরণ কালে ধৃত মূল্যবান অন্যান্য প্রজাতির লার্ভির কোনরূপ ক্ষতি না করে সেগুলো পুনারায় জলাশয়ে ছেড়ে দেয়ার পরমর্শ প্রদান।

৩. উপকূলীয় বেকার লোকদেরকে কারিগরী প্রশিক্ষণ দিয়ে (পোনা আহরণ ব্যতিত) কর্মসংস্থানের অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

৪. অমূল্য সম্পদ বাগদার প্রাকৃতিক মজুদ রক্ষার্থে উপকুলীয় উপযুক্ত স্থান সমূহে বাগদা চিংড়ি হ্যাচারী স্থাপনার মাধ্যমে কাংখিত পরিমাণ পোনা উৎপাদন করে প্রাকৃতিক পোনার উপর চাপ হ্রাস করা।

অপরিকল্পিত বাগদা চিংড়ি চাষ ও পোনা আহরণ ঃ উপকূলীয় পরিবেশ ও জীব বৈচিত্রের উপর এর প্রভাব

ডঃ এম. এ. হোসেন
বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইন্‌ষ্টিট্যুট, কক্সবাজার।

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, "Don't burn the candle at both ends" এর মর্মার্থ আমরা সবাই জানি কিন্তু বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ করি না। উদাহরণ স্বরূপ সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবহারের কথাই ধরা যাক, আমরা প্রাকৃতিক উৎসে প্রাপ্ত যে কোন পূনঃপূনিক ব্যবহারের যোগ্য সম্পদ (renewable resource) আহরণের ক্ষেত্রে সেই লোভী চাষীর মতই আচরণ করি, যে সব সোনার ডিম এক সঙ্গে পাওয়ার জন্য রাজহাঁসকেই বধ করেছিল।

সন্দেহ নেই, বাগদা চিংড়ি চাষ এবং সমুদ্র উপকুল থেকে এর পোনা আহরণ আমাদের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। হ্যাচারিতে ব্যবহৃত বাগদা ব্রুড, বাণিজ্যিক ভাবে আহরিত বাগদা চিংড়ি, বিহুন্দি জালে ধরা পড়া ছোট বাগদা চিংড়ি এবং চাষের জন্য আহরিত বাগদা পোনা আসলে একই উৎস থেকে আসে। এরা উৎপাদন চক্রের বিভিন্ন আবস্থানে থাকে, তাই, পরিকল্পিত পদ্ধতিতে এদের আহরণ না হলে এই সম্পদ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। প্রাকৃতিক উৎসে ব্রুড থেকে পোনা উৎপাদিত হয়। এই পোনা আঁতুড় অবস্থায় উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বা পারাবনে আসে। একটু বড় হবার পর এরা আবার গভীর সমুদ্রে ফিরে যায়, ধীরে ধীরে বাণিজ্যিকভাবে আহরণ উপযোগী এবং পরবর্তীতে ব্রুডে রূপান্তরিত হয়। এই চক্রাকার উৎপাদন ব্যবস্থার কোন পর্যায়ে অত্যাধিক আহরিত হলে সমুদয় চক্রই ভেঙ্গে পড়ার আশংকা দেখা দেয়।

অপরিকল্পিত ভাবে বাগদার পোনা আহরণ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক উৎসে এর পরিমাণই কমিয়ে দেয় না বরং একটি মাত্র বাগদা পোনা আহরণের ফলে শতাধিক অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর পোনার ধ্বংস সাধন করে। এছাড়াও ম্যানগ্রোভ বা পারাপন যা বাগদা পোনার আঁতুড় স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তা উপকূলীয় বাগদা চিংড়ি চাষের প্রভাবে, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের কারণে, ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে এবং মানুষের অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রতিনিয়তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। উপকুলে বাগদার পোনা ধরা, এদের আঁতুড় স্থান ধ্বংস করা ছাড়াও উপকুলীয় বিহুন্দি জাল ব্যবহারে অন্যান্য মাছ ও চিংড়ির সাথে প্রচুর পরিমাণে ছোট ছোট বাগদা চিংড়ি ধরা পড়ে। এছাড়াও বাগদা চিংড়ির প্রজনন ক্ষেত্রে বটম ট্রলিং এর মাধ্যমে অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং বড় চিংড়ি বাণিজ্যিক ভাবে আহরিত হয়। আমরা সঠিক ভাবে জানিনা বিদেশী ট্রলারসমূহ অবৈধ ভাবে কি হারে বাগদার প্রজনন ক্ষেত্র থেকে চিংড়ি আহরণ করছে। প্রজনন ক্ষেত্র থেকে ডিম ছাড়ার মওশুমে অপরিকল্পিত ভাবে ব্রুড পর্যায়ের চিংড়ি আহরিত হলে তা প্রাকৃতিক পরিবেশে চিংড়ি উৎপাদনের ভারসাম্য নষ্ট করে। আমাদের মনে রাখতে হবে বাণিজ্যিকভাবে চিংড়ি আহারণ ছাড়াও আমরা হ্যাচারির জন্য ব্রুড এবং চাষের জন্য অধিকাংশ পোনা প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগ্রহ করি।

উপকূলীয় চিংড়ি চাষ, যা মূলত বৈদেশিক বাণিজ্যমূখী, এবং এর বিকাশ ঘটেছে অত্যন্ত দ্রুত, কিন্তু অপরিকল্পিত, অনিয়ন্ত্রিত এবং সমন্বয় ছাড়া। উপকূলীয় চিংড়ি চাষের প্রসারের সাথে সাথে পরিবেশগত, বাস্তুসংস্থানগত এবং জীব বৈচিত্রের উপর এর কি কি প্রভাব পড়তে পারে এ সম্পর্কে কোনরূপ আনুপুঙ্খিক সমীক্ষা চালানো সম্ভব হয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে যে সব কাজ হয়েছে তার ফলাফল এবং সম্ভাব্য প্রভাব এর সাথে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র নির্ণয় করা সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় প্রাকৃতিক উৎস থেকে বাগদা চিংড়ি পোনা আহরণ কালে অন্যান্য প্রজাতি ভিত্তিক পোনা মৃত্যুর হার জানা না থাকলে

এবং প্রকৃতিক উৎস থেকে ঐসব প্রজাতির আহরণ মাত্রা পূর্বের তুলনায় একই ফিসিং প্রেসারে কমে না গেলে, বাগদা পোনা ধরা কালে ঐ সব প্রজাতির পোনা নিধন এদের উৎপাদন হ্রাস করেছে, এমন মন্তব্য বিজ্ঞান ভিত্তিক নয়। যাই হোক, অতীতে বাগদা পোনা ধরার সময় অন্য পোনা নিধন সম্পর্কে সর্তকবাণী উচ্চারন সহ, পোনা ধরার লোজকনদের ট্রেনিং দেওয়া এবং অন্য প্রাজাতির পোনাদের সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার উৎসাহ দেওয়া হলেও- বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে তা ফলপ্রসু হয়নি। ষাটের দশকে সবুজ বিপ্লবের প্রসার ঘটাতে দেশে দানা শস্যের উৎপাদন বাড়াতে যেয়ে যেমনভাবে আমরা স্বাদু পানির মৎস্য সম্পদের দারুণ ক্ষতি করেছি, তেমনিভাবে নব্বই দশকে বৈদেশিক মুদ্রার দ্রুত জোগান দেওয়ার মানসে অপরিকল্পিত চিংড়ি চাষ প্রসার করতে গিয়ে এই চাষ ব্যবস্থাকেই হুমকির মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

আমরা প্রায়শই একটি কথা ভুলে যাই, সমুদ্র বিশাল হলেও এর সম্পদ কিন্তু অফুরন্ত নয়। সমুদ্রে পুনঃপূনিক বৃদ্ধির মাধ্যমে যে সম্পদ উৎপাদিত হয় তা বিজ্ঞান ভিত্তিক উপাত্ত নির্ভর প্রক্রিয়া ছাড়া আহরণ করা হলে অতি আহরণজনিত কারণে ঐ সম্পদের বিলুপ্তি ঘটতে পারে। সমুদ্রে অফুরন্ত সম্পদের ভান্ডার একটিই, তাহলো লবণ, যার অতি আহরণ জনিত সমস্যা নেই। প্রাকৃতিক উৎসে অতি আহরণজনিত কারণে বাগদা চিংড়ির পোনার স্বল্পতা ছাড়াও চাষকৃত এলাকায় পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ হুমকির মুখোমুখি। ১৯৯৪ সালে অধিক ঘনত্বের আধা নিবিড় চাষে বাগদা চিংড়ির ভাইরাসজনিত রোগে মড়কের আলামত দেখা দেয়ার পর তা পরবর্তীতে অল্প ঘনত্বের চাষেও ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে দেশে আধা-নিবিড় চাষ নেই বলেলেই চলে। অল্প ঘনত্বের চাষ থেকে এই রোগ নির্মূল হয়নি। তুলনামূলক বিচারে উপকুলীয় জলভাগ স্বাদু পানির আভ্যন্তরিণ জলভাগ অপেক্ষা কম দুষিত হলেও উপকূলীয় পারাবন নির্মূলের ফলশ্রুতিতে বাস্তুসংস্থানগত বিপর্যয় উপকুলীয় অঞ্চলেই বেশি হয়েছে। যদিও বর্তমানে উপকুলীয় অঞ্চলের ক্ষুদ্রাংশ মাত্র চিংড়ী চাষাধীন (২.৫ মিলিয়ন হেঃ উপকূলীয় মৃদু লবনাক্ত জোনের ০.১২ মিলিয়ন হেঃ চিংড়ি চাষের অধীন), কিন্তু অপরিকল্পিত চাষের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবেশ, বাস্তুসংস্থানগত ও আর্থসামাজিক নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে অপরিকল্পিতভাবে বাগদা চিংড়ি চাষের ফলে উপকুলীয় অঞ্চলের নাজুক বাস্তুসংস্থানগত অবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। উপকূলীয় চিংড়ি চাষের প্রভাব সরাসরি পড়ে পরাবনের উপর। প্রথমত পরাবন পরিষ্কার করে চিংড়ি চাষের জমি উদ্ধার করা হয়। তদুপরি পারাবন রেখেও যদি লবণাক্ত পানি দীর্ঘ মেয়াদি ভাবে আবদ্ধ রাখা হয় তবে পরিবেশগত পরিবর্তনের জন্য অধিকাংশ ম্যাংগ্রোভ বা পারাবন মারা পড়ে। উপকুলীয় পারাবনের ধ্বংস পরিবেশগত, অর্থনৈতিক এবং আবহাওয়া সমস্যা ছাড়াও নানা দিক দিয়ে বিপর্যয় ডেকে আনে।

পারাবন উপকূলীয় অঞ্চলের মাটি ও পানির পুষ্টি চক্র (Nutrient cycle) সমাধা করে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করে। উপকুলীয় জোয়ার-ভাটায়, স্বাদু ও লবণ পানির মিশ্রণ স্থলে পারাবন বিশেষ বাস্তুসংস্থানগত ভারসাম্যতায় সামুদ্রিক জীবদের আঁতুড় অবস্থায় খাদ্য আহরণ ও বেঁচে থাকার পরিবেশ সৃষ্টি করে। পারাবন নির্মূলের ফলে উপকুলীয় ভুমিক্ষয় বৃদ্ধি পায়, সামুদ্রিক তলানি (Oceanic sedimentation) পদ্ধতিতে পরিবর্তন সাধিত হয়, তটরেখার দীর্ঘস্থায়িত্ব হুমকির সম্মুখীন হয় এবং সর্বোপরি উপকুল ভাগ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় সম্পূর্ণ অরক্ষিত থাকে। তাই অতীতে দেখা গেছে পারাবনের উপস্থিতিতে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে জান ও মালের ক্ষয়ক্ষতি কম কয়েছে।

উপকুলীয় পরিবেশে ভারসাম্য রক্ষা করে পারাবন। আমাদের দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বা পারাবন হিসেবে খ্যাত। বর্তমানে সংকোচিত সুন্দরবনের ৭০০,০০০ হেক্টরের মাঝে ৫০০,০০০ হেক্টর পারাবনে আচ্ছাদিত। এই পারাবনের গাছসমুহ বেশ বড় ও লম্বা। এছাড়াও এক সময়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অনেক পারাবন ছিল। কক্সবাজার অঞ্চলের অধিকাংশ পারাবন চিংড়ি চাষের আগে-পরে অবলুপ্ত হয়েছে। অবশ্য চিংড়ি চাষের জন্যই সব পারাবন ধ্বংস হয়েছে বলা যাবেনা। জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে প্রাথমিকভাবে উপকুলীয় পারাবন পরিস্কার করে চাষাবাদ শুরু হয় এবং পরবর্তীতে এর অংশ বিশেষ চিংড়ি খামারে পরিণত হয়। কক্সবাজার জেলার নাফ নদীর তীরবর্তী পারাবনে এককালে দুষ্প্রাপ্য কাঁকড়া খেকো বানর দেখা যেতো। আজ তার কোন অস্তিত্ব নেই।

প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট পারাবন উপকূলীয় লোনাপানির জোয়ার ভাটার বিধৌত অঞ্চলে এমন পরিবেশগত ও বাস্তুসংস্থানগত অবস্থার সৃষ্টি করে যা উপকূলীয় চিংড়ি চাষের উপযুক্ত। কিন্তু পারাবন সম্পুর্ণ ভাবে নষ্ট করা হলে এবং সদ্য পরিষ্কার করা পারাবন অঞ্চলে পুকুর সৃষ্টির মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠা করা হলে উপরের স্তরের মাটি সরে গিয়ে নিচের স্তরের অম্লীয় মাটি (Acid sulphate soil) উম্মুক্ত হয়ে পড়ে এবং মাছ বা চিংড়ি চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। অথচ পারাবন থাকাকালীন পুষ্টি-চক্রের (Nutrient cycle) প্রভাবে এসব এলাকা সামুদ্রিক জীবের আঁতুড় অবস্থার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে। পারাবন অঞ্চল সামুদ্রিক মাছ ও চিংড়ির লার্ভা অবস্থায় প্রয়োজনীয় ডয়াটম সহ অন্যান্য উদ্ভিদ ও জীব প্ল্যাংকটনের উৎপাদনে সহায়ক। তাই পারাবনাঞ্চলে চিংড়ি চাষ শুরু হলে স্বাভাবিক ভাবেই নাজুক বাস্তুসংস্থানগত অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং প্রাকৃতিক জীব বৈচিত্রের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এতে সামুদ্রিক নানা প্রজাতির প্রজনন ও আঁতুড় ক্ষেত্র Breeding & Nursing ground) ধ্বংস হয়ে যায়। পারাবন বিনষ্ট করে চিংড়ি খামার করা ছাড়াও এসব অঞ্চল থেকে অপরিকল্পিত ভাবে চিংড়ি পোনা আহরণ জীব বৈচিত্রের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। চিংড়ির পোনার সাথে ধৃত সামুদ্রিক নানা প্রজাতির মাছ ও চিংড়ি পোনা বিনষ্ট হওয়ার ফলে সামগ্রিকভাবে বঙ্গোপসাগরের সম্পদের উপর কি প্রভাব পড়ছে তা নির্ভুলভাবে নিরূপণ করা এখনো সম্ভব হয়নি। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী সামুদ্রিক মাছের বার্ষিক গড় উৎপাদন বিগত এক দশকে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই উৎপাদন বৃদ্ধি মাছ ধরার প্রয়াস (Fishing instensity) বৃদ্ধির কারণেই ঘটেছে। অতি আহরণ জনিত উৎপাদন বৃদ্ধির কুফল দেখা দিতেও কয়েক বৎসর সময় লাগে। আঁতুড় অবস্থায় পোনা বিনষ্টের কুফল জানার জন্য আরো দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়াও বলা যায় আঁতুড় আবস্থায় চিংড়ি পোনার সাথে বিনষ্ট হওয়া সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য চিংড়ি পোনা সামগ্রিকভাবে আমাদের প্রাকৃতিক সামুদ্রিক সম্পদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে বাধ্য, কারণ এসব পোনা আঁতুড় অবস্থায় বিনষ্ট না হলে পরে সমুদ্রে ফিরে গিয়ে বড় হবে এবং পরবর্তীতে জেলেরা তা ধরতে পারবে। যাই হোক, উপকুলীয় পারাবন বিনষ্ট করে চিংড়ি খামার করলে খামারের অম্লমাটি উন্মুক্ত হয় বিধায় খামারের পানির অম্লতাও বৃদ্ধি পায়। পরিণামে খামারে ব্যবহার করতে হয় প্রচুর পরিমাণে চুন। চুন হিসেবে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং বাইকার্বনেট যাই ব্যবহার করা হোক না কেন এতেও দীর্ঘমেয়াদিভাবে পরিবেশের ক্ষতি সাধন হয়। বাণিজ্যিক এসব চুনে হেভি মেটালের দূষণ থাকে বিধায় পরিবেশ এসব হেভি মেটালের আয়নে দুষিত হয়ে পড়ে এবং মাছের দেহে তা জমা হতে পারে। পরবর্তিতে এসব মাছ খাদ্য হিসেবে গ্রহণের ফলে মানুষের দেহেও জমা হয়ে স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে পড়তে পারে। অবশ্য বাংলাদেশের অধিকাংশ খামারে কম ঘনত্বে চিংড়ি চাষ করা হয় বিধায় চুনের ব্যাবহার তুলনামূলক ভবে খুবই কম, তাই এতদ্‌সংশ্লিষ্ট হেভি মেটালের ভয়ও কম।

বাংলাদেশে বর্তমানে যে পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ হচ্ছে এ ব্যবস্থায় একর প্রতি চিংড়ি উৎপাদন খুবই কম। এর পরও বছরের পর বছর একই জমিতে বাগদা চিংড়ির চাষ পরিবেশ সহনীয় এবং টেকসই নয়। চাষ ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে চিংড়ির সাথে অমাংসাশী মাছের মিশ্র চাষ অথবা ফসল চক্রের মাধ্যমে বছর ভিত্তিক বা ঋতুভিত্তিক মাছ ও চিংড়ির চাষ অধিকতর পরিবেশ সহনীয় ও টেকসই পদ্ধতি হিসেবে টিকে থাকার সম্ভাবনা বেশি। এতে প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি পোনার চাহিদা তুলনামূলকভাবে কমে যাবে। কিন্তু পরিকল্পিত চাষ এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চিংড়ি খামারের গড় উৎপাদন না কমে গুণগত ও পরিমাণগত ভাবে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ গুটিকয় হাতে-গোনা চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে একটি, যেখানে চিংড়ি চাষ ও হ্যাচারির মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সমান্তরাল ভাবে অর্জিত হয়নি। আশার কথা বর্তমানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাগদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন বাংলাদেশে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই প্রাকৃতিক উৎসের পোনার উপর চাপ কমবে। ঘের পদ্ধতির চাষীদের মাঝে একটি ভ্রান্ত ধারনা অছে যে, হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা ব্যবহার করা হলে ঐ পোনা কম বাঁচে। এ ধারনা ভূল, সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে পোনা অবমুক্ত করা হলে কোন সমস্যা হবার কথা নয়। দীর্ঘ দিন ব্যাপী প্রাকৃতিক পোনা ব্যবহার, ঘেরের নিকটবর্তী অঞ্চলে এই পোনার প্রাপ্যতা, সারা বৎসর ব্যপী প্রাকৃতিক পোনা ধরা প্রভৃতি

কারণে চাষীদের ঐ পোনা সম্পর্কে দুর্বলতা থাকতে পারে। তবে প্রকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, সর্বোপরি চিংড়ি শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে হ্যাচারির পোনা ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে। তবে হঠাৎ করে প্রকৃতিক পোনা ধরায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলে আর্থ-সামাজিক একাধিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। দুই দশক ব্যাপী এ পোনা ধরা এবং বিপননে বহু লোকের কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও প্রাকৃতিক উৎসের পোনা পরিকল্পিতভাবে ধরা হলে পরিবেশ ও সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এর জন্য প্রয়োজন বাগদা চিংড়ির পোনার জন্য উপকুল অঞ্চলে নির্দিষ্ট স্থানে অভয়াশ্রম ঘোষণা এবং ঘোষিত অঞ্চলে পোনা ও চিংড়ি আহরণ নিষিদ্ধ করা, অবশ্য আমাদের দেশে ঘোষণা দিয়ে কাজ পাবার সম্ভাবনা কম বিধায় তা বাস্তবায়নে যাথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৯৮৮ সালে পরিচালিত এক সমীক্ষার আলোকে বাংলাদেশে বার্ষিক ৩০০-৩৫০ কোটি বাগদা পোনা আহরণের তথ্য আছে। এর পর চিংড়ি চাষের বিস্তৃতির কারণে এবং বর্তমানে হ্যাচারি উৎপাদিত পোনা পাওয়া যাওয়া সত্বেও কম বেশি উল্লেখিত পরিমাণের বাগদা পোনা প্রাকৃতিক উৎস থেকে আহরিত হয় বলে ধারনা করা যায়। এমতাবস্থায় হ্যাচারি উৎপাদিত পোনা ব্যবহারে চাষীদের উৎসাহিত করার মাধ্যমে প্রাকৃতিক উৎসের পোনা ব্যবহার ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনতে হবে। এর ফলে প্রাকৃতিতে বাগদার পরিমাণ বাড়তে এবং হ্যাচারির জন্য পর্যাপ্ত ব্রুড এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সমুদ্র থেকে বেশি পরিমাণে চিংড়ি আহরণ করা সম্ভব হবে। এর ফলে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে চিংড়ি শিল্প টেকসই পর্যায়ে উন্নীত হবে।

চিংড়ি চাষে প্রাকৃতিক পোনার গুরুত্ব কমে গেলে সামুদ্রিক অপরাপর প্রজাতির পোনা নিধনও বন্ধ হবে। এতে উপকূলীয় অঞ্চলের জীব বৈচিত্রের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। বর্তমানে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে যে পরিমাণ জমিতে বাগদা চিংড়ির চাষ হচেছ এর পরিমাণ আর না বাড়িয়ে ব্যবহৃত জমিতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্যমে নিরোগ এবং স্বাস্সম্মত পদ্ধতিতে চিংড়ি উৎপাদনের ব্যবস্থা নেয়া হলে বর্তমানের উৎপাদন মাত্রাকে ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। তবে পরিবেশের কথা বিবেচনা করে চিংড়ি উৎপাদন করতে হবে পরিবেশ সহনীয় এবং টেকসই পদ্ধতি অনুসরণ করে। মিশ্রচাষ এবং ফসল-চক্র ব্যবহারের মাধ্যমে একই জমিতে এক সংগে অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য চিংড়ি এবং অভ্যন্তরিণ চাহিদা মেটানোর জন্য মাছ চাষ করা যেতে পারে।

খাঁচায় তেলাপিয়া ও পাংগাসের লাভজনক চাষ

জিয়াউল হক
জাকির হোসেন
আলমগীর রহমান
শ্যামল কান্তি বর্মন ও
নাসীম আহমেদ আলীম
কেইজেস প্রজেক্ট, কেয়ার বাংলাদেশ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

উন্মুক্ত জলাশয়ে খাঁচায় মাচ চাষ বাংলাদেশে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। দেশে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান খাঁচায় মাছ চাষের সম্ভাবনা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে যার মধ্যে কেয়ার বাংলাদেশের কেইজেস প্রকল্প অন্যতম। যদিও এ চাষ'পদ্ধতি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বেশ জনপ্রিয় তথাপি বাংলাদেশে এটি এখনো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে আছে। বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার সাথে বিস্তৃত জলাশয়ে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ খাঁচায় চাষ করে প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা গেছে বেশ কয়েকটি প্রজাতি সফল ভাবে খাঁচায় চাষ করা যায়। তার মধ্যে তেলাপিয়া ও পাংগাস উল্লেখযোগ্য। খাঁচায় তেলাপিয়া ও পাংগাসের সফল চাষ পদ্ধতি সহ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

স্থান নির্বাচন

বিল, ঝিল, পুকুর, হাওর, বাওড়, নদী, প্লাবন ভুমি, সেচ খাল প্রভৃতি স্থাপন করা যায়, তবে দূষণ মুক্ত, যেখানে সারা বছর কমপক্ষে ৫/৬ ফুট পানি থাকে, জলজ উদ্ভিদের আধিক্য নেই, জোয়ার-ভাটা, স্রোত ও ঘোলাত্বের প্রভাব কম জলাশয়ে এমন একটি স্থান খাঁচায় মাছ চাষের জন্য নির্বাচন করা উচিত।

খাঁচা তৈরী

খাঁচা দু'ধরণের হতে পারে- ভাসমান এবং স্থির। স্থির খাঁচা সাধারনত: অপেক্ষাকৃত কম গভীর জলাশয়ে স্থাপন করা হয়, যেখানে জোয়ার ভাটা ও স্রোতের প্রভাব কম। পক্ষান্তরে, ভাসমান খাঁচা অগভীর এবং গভীর উভয় ধরনের জলাশয়ে স্থাপন করা যায়। খাঁচা সাধারনত: আয়তাকার এবং বর্গাকার। খাঁচার আয়তন হয়ে থাকে ১-১২ ঘনমিটার। খাঁচা থেকে মাছের পলায়ন রোধ করার জন্য খাঁচার উপরিভাগে একটি জালের ঢাকনা সংযোজন করা হয়। আমদানীকৃত ব্লাক পলিইথিলিন জাল খাঁচা তৈরীতে উৎকৃষ্ট, যার স্থায়ীত্ব দীর্ঘদিন। এছাড়াও টায়ার কর্ড জাল ব্যবহার করা যায়, কিন্তু এটি তেমন টেকে না ও কাকঁড়ায় কাটার সম্ভাবনা থাকে। জালের কাঠামো তৈরীতে ৩ সূতি ব্যাসের লোহার ফ্রেম ব্যবহার করা হয়, বিকল্প হিসাবে পিভিসি পাইপ দিয়ে তৈরীকৃত ফ্রেম ব্যবহার করা যেতে পারে। খাঁচাকে পানির পরিভাগে ভাসমান রাখতে খাঁচার চার কোনে প্লাষ্টিকের বয়া সংযোজন করা হয়। বর্তমানে এক ঘনমিটার খাঁচা মাছ চাষে উৎকৃষ্ট প্রমানিত হয়েছে, কারণ এতে ঝুঁকি কম, ব্যবস্থাপনা সহজ এবং পুঁজি কম লাগে।

খাঁচা স্থাপন

খাঁচাকে জলাশয়ে আলাদা আলাদা ভাবে স্থাপন করা যায়, তবে ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে এক স্থানে পাশাপাশি স্থাপন করা উত্তম। পানিতে ভাসমান অবস্থায় খাঁচাগুলোকে শক্ত করে বাঁশের খুঁটির সাথে বেধেঁ রাখা হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে ভাসমান অবস্থায় খাঁচার উপরিভাগ যেন পানি থেকে কমপক্ষে ৩-৬ ইঞ্চি উপরে থাকে, খাঁচা পানির তলদেশের মাটি থেকে বেশ উচুঁতে স্থাপন করা হয় যাতে ভালভাবে পানি চলাচল নিশ্চিত হয় এবং কাকঁড়া জাল কাটতে না পারে। খাঁচাকে অবশ্যই মাছ মজুদের এক সপ্তাহ পূর্বে পানিতে স্থাপন করা উচিৎ। এতে খাঁচার জালে শেওলা জমে কোমল হয় এবং মাছের দেহে এবং মুখে আঘাতে লাগে না।

পোনা মজুদ

পোনার আকার সাধারণতঃ ২-৩ ইঞ্চি হয়ে থাকে। তবে আরো বড় আকারের পোনা মজুদ করা ভাল। বড় আকারের পোনা সহজে খাবার খেতে পারে এবং দ্রুত

বৃদ্ধি পায়। খাঁচায় পোনার মজুদ ঘনত্ব নির্ভর করে মাছের প্রজাতি ও এর আকারের উপর। খাবার উপযোগী মাছ তৈরীর জন্য গিফ্‌ট তেলাপিয়া ও পাংগাস মাছের পোনা প্রতি ঘনমিটারে যথাক্রমে ৩০০ ও ১০০ টি মজুদ করা যেতে পারে। মজুদ কালীণ পোনা পরিবহনে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করা উচিৎ, এতে পরিবহন জনিত মৃত্যুর আধিক্য সহজেই এড়ানো যাবে।

খাবার এবং খাবার প্রয়োগ প্রদ্ধতি

খাঁচার মাছ চাষে সম্পূরক খাবার সমগ্র বিনিয়োগের একটি বড় অংশ দখল করে থাকে। উপযোগী খাবার প্রয়োগ পদ্ধতি এবং স্থানীয় ভাবে সহজলভ্য খাদ্য উপাদান ব্যবহার করে সম্পূরক খাবারের ব্যায়ের পরিমাণ হ্রাস করা যেতে পারে। সাধারণতঃ পিলেট আকৃতির খাবারের বাজার দর বেশী, সেক্ষেত্রে স্থানীয় ভাবে প্রাপ্ত খাবারের ব্যাবহার বাঞ্চনীয়। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে খাবারে যাতে আমিষের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ নিশ্চিত থাকে। স্থানীয় ভাবে প্রাপ্ত খাবারের উপাদানগুলোর মধ্যে চালের কুড়া, ক্ষুঁদ, গমের ভুষি, আটা, ক্ষুদি পানা, চিটা গুড়, শুটকী মাছ, শামুক, ঝিনুক ও কেঁচো অন্যতম এবং সহজলভ্য। তবে বাজারের পিলেট খাবার ব্যবহারে ঝামেলা কম, ফলাফল ভাল, কিন্তু তাতে খরচ বেশী হবে। বল আকারে এবং ছিটিয়ে,দুভাবেই খাবার প্রয়োগ করা যায়। তবে পিলেট খাবার ছিটিয়ে প্রয়োগ করা উত্তম। এতে খাবারের অপচয় খুবই কম হয়। বল আকারে প্রয়োগের ক্ষেত্রে খাঁচার অভ্যন্তরে স্থাপিত ট্রেতে খাবার প্রয়োগ করতে হয়।

খাঁচা ব্যবস্থাপনা

খাঁচা ব্যবস্থাপনাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়- খাঁচার যত্ন, জালের যত্ন, মাছের যত্ন। খাঁচার যত্ন বলতে খাঁচার চারপাশের জলজ আগাছা দমন, খাঁচার অভ্যন্তরের মৃত মাছ অপসারণ, খাঁচার অভ্যন্তরে জমে থাকা তলানি সরিয়ে ফেলা, খাচার কাঠামোর যত্ন নেয়া, বয়া সমূহ ঠিক আছে কিনা দেখা, খুটির সাথে খাঁচার বাঁধন ঠিক আছে কিনা এবং খাবার প্রয়োগের ট্রে ঠিক আছে কিনা ইত্যাদি বুঝায়। পানির স্তর উঠা নামার সাথে খাঁচা স্থানান্তর করা এবং খাচা পাহাড়া খাঁচার যত্নের আওতায় পড়ে। জালের যত্ন বলতে নিয়মিত খাচার জাল পরিস্কার করা এবং তাতে কোন ছিদ্র হয়েছে কিনা তা লক্ষ্য রাখা এবং মেরামত করা বুঝায়। মাছের যত্ন বলতে মাছের সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে রোগ-ব্যাধির প্রতিকার ও দেহের বৃদ্ধির পরিমাণ আশাব্যঞ্জক কিনা তা পরীক্ষা করা বুঝায়। সফল ভাবে খাঁচার চাষে উপরোক্ত ব্যবস্থাপনাসমূহ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

মাছ আহরণ এবং বাজারজাতকরণ

চাষীরা সাধারণতঃ প্রতিটি উৎপাদন চক্রে ৪-৬ মাস খাঁচায় মাছ চাষ করে থাকে। তবে প্রজাতি ভেদে এবং চাষ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে বাজারজাতকরণ সময়কালের তারতম্য হতে পারে। তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে একটি চক্রে ৫-৬ মাস চাষ করা হয়। পক্ষান্তরে পাংগাস ৮-৯ মাস চাষ করা হয়। ভাল বাজারজাতকরণ কৌশল এবং দরের উপর নির্ভর করে প্রত্যাশিত লাভ। সুতরাং প্রত্যাশিত লাভ পাবার জন্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে সতর্কতা ও সঠিক কৌশল অবলম্বন করা উচিৎ। নিম্নে পাংগাস ও গিফ্‌ট তেলাপিয়ার চাষে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো, যা থেকে পাঠক সহজেই খাঁচায় এ'দুটি প্রজাতির চাষের কৌশল সম্পর্কে অধিকতর স্বচ্ছ ধারণা পাবেন এবং উৎসাহিত হবেন।

প্রত্যাশিত লাভ অর্জনে করণীয়

সঠিক স্থান নির্বাচন।

সুস্থ্য-সবল পোনা নির্বাচন।

৪-৬ ইঞ্চি আকৃতির পোনা মজুদ।

খাঁচার আকার অনুযায়ী সঠিক ঘনত্বে পোনা মজুদ।

যথাযথ ভাবে কন্ডিশনিং করে পোনা পরিবহন ও মজুদকরণ।

নিয়মিত (দিনে ২-৩ বার), পরিমিত পরিমানে এবং আমিষ সমৃদ্ধ খাবার প্রয়োগ। নিয়মিত খাঁচা পরিস্কারকরণ ও পরিচর্যা। মাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ।

সঠিক সময়ে (ঈদ, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, মাসের প্রথম সপ্তাহ, ইত্যাদি সময়ে) বাজারজাতকরণ। চাষকালীন সময়ে খাঁচার মাছকে বেশী নাড়াচারা না করাই উত্তম। প্রয়োজনে খাঁচা নাড়াচারা করার সময় অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ।

উপসংহার

বাংলাদেশের বিশাল এবং অব্যবহৃত জল সম্পদকে সহজেই খাঁচার মাছ চাষের মাধ্যমে উৎপাদনের আওতায় আনা সম্ভব। দেশের বেকার যুব সমাজ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষতঃ মহিলাদের এ আয় উপার্জনমূলক কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের অর্থনৈতিক এবং পুষ্টিঘাটতি পূরণে সহায়ক ভূমিকা রাখা যাবে।

টেবিল- ১ঃ ট্রায়ালে ব্যবহৃত উপকরন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি		
বিবরণ	গিফ্‌ট তেলাপিয়া	পাংগাস
চাষের স্থান	কেইজেস ফার্ম, দাউদকান্দি	কেইজেস ফার্ম, দাউদকান্দি
জলাশয়	মেঘনা-গোমতী নদী	মেঘনা-গোমতী নদী
জালের ধরণ	ব্লাক পলিইথিলিন	ব্লাক পলিইথিলিন
খাঁচর আকৃতি	২ X ১.৩ X ১.৯ মিটার	১ X ১ X ১ মিটার
কার্যকরী পানির ঘনত্ব	৪.৪ ঘনমিটার	১ ঘনমিটার
উৎপাদন চক্র	৩১.১২.৯৬ থেকে ৩.৫.৯৭	১৮.১০.৯৬ থেকে ২১.৯.৯৭
উৎপাদন কাল	১২৪ দিন	৩৩৮ দিন
মজুদ ঘনত্ব	৩৫০ টি	১০০ টি
খাবারের ধরণ	সৌদী বাংলা (গ্রোয়ার)	সৌদী বাংলা (গ্রোয়ার)
খাবার প্রয়োগের হার	যতক্ষণ মাছ খেতে পারে	যতক্ষণ মাছ খেতে পারে
খাবার প্রয়োগের সময়	দিনে ২-৩ বার	দিনে ২ বার
দৈনিক বৃদ্ধির হার পর্যবেক্ষণ	করা হয়নি	মাঝে মাঝে করা হয়েছে

টেবিল- ২ঃ মজুদ এবং উৎপাদন		
বিবরণ	গিফ্‌ট তেলাপিয়া	পাংগাস
মজুদ		
গড় ওজন (গ্রাম)	১০	৩.২৪
সংখ্যা / ঘনমিটার	৩৫০	১০০
সংখ্যা / প্রতি খাঁচা	১৫৪০	১০০
জীবভর (কেজি / খাঁচা)	১৫.৫	০.৩২
জীবভর (কেজি / ঘনমিটার)	৩.৫	০.৩২
আহরণ		
গড় ওজন (গ্রাম)	৯৯.০	৭৩৮
আহরণের হার	৯৯%	৯৬%
মোট উৎপাদন (কেজি / খাঁচা)	১৫০.৫	৭১
মোট উৎপাদন (কেজি / ঘনমিটার)	৩৪.২	৭১
এফ সি আর	১.৪২	১.৮১

টেবিল- ৩ঃ আয় ব্যায় হিসাব		
বিবরণ	গিফ্‌ট তেলাপিয়া	পাংগাস
খাঁচা তৈরীর খরচ	৭২৫	৪৫৯
অবচয়	১৬৭	২১৭
পোনা	৭৮৩	৩৫০
খাবার	৩০৬৬	২০৪৮
গড় খাবার খরচ (টাকা / দিন)	২৫	৬
মোট খরচ	৪০১৫	২৬১৫
মাছের মূল্য (টাকা / কেজি)	৪৬	১০০
মোট বিক্রয় (টাকা)	৬৯২৫	৭১০০
নিট লাভ	২৯১০	৪৪৮৫
বিনিয়োগের উপর প্রাপ্তি (%)	৭২	১৭১.৫

সমাজভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনা

মোঃ আবদুর রহমান
কৃষিবিদ প্রহলাদ চন্দ্র দে
প্রশিকা, ঢাকা।

বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামে ও শহরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে, জাতীয় আমিষের চাহিদা পূরণে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য খাতের অবদান বর্তমানে শুধু তাৎপর্যপূর্ণই নয়, বরং এর সম্ভাবনাও অপরিসীম। গ্রামীণ জনগণের শতকরা প্রায় ৭৩ ভাগ লোক মৎস্য আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপনন সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত। আমাদের জাতীয় আয়ের প্রায় ৫ শতাংশ, রপ্তানী আয়ের প্রায় ৮ শতাংশ এবং কৃষি সম্পদ থেকে আয়ের ১৪ শতাংশ আসে মৎস্য সম্পদ থেকে (ডি ও এফ-১৯৯৭)। প্রায় ১২ লক্ষ লোক সার্বক্ষণিকভাবে এবং ১.২ কোটি লোক তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য খাতে নিয়োজিত আছে।

বাংলাদেশে মোট মৎস্য উৎপাদন ১.৩৭ মিলিয়ন মেঃ টন। মোট উৎপাদনের প্রায় ৫০ শতাংশ আসে আহরিত মাছ থেকে (ডি ও এফ-১৯৯৭)। বাংলাদেশে রয়েছে প্রায় ১০ হাজার জলমহাল। উক্ত জলমহালের মালিক ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য বিষয়ে ব্যবস্থাপনায় রয়েছে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়। এই সকল জলমহাল ভূমি মন্ত্রণালয় দীর্ঘদিন ধরে উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে শুধুমাত্র রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে ১-৩ বৎসর ভিত্তিক লীজ দিয়ে থাকে। নিলামে রেজিষ্টার্ড মৎস্যজীবী সমিতির নামে লীজ নিয়ে থাকে সাধারণতঃ প্রভাবশালী, অমৎস্যজীবী, ক্ষমতাবান এবং বহিরাগত জনগণ। এমনকি দেখা গেছে কুমিল্লার লোক ময়মনসিংহের বিল লীজ নিয়েছে যেমন- হুরাইলবিল।

অভ্যন্তরীণ জলাশয়গুলোতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আশির দশক থেকে বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়ে আসছে উক্ত প্রকল্পগুলোর আওতায় মৎস্যজীবী এবং দরিদ্র জনগণের অংশগ্রহণ, অভয় আশ্রম তৈরী, জলমহাল ব্যবস্থাপনা এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা ছিল না। সেই সুযোগে নব্বই এর দশকে প্রথমে "মুক্ত জলাশয়ে উন্নত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (IMOF)" এবং পরে "সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (সিবিএফএম)'' বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য সামনে রেখে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

* সমাজের সুফলভোগীদের দ্বারা জলমহালের বিকল্প ব্যবস্থাপনা তৈরি করা।
* সমাজের সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
* স্থানীয় মৎস্যজীবী এবং দরিদ্র জনগণের কাছে জলাশয় লীজ দেয়ার ব্যবস্থা করা।
* বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয়ের সমবন্টনের ব্যবস্থা করা।
* দরিদ্র জনগণের জলমহালে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পটির (সিবিএফএম) প্রথম ধাপ জুন'৯৯ সনে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা, সরকার, দাতা সংস্থা ও সুফলভোগীদের যৌথ উদ্যোগে সাফল্যজনকভাবে শেষ হয়েছে। প্রশিকা এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ৮টি নদীর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। সিবিএফএম প্রকল্প বাস্তবায়নে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণ বিভিন্ন জলমহালে বিভিন্নভাবে ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত ছিল যাতে সমাজের সকল শ্রেণীর জনগণ জলমহালের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে। উক্ত জলমহালগুলোর ধরণ ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

জলমহালের ধরণ ও বৈশিষ্ট্য ঃ

জলমহাল বলতে সাধারণতঃ বুঝায় যে সকল জলাশয় পাবলিক বা সরকারী সম্পত্তি এবং যেখানে পানি রয়েছে এবং তাহা লীজ হতে পারে অথবা নাও হতে পারে যেমন স্রোতস্বিনী কালি নদী।

জলমহাল ব্যবস্থাপনা ঃ

জলমহালের মৎস্য সম্পদের সম্ভাবনা, ব্যাপ্তি এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে স্থায়িত্বশীল ও টেকসই ব্যবস্থাপনা কমিটি (আর.এম.সি.) এবং বিল বা বাওড় ব্যবস্থাপনা কমিটি (বি.এম.সি.) ইত্যাদি। জলমহাল ব্যবস্থাপনা বলতে বুঝায় মৎস্যজীবীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিমিত মৎস্য আহরণ, অভয়াশ্রম সৃষ্টি, ৯ ইঞ্চির নীচে মাছ না মারা এবং জলজ সম্পদের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও ব্যবহার।

নিম্নে জলমহালের ধরণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলোঃ

টেবিল-১. জলমহালের ধরণ ও বৈশিষ্ট্য।

ক্রমিক নং	জলমহালের ধরণ	বৈশিষ্ট্য
১.	বিল/হাওড়	* সারা বৎসর অথবা বছরের বেশীর ভাগ সময় পানি থাকে। * বদ্ধ জলাশয় যেমন হুরাইল বিল, ভালুকা অথবা মুক্ত জলাশয় যেমন সিংহরাগী বিল, দেলদুয়ার। * মৎস্য চাষ অথবা আহরণ হতে পারে।
২.	নদী	* সারা বৎসর পানি থাকে। * স্রোত হয়। * মৎস্য আহরণ এবং অভয়াশ্রম করা যায়। * বছরে কোন মৌসুমে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ হতে পারে যেমন আড়িয়াল খাঁ নদী।
৩.	বাওড়	* সারা বৎসর পানি থাকে এবং বন্যায় সাধারণত তলায় না। * মৎস্য চাষ করা যায়। * বদ্ধ জলাশয় যেমন শিমুলিয়া ও কৃষ্ণচন্দ্রপুর বাওড়।

জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচন ঃ

জলমহালের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে নদী বা বিলের তীরবর্তী ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের সকল স্তরের জনগণকে নিয়ে জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচন করা হয়। যেমনঃ

* প্রশিকা বা অন্য কোন বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক সংগঠিত মৎস্যজীবী বা অন্যান্য গরীব দলীয় সদস্য।
* সংগঠিত মৎস্যজীবী ছাড়াও অন্যান্য মৎস্যজীবী।
* মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কাঠা মালিক ইত্যাদির প্রতিনিধি।
* স্থানীয় প্রভাবশালী, ক্ষমতাবান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা মেম্বার বা রাজনৈতিক ব্যক্তি বা স্কুল শিক্ষক।
* প্রশিকা বা অন্য কোন বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি।
* থানা মৎস্য কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা।

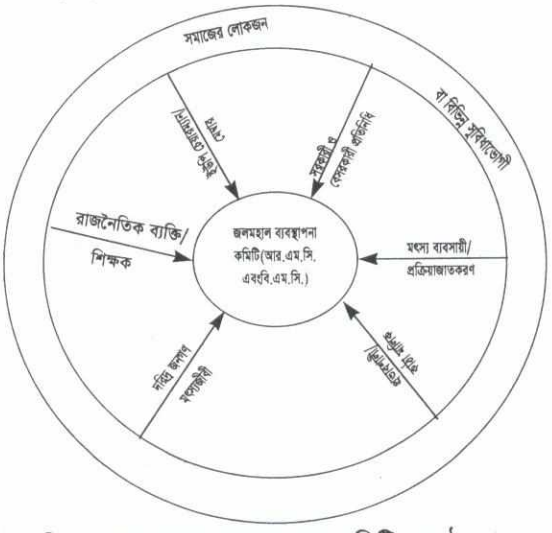

চিত্র -১ জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামো।

জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ
জলমহাল ব্যবস্থাপনার সকল কৌশল ও নীতি নির্ধারণ করবেন জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি যেমনঃ

* সকল প্রকার সুফলভোগীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
* মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভয়াশ্রম সৃষ্টি করা।
* মৎস্য চাষ, মাছ সংরক্ষণ এবং পরিমাণমত মৎস্য আহরণের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা।
* অবৈধ কাঠা অপসারণ এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন করা।
* মৎস্যজীবীদেরকে সরকারী কর্মকর্তার সাথে আলাপ-আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করা।
* বর্তমানে প্রচলিত মৎস্য আইন অনুসারে জলমহাল ব্যবস্থাপনার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারা।
* জলাশয়ে মৎস্যজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে মৎস্যজীবী ও দরিদ্র জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করা।
* মুক্ত জলাশয়ের সর্বোচ্চ ব্যবহারে সমাজের সকল জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে সহায়তা করা।
* জলমহাল থেকে যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী অধিকতর সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করা।
* পারিবারিক আয় বৃদ্ধির জন্য দরিদ্র জনগণের আয় ও কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প প্রদান করা।
* কমিটির সদস্য এবং দলীয় সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা।
* রাজস্ব আদায়ের জন্য সংগঠিত মৎস্যজীবীদের সহযোগিতা করা।

জলমহালের অবস্থাঃ

সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পটি ১৯৯৫ সনে সরকারী ও এনজিওদের দ্বারা যৌথভাবে ১৯টি জলমহালে বাস্তবায়ন হয়ে আসছে। উক্ত প্রকল্প আরম্ভ হওয়ার পূর্বের এবং পরের কিছু অবস্থা তুলে ধরা হলো।

শিক্ষনীয় বিষয়সমূহ ঃ

* বিলে মৎস্যজীবীদের অধিকার অনেকটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু নদীগুলি উন্মুক্ত হওয়ার ফলে মৎস্যজীবী ও দরিদ্র জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা দূরহ হয়ে পরেছে।
* জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি (বি:এম.সি. এবং আর.এম.সি.) আরো শক্তিশালী করতে হবে। অন্যথায় সমাজ ভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনা কঠিন হয়ে পরবে।
* নদী এবং বিলের তীরবর্তী সমগ্র মৎস্যজীবী ও দরিদ্র জনগণকে দলের আওতায় আনা।
* মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আয় ও কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
* সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং প্রাথমিক সংগঠনের যৌথ সহযোগিতা ছাড়া জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি সঠিকভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারবে না।
* প্রতিটি জলমহালে শক্তিশালী মৎস্যজীবী ও দরিদ্র জনসংগঠন ব্যতিত জলমহালে মৎস্যজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে না।
* প্রকল্পের কাজ আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে জলমহাল হস্তান্তর করতে হবে অন্যথায় প্রকল্প বাস্তবায়ন সঠিকভাবে হবে না।

সুপারিশসমূহ ঃ

* মৎস্যজীবী ও দরিদ্র জনগণের সংগঠিত সমিতিতে জলমহাল ৫-১০ বৎসরের জন্য লীজ দেয়া।
* ভূমি মন্ত্রণালয় হতে জলমহালগুলি মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করা এবং ২য় ধাপে ভূমি মন্ত্রণালয়কে উক্ত প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করা।
* মৎস্যজীবীদেরকে প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবানদের কবল হতে রক্ষা করার লক্ষ্যে শক্তিশালী সংগঠন ও সহজ শর্তে প্রয়োজনীয় ঋণের সুযোগ করে দেয়া এবং মহিলাদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা।
* মৎস্যজীবীদের দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
* নদী থেকে কাঠা দূর করা।
* জলমহালে রাজস্ব বা লীজ মূল্য প্রতি বৎসর ১০% হারে বৃদ্ধি না করা।
* সরকারী, বেসরকারী সংস্থা ও প্রাথমিক সমিতির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক জোড়দার করা।

টেবিল- ২. জলমহালের পূর্বের ও বর্তমান অবস্থা তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা হলো।

ধরা	১৯৯৫ সনের পূর্বের অবস্থা	বর্তমান (১৯৯৯) অবস্থা
জলমহালে অধিকার প্রতিষ্ঠা	প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাবানরা জলমহাল নিয়ন্ত্রণ করতো।	মৎস্যজীবী এবং দরিদ্র জনগণ জলমহালে প্রায় সম্পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে আইনের জন্য তা হয়ে উঠছে না।
মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা	ছিল না।	মৎস্যজীবীরা সংগঠিত হওয়ার ফলে নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
মাছ ধরার সরঞ্জাম	মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার সরঞ্জাম প্রায় ছিল না।	প্রশিকা ও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা থেকে ঋণ পাওয়ার ফলে অধিকাংশ মৎস্যজীবী মাছ ধরার সরঞ্জাম কিনতে পেরেছে।
আর্থ-সামাজিক অবস্থা	খুব খারাপ ছিল।	অধিকাংশ মৎস্যজীবীদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভাল যেমন প্রায় ৭০% মৎস্যজীবীর খাদ্যে অভাব নাই। তাদের জাল ও নৌকা হয়েছে, আয় বেড়েছে এবং তারা বিভিন্ন আয়মূলক প্রকল্প সম্পর্কে অবগত হয়েছে।
অবৈধ মাছ ধরার সরঞ্জাম	খুব বেশী ব্যবহার হত।	সংগঠিত মৎস্যজীবীরা অবৈধ মাছ ধরার সরঞ্জাম ব্যবহার করছেনা এবং অন্যদেরকেও ব্যবহার না করার জন্য সচেতন করতেছে।
মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ	প্রায় ছিল না।	জলমহাল ব্যবস্থাপনায় মৎস্যজীবীদের অংশগ্রহণ আশাতীতভাবে বেড়েছে।
স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতনতা	প্রায় ছিল না।	স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি হয়েছে। যেমন পরিমান মত মাছ ধরা, মাছের পোনা না ধরা এবং জলাশয়ের জৈব ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে তারা বুঝতে পেরেছে।

উপসংহার ঃ

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে দারিদ্র বিমোচনের জন্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। বাংলাদেশে রয়েছে বিরাট মুক্ত জলাশয়। গরীব জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই মুক্ত জলাশয়ে তাদের অভিগম্যতা বাড়ানো এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে দরিদ্র জনগণকে জলমহাল ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করাতে হবে এবং জলমহাল তাদের মাঝে দীর্ঘ মেয়াদী লীজ দিতে হবে। তবেই মৎস্যজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে এবং দারিদ্র বিমোচন সম্ভব হবে।

মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন

আনোয়ার হোসেন সিকদার
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী জেলে সমিতি, ঢাকা।

দেশ আমাদের, সরকার আমাদের, আবার আমরাও সরকারের তথা এই দেশেরই লোক। সরকার যদি তাদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে কেবল কাজ করতে চান, তাহলে মৎস্যজীবীদের পক্ষে মৎস্য আহরণ, মৎস্য চাষ, মৎস্য উৎপাদন, মৎস্য বাজারজাতকরণ কোন কিছুই সম্ভব হবে না। এখানে উভয় পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণ করে কাজ করতে হবে। যেহেতু মূল উৎস মৎস্যজীবীরা, তাই তাদের স্বার্থের প্রতি প্রাধান্য দিতে হবে এবং এই স্বার্থ একমাত্র জলমহাল ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়েই দেয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশের প্রায় ১৫ থেকে ২০ লক্ষ লোক সার্বক্ষনিক ভাবে এবং ১.২ কোটি লোক খন্ডকালীনভাবে অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় ১২ শতাংশ লোক তাদের জীবন-জীবিকা অর্জনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য পেশায় নিয়োজিত আছে। দেশের রপ্তানী আয়ের প্রায় ৭.৭৫ শতাংশ আসে এই মৎস্য সম্পদ থেকে। জাতীয় আয়ের ১৬.৭ শতাংশ মৎস্য সম্পদের অবদান। বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদন ও আহরণের উৎস হচ্ছে অভ্যন্তরীণ জলাশয় এবং সামুদ্রিক এলাকা। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৪৩.৩৭ লক্ষ হেক্টর। এর মধ্যে প্লাবনভূমি সহ মুক্ত জলাশয় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর এবং উপকূলীয় চিংড়ি খামার সহ বদ্ধ জলাশয় ২.৯০ লক্ষ হেক্টর। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ২৬০ প্রজাতির দেশীয়, ১২ প্রজাতির বিদেশী মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। এই অফুরন্ত সম্পদ থাকা সত্বেও অব্যবস্থাপনার কারণে আজও এই সম্পদ ও পেশার উন্নয়ন সম্ভব হয়নি।

একটি দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে, মৎস্যজীবী এবং সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। আমাদের দেশেও মৎস্যজীবীদের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ঠিকই রয়েছে। কিন্তু তারা কাজ করতে পারছে না জলমহালে অব্যবস্থা, সমস্যা ও জটিলতার কারণে। কারণ দেশের মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন করতে হলে, উন্নত প্রযুক্তি ও প্রচুর জলমহালের দরকার। প্রযুক্তি যাও আছে, জলমহাল রয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে। যতদিন না প্রযুক্তি ও জলমহাল সংশ্লিষ্ট এক মন্ত্রণালয়ের কাছে হস্তান্তরিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত এই সম্পদের উন্নয়ন অসম্ভব। পাশাপাশি এই মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের জন্য এই পেশায় নিয়োজিত মৎস্যজীবীদের উন্নয়ন প্রয়োজন। কেননা উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন, পেশাজীবীদের উন্নয়ন এবং টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন। বিগত দিনে যে সকল মৎস্য সপ্তাহ, মৎস্য পক্ষ পালিত হয়েছে, মৎস্যনীতি ও ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছে, তাতে মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তার কতখানি বাস্তবায়ন হয়েছে, তার মূল্যায়ন প্রয়োজন এবং যেগুলো বাস্তবায়িত কেন হয়নি তারও মূল্যায়ন প্রয়োজন। মূল্যায়ন করা যদি না হয় তাহলে প্রতি বছরের ন্যায়, এই মৎস্য সপ্তাহ অর্থবহ হবে না। মৎস্য সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয় মৎস্যজীবী ও মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং বিগত দিনের কর্মকান্ড মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে। আসলে কি আমরা বিগত দিন থেকে তা করতে পেরেছি, না করেছি। যেমন মৎস্য প্রজননের সময় ডিমওয়ালা মাছ ধরা, ছোট পোনা বা ঝাট্‌কা ইলিশ মারবোনা, যে সকল মৎস্যজীবী এই সকল ডিমওয়ালা ও ঝাট্‌কা ধরে, তাদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তিন মাসের জন্য অব্যাহতি রাখা। এগুলো কি আমরা করতে পেরেছি? যদি না পারি তাহলে আজকের এই দিনেই মূল্যায়ন করা উচিৎ কি কারণে পারছিনা। আমরা যদি এই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে না পারি, তাহলে মৎস্য সপ্তাহ একটি উৎসবের সপ্তাহ ছাড়া কোন ফলই আমরা আশা করতে পারি না।

এই লক্ষ্যে সঠিক ব্যবস্থাপনা ও মৎস্যজীবীদের

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অধিকার আদায়ের জন্য ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী জেলে সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, মৎস্য আইনের বাস্তবায়ন ও মৎস্যজীবীদের সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে ৮৫টি বেসিক সেমিনার, প্রায় ২০০টি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত করেছে। এছাড়াও মৎস্যজীবীদের সচেতনতার লক্ষ্যে বিভিন্ন পোষ্টার, লিফলেট প্রকাশ করে যাচ্ছে। এ সংগঠন আশা করে বাংলাদেশের এ অফুরন্ত পানি ও উর্বর মাটি, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন সম্ভব। বর্তমানে দেশে যে জলমহাল ব্যবস্থাপনা চলছে তাতে মৎস্যজীবীরা তাদের পেশায় নিরূৎসাহিত হয়ে অন্য পেশায় নিয়োজিত হতে বাধ্য হচ্ছে। মৎস্যের উন্নয়ন করতে হলে প্রথমেই মৎস্যজীবীদেরকে অন্যায়, অত্যাচার, উৎপীড়ন থেকে রেহাই দিয়ে বিভিন্ন উপকরণ ও প্রয়োজনীয় আর্থিক যোগান দিয়ে, তাদেরকে উৎসাহিত করে, এই পেশাকে উন্নত করতে হবে। আর যখনই এটি সম্ভব হবে তখনই মৎস্য চাষ, মৎস্য আহরণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। সাথে সাথে প্রোটিনের অপ্রতুলতা কমে যাবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয় বেড়ে যাবে। সুতরাং আমাদের দৃষ্টিতে মৎস্য পেশার উন্নয়নে সঠিক মৎস্য নীতিমালা ও সুষ্ঠু জলমহাল ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরী করা সরকারের নৈতিক দায়িত্ব হয়ে পড়েছে।

আমাদের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় বলা যায়, বর্তমান জলমহাল ব্যবস্থাপনা ও অমৎস্যজীবী সংগঠনের সম্পৃক্ততায় যে অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার পরিবর্তন হওয়া উচিৎ। বর্তমান জলমহাল ব্যবস্থাপনায় লাইসেন্স গ্রহণকারী মৎস্যজীবী ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে তার লাইসেন্স নবায়ন করতে পারে। কিন্তু মৎস্যজীবীদের তালিকা যাঁচাই-বাছাই করার দায়-দায়িত্ব থানা ও জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির নিকট রয়েছে। কাকে দিয়ে বা কাদের দিয়ে জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি হচ্ছে। প্রকৃত অর্থে মৎস্যজীবীদের তালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব যাদেরকে দেয়া হয়, তারা মৎস্যজীবীদের কাছে না গিয়ে একটি মনগড়া তালিকা তৈরী করেন। এতে করে মৎস্যজীবীদের পক্ষে কোন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে না। আমাদের সংগঠনের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে মৎস্যজীবীদের স্বীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত রূপরেখা সুপারিশ করছি। এতে উপকৃত হবে দেশ ও জাতি।

মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কর্মপরিকল্পনা

* প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে জলমহাল ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের দায়িত্ব দিতে হবে।
* মৎস্যজীবীদের পূনর্বাসনের জন্য সরকার কর্তৃক মৎস্য ব্যাংক, মৎস্য গ্রাম বা মৎস্য পল্লী গঠন করতে হবে।
* সরকার ও মৎস্যজীবীদের প্রকৃত সংগঠনের সমন্বয়ে মৎস্যজীবীদের কল্যাণ তহবিল গঠন করতে হবে।
* মৎস্য আইন বাস্তবায়নে ও মৎস্যজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ও জাতীয় রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠনের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করতে হবে।
* সকল ধরণের জলমহালের ইজারা প্রথা বিলুপ্তি করে আলোচনা সাপেক্ষে প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন ও মৎস্যজীবীদের হাতে হস্তান্তর করতে হবে।
* মৎস্য চাষের উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে মৎস্যজীবী সংগঠনের সমন্বয়ে মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
* মৎস্য বিষয়ক সকল ধরণের প্রকল্পে মৎস্যজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
* বাংলাদেশে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের পরিসংখ্যান করে সহজ শর্তে সুদমুক্ত ঋণ দিতে হবে।
* সরকারীভাবে তৃণমূল পর্যায়ে মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণের জন্য মৎস্যজীবী সমিতির সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ কমিটি গঠন করতে হবে।

মৎস্য পণ্যের মান বজায়ে পরিচ্ছন্নতা ও জীবাণুমুক্ত করণের ভূমিকা

মোঃ রফিকুল ইসলাম
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

খাদ্য প্রস্তুতকারী কোন কারখানার ক্ষেত্রে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং জীবাণুমুক্তকরণ একটি প্রধান কাজ। কার্যকর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার এবং জীবাণুমুক্ত করণের অভাবে উৎপাদিত দামী খাদ্য ক্ষতিকর জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার ফলে প্রতিবছর উৎপাদিত পণ্যের প্রায় এক চতুর্থাংশ নষ্ট হচ্ছে। সম্ভাব্য সংকটময় দূষণ বিন্দু চিহ্নিত (HACCP) করণের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ, গ্রহণযোগ্য মাত্রায় আনয়ন এবং সম্পূর্ণভাবে দূষণমুক্তকরণ আজ যুগের চাহিদা।

উন্নত স্বাস্থ্যসম্মত ও জীবাণুমুক্তকরণ ব্যবস্থা অনুসরণের ফলে এ অবস্থা থেকে পরিত্রান পাওয়া সম্ভব। খাদ্যের ধরন, ভোক্তার চাহিদা, তৈরী প্রক্রিয়া, প্যাকিং, ষ্টোরিং, প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে কার্যকর স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সুষ্ঠু সেনিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ ব্যবস্থা যে বিষয়গুলোর উপর নির্ভরশীল তা হলো -

১। হাউজ কিপিং বা কারখানার হাইজিন ও সেনিটেশন ব্যবস্থাপনা
২। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা
৩। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সর্ম্পকে সুস্পষ্ট জ্ঞান এবং প্রশিক্ষণ
৪। কারখানার লে-আউট প্লানের অবস্থা
৫। যন্ত্রপাতি ও মেশিনের ডিজাইন বা নক্সা
৬। কারখানায় কি ধরনে কাচাঁমাল ব্যবহার করা হবে তার অবস্থা
৭। কারখানায় কি ধরনের দ্রব্য ব্যবহার হবে তা নির্ণয় করা
৮। কারখানায় কি ধরনের পণ্য উৎপাদন করা হবে তার ঝুঁকির মাত্রা নির্ণয় করা এবং
৯। কারখানার সংস্কার কাজ এবং অন্যান্য সাধারণ ত্রুটি গুলো সংশোধন করা

কোন খাদ্য প্রস্তুতকারী কারখানায় উন্নত হাইজিন সেনিটেশন ও জীবানুনাশক ব্যবহারের চেয়ে প্রথমতঃ বেশী প্রয়োজন উপরোক্ত কাজগুলো সঠিকভাবে করা । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যদি কোন কারখানায় লে-আউট প্লানের ত্রুটি থাকে তা হলে উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বা "Cleaning & Disinfection " করার পরও নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য তৈরী সম্ভব নয়। তাই অনুজীব কর্তৃক দূষণমুক্ত খাদ্য তৈরী নিশ্চিত করতে হলে কার্যকর Cleaning & disinfection Procedure প্রয়োগের পূর্বে উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রধান্য দিতে হবে। নতুবা কার্যকর Disinfection ব্যবস্থা প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না। আর এ জন্য প্রয়োজন প্রতিটি খাদ্য দ্রব্যের উৎপাদন প্রক্রিয়া , চালনা প্রক্রিয়া, খাদ্য দ্রব্যের মান এবং আন্তর্জাতিক চাহিদা বিবেচনা করে প্রতিটি কারখানায় নিজস্ব বিশেষজ্ঞদের সাথে আলাপ করে কার্যকর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং জীবাণুমুক্ত করার একটি স্কীম বা প্রকল্প চালু করা।

HACCP প্রথা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মান সম্পন্ন মৎস্য পণ্য উৎপাদনের জন্য একটি খাদ্য প্রস্তুতকারী কারখানা পণ্যের কাঁচামালের উৎস স্থল থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ে যে কাজগুলো করা হয় তার যেমন প্রতিটি কাজের নিয়ন্ত্রণ এবং রেকর্ড রাখা হয় তদ্রুপ সুষ্ঠু পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার ও জীবাণুমুক্ত করণেরও রেকর্ড রাখতে হবে। হ্যাসাপ প্রথা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়াকে সংকটময় অবস্থান(Critical point) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ISO 9000 প্রথা একে একটি প্রক্রিয়াকরণের অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। পূর্বে কারখানা ব্যবস্থাপকদের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে খুব একটা সুস্পষ্ট ধারণা ছিলনা বলে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবেই পণ্য ক্ষতিকর জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হতো তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে নাই। বর্তমানে হ্যাসাপ প্রথা চালু হওয়ার পর এ সর্ম্পকে খাদ্য প্রক্রিয়াকারকদের সচেতনতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও জীবাণুমুক্তকরণের স্তরসমূহ

একটি কারখানায় সম্পূর্ণ প্রসেস লাইন কার্যকর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং জীবাণুমুক্ত করণের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। তাহলো-

১। প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো করা (Prepatatory work)

২। পরিস্কার করা (Cleaning work)

৩। নির্বীজন বা জীবাণুমুক্ত করা (Disinfection work)

এই তিনটি কাজের একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক কিন্তু একটি অপরটির সাথে অংগাংগিভাবে জড়িত। এই তিনটি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করা না হলে নিরাপদ জীবাণুমুক্ত খাদ্য তৈরী সম্ভব নহে।

প্রস্তুতিমূলক কাজ

এই পর্যায়ে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা থেকে উৎপাদিত অবশিষ্ট পণ্য, বিভিন্ন ধরনের পাত্র এবং অন্যান্য অগোছালো দ্রব্যাদি সরিয়ে নিতে হবে। মেশিন বা কন্‌ভেয়ার ভেল্টসমূহ সহজে খোলা যায় এবং ধৌত করা যায় এরূপ ভাবে স্থাপন করতে হবে, যেন যে সব এলাকায় অনুজীব জমে থাকতে পারে সেসব এলাকা সহজেই পরিস্কার ও জীবাণুমুক্ত করা যায়।বৈদ্যুতিক স্থাপনা সমূহে যাতে পানি বা রাসায়নিক দ্রব্য না লাগে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ক্লিনিং এজেন্ট ব্যবহারের পূর্বে মাছের বা চিংড়ির পরিত্যক্ত অংশসমূহ ব্রাস করে বা ঘষে তুলে ফেলতে হবে। ব্রাসের সাহায্যে ঘষে পরিস্কার করার পর পরিস্কার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে। চর্বি বা প্রোটিন জাতীয় দ্রব্য পরিস্কার করার ক্ষেত্রে গরম পানি ব্যবহার করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে পানির তাপমাত্রা কমপক্ষে ৬৫°-৮০° সেঃ এর মধ্যে হতে হবে। প্রস্তুতিমূলক কাজের সকল রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

পরিস্কার করা

এই পর্যায়ে প্রথমে কারখানার ভিতর, বাহির এবং চারিপাশের সকল প্রকার অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরিয়ে ফেলতে হবে। পরিস্কার করার পর বাহ্যিকভাবে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্পর্শ করে দেখতে হবে কোন ময়লা বা তৈরীকৃত খাদ্যের অবশিষ্টাংশ আছে কিনা।

সাধারণত ঃ অনুজীবগুলো প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার বিভিন্ন আসবাবপত্র বা দ্রব্য সামগ্রীর গায়ে লেগে থাকে এবং আসবাবপত্রের উপরে, কারখানার মেঝেতে, দেয়ালে, বিভিন্ন জায়গায় বায়োফিল্ম তৈরী করে।তাই শুধু পানি দ্বারা পরিস্কার করে সমস্ত জীবাণু দূর করা সম্ভব নহে।

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভরশীল

ক) কি ধরনের এবং কি পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী পরিস্কার করতে হবে তার উপর

খ) পরিস্কার করার কাজে যে ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা হবে - তার রাসায়নিক, ভৌত রাসায়নিক গুণের অবস্থা এবং ব্যবহার সময়ের কার্যকারিতার উপর।

গ) ডিটারজেন্টের ঘনত্ব, ব্যবহারের তাপমাত্রা এবং তার কন্টাক্ট টাইম এর উপর।

ঘ) যান্ত্রিক শক্তি প্রয়োগ করা অর্থাৎ পাইপের মধ্য দিয়ে চাপে পরিস্কার সাবানযুক্ত দ্রবণ সঞ্চালন, নাড়ানো, ওয়াটার জেট, ব্যবহার করা।

ঙ) যে দ্রব্য পরিস্কার করা হবে তার উপরিভাগের অবস্থা কিরূপ ইত্যাদি।

ডিটারজেন্ট বা ক্লিনিং দ্রব্যের প্রকার

ময়লা বা তলানী পরিস্কারের ধরনের উপর ভিত্তি করে ক্লিনিং দ্রব্যাদি নির্ধারণ করতে হবে।

১। **জৈব দ্রব্য বা তলানীঃ** যেমন প্রোটিন, কর্বোহাইড্রেট এবং চর্বি জাতীয় দ্রব্য পরিস্কার করতে ঘন ক্ষারকীয় ডিটারজেন্ট ব্যবহার করতে হবে বিশেষ করে কস্টিক সোডা। তবে যে সব দ্রব্য আয়ন তৈরী করে না তাদের ক্ষেত্রে এসিড ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন- ফসফরিক এসিড।

২। **অজৈব পদার্থ বা দ্রব্যঃ** যেমন ক্যালসিয়ামের লবণ এবং অন্যান্য মেটাল্‌স। বিয়ার স্টোন এবং মিল্ক স্টোন বিভিন্ন ধরনের লবণ প্রোটিনের সাথে বিক্রিয়া করে একটি প্রলেপ তৈরী করে। এ ধরনের পদার্থ পরিস্কার করতে অম্ল জাতীয় ক্লিনিং এজেন্ট ব্যবহার করা উচিত যেমনঃ ক্লোরোনেটড যৌগ।

৩। অনুজীব, মোল্ড, ইষ্ট এবং এ্যালগি বায়োফিল্ম তৈরী করে যার ফলে ব্যবহৃত আসবাব পত্র ও দ্রব্যসামগ্রী পরিস্কার করা সহজসাধ্য নহে। কার্যকর জৈব এজেন্ট

বা দ্রবণ ব্যবহার করে ইহা পরিস্কার করা যায়।

একটি বিষয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যে সব ক্লিনিং এজেন্ট ব্যবহার করা হয় সেসব ক্লিনিং এজেন্টের কার্যকারিতা গরম অবস্থায় খুবই কার্যকর। সাধারনতঃ ৬৫-৮০° সেঃ তাপমাত্রায় পানিতে ক্লিনিং এজেন্ট মিশালে খুবই কার্যকর ভাবে পরিস্কার করা যায়। এই ব্যবস্থা খুবই সহজসাধ্য এবং স্বল্প ব্যয় সম্পন্ন।

ক্লিনিং এজেন্টসমূহ সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা নির্ভর করে ক্লিনিং কাজে ব্যবহৃত পানির মানের উপর। এ জন্য পরিস্কার করার কাজে ব্যবহৃত পানি হতে হবে-

ক) পোটেবল বা খাবার উপযোগী পানি
খ) মিঠাপানি
গ) অনুজীব এবং কোন ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য মুক্ত পানি

একটি মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় যে ধরনের ক্লিনিং এজেন্ট ব্যবহার করা উচিত তা হলো-

ক) রাসায়নিক ক্ষমতাযুক্ত যা সহজেই যে সকল ময়লা পরিস্কার করা হবে তা গলিয়ে ফেলতে পারে;
খ) ফাটা, ছিড়া জায়গার ভিতর চুষে ঢুকে যেতে পারে এবং অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীকে তলানী হিসাবে বের করে আনতে পারে;
গ) যদি কখনো খর পানি ব্যবহার করা হয় সেই পানিকে মৃদু পানিতে পরিণত করার ক্ষমতা এবং যাতে কোন ক্ষতিকর তলানী না পড়ে তা হতে রক্ষা করার ক্ষমতা;
ঘ) কারখানায় বিভিন্ন আসবাবপত্র বা দ্রব্যাদি পরিস্কার করার বা পণ্য উৎপাদনে ব্যবহারকালে কোন তলানী না পড়ে এ ধরনের ক্ষমতা সম্পন্ন;
ঙ) কারখানায় ব্যবহৃত আসবাবপত্র ও দ্রব্যাদির সাথে কোন প্রকার বিক্রিয়া না হয়;
চ) ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না হয়;
ছ) ম্যানুয়েল বা যান্ত্রিক ক্লিনিং কার্যক্রম এর সাথে সম্পৃক্ত;
জ) পানিতে সহজে দ্রবনীয় এবং সহজে ইহার ঘনত্ব পরিমাপ করা যায়;
ঝ) আইনগতভাবে ব্যবহার বৈধ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং বায়োডিগ্রেডেবল; এবং
ঞ) দামে কম।

নির্বীজন বা জীবাণুমুক্ত করা

কোন কারখানায় উৎপাদিত পণ্য মান সম্পন্ন কিনা তা নির্ভর করে উৎপাদিত পণ্য বাহ্যিক, রাসায়নিক এবং অনুজীব সংক্রান্ত মানের মানদন্ডের উপর। এ জন্য উৎপাদিত পণ্যের মান রক্ষার্থে ব্যবহৃত কাঁচামাল থেকে শুরু করে কারখানার প্রতিটি যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, কার্যকর জীবাণুমুক্তকরণ অত্যাবশ্যক। এ গুলো নিম্নলিখিত ভাবে জীবাণুমুক্ত করা যায়।

ক) তাপ প্রয়োগ করে।
খ) ইউ ভি (U.V) আলো ব্যবহার করে
গ) রাসায়নিক জীবাণুনাশক ব্যবহার করে।

তাপ প্রয়োগ করে জীবাণুমুক্তকরণ সবচেয়ে নিরাপদ কিন্তু ইহা সবক্ষেত্রে ব্যবহার করা সম্ভব নহে। ইউ ভি আলোর সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করাও স্বাস্থ্যসম্মত নহে এবং প্রয়োগ সহজসাধ্য নহে। সাধারণতঃ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে জীবাণুমুক্তকরণই সারা বিশ্বে সমাদৃত।

কি ধরনের কারখানায় এবং কি ধরনের পণ্য উৎপাদনে কোন জীবাণুনাশক ব্যবহার করতে হবে - তা নির্ধারণ করে নিম্নলিখিত জীবাণুনাশকসমূহ ব্যবহার করা যেতে পারে-

ক) ক্লোরিন এবং ক্লোরিনের যৌগসমূহ
খ) আয়োডোফরস্
গ) পার এ্যাসিটিক এসিড এবং হাইড্রোজেন পার অক্সাইড
ঘ) কোয়াটারনারি এ্যামোনিয়ামের যৌগ এবং
ঙ) এ্যামফোলাইটিক যৌগসমূহ।

জীবাণুনাশক দ্বারা জীবাণুমুক্ত করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে তা হলো-

ক) জীবাণুনাশকের ধর্ম
খ) জীবাণুনাশকের ঘনত্ব
গ) জীবাণুনাশকের তাপমাত্রা
ঘ) জীবাণুনাশকের পি এইচ
ঙ) জীবাণুনাশকের কন্টাক্ট টাইম
চ) সহজে দ্রবীভুত হওয়া ক্ষমতা
ছ) ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নহে
জ) ব্যবহৃত দ্রব্যকে ক্ষয়প্রাপ্ত করে না
ঝ) সহজে ধৌতযোগ্য
ঞ) আইনগতভাবে ব্যবহার বৈধ এবং বায়োডিগ্রেডেব্‌ল

নিম্নে বিভিন্ন ধরনের ক্লিনিং এজেন্ট এর সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করা হলো ঃ

প্রতিটি ক্লিনিং এজেন্ট ব্যবহারের ভাল ও খারাপ উভয় দিকই রয়েছে। নিম্নের ছকে তা দেখানো হলো।

পানিতে দ্রবনীয় ক্লিনার	আনুমানিক ঘনত্ব% ও ওজন/ আয়তন	ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য	কাজ	সীমাবদ্ধতা
পরিস্কার পানি	১০০	সাধারনতঃ পানিতে থাকে দ্রবীভূত অক্সিজেন এবং মিনারেলস্।	দ্রাবক এবং বাহক ময়লা ও রাসায়নিক ক্লিনারের	খর পানি দ্রব্যের উপর আস্তরণ তৈরী করে অনুজীব বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
ঘন ক্ষার	১-৫	সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সোডিয়াম সিস্‌কোইসিলিকেট	চর্বি ও প্রোটিনের জন্য উৎকৃষ্ট ডিটারজেন্ট খর পানিতে তলানী ফেলতে সাহায্য করে।	খুবই ক্ষয়কারক, হালকা ধৌত করে সম্পূর্ণ তাড়ানো যায় না। চামড়ার ক্ষতি করে
হালকা ক্ষার	১-১০	সোডিয়াম কার্বোনেট ট্রাইসোডিয়াম ফসফেট	ভাল ডিটারজেন্ট। খর পানিকে মৃদু করে	হালকা ক্ষয়কারক। ঘন দ্রবণ চামড়ার ক্ষতি করে
অজৈব অম্ল	০.৫	হাইড্রোক্লোরিক এসিড সালফামিক এসিড	অজৈব তলানী পরিস্কার করে অদ্রবনীয় দ্রব্যের তলানি ফেলে	ধাতুর সাথে খুবই বিক্রিয়া করে, চামড়ার ক্ষতি করে। চামড়ার ক্ষতি করে
পানিতে ঋণাত্বক আয়নের তৈরী করে এমন দ্রব্যে	<০.১৫	সাবান সালফেটেড হাইড্রোকার্বন	কার্যকর ডিটারজেন্ট তৈল, ময়লা, চর্বি ইত্যাদি দূর করে	ধনাত্বক দ্রব্যের ক্ষেত্রে খুব কার্যকর নহে।
পানিতে ঋণাত্বক আয়নের তৈরী করে এমন দ্রব্যে	<০১.৫	কোয়াটারনারী এ্যামোনিয়াম	জীবানুনাশক হিসাবে ব্যবহার হয়	ঋণাত্বক দ্রব্যের ক্ষেত্রে খুব কার্যকর নহে
ক্লোরিনেটেড যৌগ	১	ডাই বা ট্রাই ক্লোরোসাইনোইউরিক এসিড	উপরিভাগের ধূলাবালি এবং ফাটাযুক্ত স্থানের ময়লা পরিস্কার করে।	আসবাবপত্রের ফাটা জায়গায় জমে থাক্‌লে খাদ্যের মান নষ্ট করে।

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা, নির্বীজন করা সহ স্টেরিলাইজেশ্‌ন কার্যক্রম ম্যানুয়েলী এবং মেকানিক্যালি করা যায় । উন্নত এবং আধুনিক খাদ্য তৈরী কারখানায় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও নির্বীজন কার্যক্রম Clean out of place(COP) অর্থাৎ যে সকল দ্রব্য পরিস্কার করতে হবে তা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় করতে হবে কিন্তু যে সকল কারখানায় কোন তরল খাদ্য উৎপাদন করা হয় সেখানে Clean in place(CIP) অনুসরণ করতে হবে। অধিকাংশ কারখানাতেই CIP&COP একই সাথে অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যে প্রক্রিয়াই অনুসরণ করা হউক না কেন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং নির্বীজন কার্যক্রম চক্রটি কারখানায় প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজ চলাকালে উৎপাদিত পণ্যের ধরন, মান, বিবেচনা করে পরিচালনা করতে হবে। প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজ চলাকালীন সময়ে দিনে কয়েকবার বা প্রতি সিফটে -দুই বার, কাজ শুরু হওয়ার আগে বা কাজ শেষ হওয়ার পরে করা যেতে পারে। কারখানায় কাজের পরিবেশগত অবস্থানের উপর ভিত্তি করে "frequency of cleaning and disinfection" strategy নির্ধারণ করতে হবে।

উল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে জীবাণুনাশক ব্যবহার করা হলেই অনুজীব কর্তৃক খাদ্য দূষণ রক্ষা করা সম্ভব হবে। এ জন্য প্রতিটি খাদ্য প্রস্তুতকারী কারখানায় নিম্নলিখিত চক্রটি অনুসরণ করে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করা আবশ্যক।

ক) তৈরী খাদ্য দ্রব্য অপসারণ করে, খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করার আধার, পাত্র প্রক্রিয়াজাত এলাকা হতে সরিয়ে ফেলা যাতে মেঝেতে কোন কিছু না থাকে,

খ) যন্ত্রপাতিসমূহ সরিয়ে জায়গাসমূহ পরিস্কার করা, ছোট ছোট যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন যন্ত্রপাতির অংশ এবং তার ফিটিংসমূহ পরিস্কার করা। স্পর্শকাতর দামী যন্ত্রপাতি মেশিনারিজসমূহ প্রয়োজনে ঢেকে রাখা যাতে সহজে পানির সংস্পর্শে আসতে না পারে,

গ) খাদ্য তৈরীর পর তার অবশিষ্ট জমে থাকে বা লেগে থাকে এইরূপ স্থান, মেশিন এবং যন্ত্রপাতি ঠান্ডা বা গরম পানি দ্বারা ব্রাস এবং ঝাড়ুর সাহায্যে পরিস্কার করা,

ঘ) পরিস্কারকরণ কাজে প্রয়োজনে যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহার করা,

ঙ) ক্লিনিং এজেন্ট এর সাহায্যে পরিস্কার করার পর পরিস্কার পানি দ্বারা ধৌত (Rinse) করা, ধৌত করার সময় দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে "ঘনত্ব ও কন্টাক্ট টাইম" রক্ষা করা,

চ) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে পরিষ্কার দ্রব্য অপরিষ্কার দ্রব্যের সংস্পর্শে না আসে,

ছ) রাসায়নিক জীবাণুনাশক দ্বারা দ্রব্য সামগ্রী নির্বীজন করা ,

জ) রাসায়নিক জীবাণুনাশক ব্যবহারকালে তার ঘনত্ব ও কন্টাক্ট টাইম সঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সঠিকভাবে জীবাণু নাশের পর পরিস্কার পানি দ্বারা পুনঃভিজিয়ে নেয়া, কিন্তু যদি এমন কোন জীবাণু নাশক ব্যবহার করা হয় যাহা আপনা আপনি বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় তা হলে সে ক্ষেত্রে ধৌত করার প্রয়োজন নেই,

ঝ) শেষ পরিস্কার করার পর দ্রব্য-সামগ্রী, যন্ত্রপাতি , আসবাবপত্রসমূহ ব্যবহারের পর্যায় বিবেচনা করে উৎপাদন শুরুর পূর্বে পুনঃ জীবাণুনাশক ব্যবহার করে হালকাভাবে ধৌত করা শ্রেয়। এ ক্ষেত্রে গরম পানি বা হালকা ক্লোরিন এর দ্রবণ ব্যবহার করা.

ঞ) পরিস্কার করার পর যন্ত্রসামগ্রী, আসবাবপত্র সমূহ আলাদা শুকনা জায়গায় সংরক্ষণ করা এবং

ট) অতি পরিস্কার বা অতি জীবানুনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা।

সঠিক পদ্ধতিতে Detergent এবং Disinfection এর ঘনত্ব এবং কন্টাক্ট টাইম রক্ষা করে Cleaning এবং Disinfection করার মাধ্যমে নিরাপদ মৎস্যপণ্য উৎপাদন করা যায়। পরিস্কার ও নির্বীজন করার পর পরীক্ষাগারে সোয়াব পরীক্ষা করে সঠিকভাবে পরিস্কার ও নির্বীজন হলো কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য নিম্নলিখিত মান দন্ড অনুসরণ করা যেতে পারে।

প্রতি ৫০ বর্গ সেন্টিমিটার পরিস্কার করার পর

অনুজীবের মাত্রা

১০০-৩০০	গ্রহণযোগ্য	(Just acceptable)
১০-১০০	সন্তোষজনক	(Satisfactory)
<১০	উত্তম	(Excellent).

হ্যাসাপ প্রথা যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন , পরিচর্যা ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে কার্যকর ক্লিনিং এবং নির্বীজন কার্যক্রম চালাতে হলে শুধু মৎস্য নহে যে কোন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার আটটি মূল বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। তা হলো-

১। পানি ও বরফের মান নিশ্চিতকরণ
২। মাছের সংস্পর্শে আসে এমন সামগ্রী সঠিকভাবে পরিস্কার করা ।
৩। যে কোন আড় - সংক্রমণ রোধ করা।
৪। কর্মীদের হাত, পা, মুখ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ধৌত করা এবং প্রাক্ষালণসমূহ পরিস্কার ও নির্বীজন করা।
৫। যে কোন ধরনের ভেজাল মিশানো রোধ করা।
৬। খাদ্যকে দূষণ করতে পারে এমন কোন টক্সিক যৌগ ব্যবহার না করা এবং খাদ্যসমূহ স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে নাড়াচাড়া ও মজুদ করা।
৭। কর্মীদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৮। পেষ্ট কন্ট্রোল এবং তা নিবারণ করা।

উল্লেখিত বিষয়গুলো বিশেষভাবে বিবেচনায় এনে তা সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন, মূল্যায়ণ, পরিবীক্ষণ এবং তার সকল রেকর্ড সংরক্ষণ করার মাধ্যমেই মানসম্পন্ন নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদন করা সম্ভব। আর তা নিশ্চিত করা গেলেই আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের উৎপাদিত মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের মানের সুনাম বৃদ্ধি পাবে, ফলে রপ্তানীও বৃদ্ধি পাবে।

আর্টিমিয়া চিংড়ি হ্যাচারী টেক্‌নিশিয়ান যন্ত্রপাতি

চিংড়ি হ্যাচারী ও মৎস্য চাষ সংক্রান্ত যাবতীয় বিদেশী যন্ত্রপাতি, ফিটিংস, কেমিক্যালস্, ঔষধ, আর্টিমিয়া (ইন্‌ভি, আরজেন্টিমিয়া, ব্ল্যাক টাইগার ব্র্যান্ড), খাদ্য এবং টেক্‌নিশিয়ান এর জন্য যোগাযোগ করুন -

ঢাকা অফিসঃ

আক্সিরিক ইন্টারন্যাশন্যাল কর্পোরেশন
রুম নংঃ ১২ ও ১৩, দেলওয়ার কমপ্লেক্স
(১ম তলা), ২৬ হাটখোলা রোড
ঢাকা - ১২০৩
ফোনঃ ৯৫৫২২৭১ ফ্যাক্সঃ ৯১২২৯৯৬
মোবাইলঃ ০১৭-৫২২৭১১

কক্সবাজার অফিসঃ

গোল্ড কোস্ট শ্রিম্প হ্যাচারী
হ্যাচারী জোন
মেরীন ড্রাইভ রোড
কলাতলী
কক্সবাজার
ফোনঃ (০৩৪১) ৪৭২০

ঢাকা শহরের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের বর্তমান অবস্থা ও উন্নয়ন সম্ভবনা

বাকার আহমেদ
বাংলাদেশ ফিশারিজ হোলসেলার্স ওনার্স এসোসিয়েশন, ঢাকা

এক কোটি লোকের এই ঢাকা মহানগরীতে সরকারি বেসরকারি কোন পর্যায়েই মান সম্মত বা মান বিবর্জিত কোন মৎস্য অবতরন ও পাইকারী বিপনন কেন্দ্র নাই। নৌ পথে সদরঘাট টারমিনালে মাছের চালান আসে বিভিন্ন নৌযান যোগে। অন্যদিকে কিছু মাছ আসে যাত্রীবাহী বাসের ছাদে বাসের সওয়ার হয়ে। গাবতলী, মহাখালী, সায়েদাবাদ এবং ফুলবাড়িয়া বাস টারমিনালের মধ্যে প্রথম তিনটিতে সবচেয়ে বেশী মাছ আসে। নৌ বা বাস টারমিনালের কুলি ও কুলি সর্দার ও ভ্যান চালকদের নিত্য জোর জুলুমের এক পর্যাযে কিছু খুইয়ে নগরীর আড়ৎ গুলোতে মাছের চালান আসে। আরেকটি দিক আছে আর তা হলো ট্রাক যোগে সরাসরি নগরীর আড়ৎ সমূহে মাছের চালান আসে। ট্রেন যোগে মাছের চালান আসাটা কমে এসেছে অনিয়মিত ট্রেন সার্ভিস এর কারণে।

তেপান্ন বছরের বৃদ্ধ এক কালের এই প্রাদেশিক রাজধানী এখন স্বাধীন বাংলাদেশের একমাত্র রাজধানী। এই নতুন দেশের রাজধানী ঢাকাও এখন আঠাশ বছরের পরিপূর্ণ যুবক। এ যুবকে সাজাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় আকাশ ছোয়া বহু ভবন নির্মিত হলেও মাছ খাতে মাছের অবতরন ও পাইকারী বেচাকেনার জন্য কোন আধুনিক ভবন বা মাছের নূন্যতম গুণগত মান রক্ষা পায় উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই হয়নি।

ঢাকা মহানগরীতে ছোট বড় নতুন পুরাতন মিলিয়ে ২০টির অধিক মাছের আড়ৎ রয়েছে। সরকারের পরিত্যক্ত অথবা ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমির উপর গড়ে উঠা এসব মৎস্য আড়তের কোনটি স্বাস্থ্য সম্মত বা চলনসই ব্যবস্থা সম্বলিত নয়। শুকনা মওশুমেও এক গিরা পচাগলা পানির উপর দাঁড়িয়ে ছালা হোগলা বিছিযে তাতে মাছ ঢেলে মাছের নিলাম দর তোলেন এবং মাছ বিক্রি করেন। এ মাছ বিভিন্ন বাজারের পাইকারদের মাধ্যমে নগরীর ১ কোটি মানুষ সংগ্রহ করেন। বর্ষাকালে অধিকাংশ আড়তের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। গাড়ীর কালো ধোয়া এবং পচা বর্জের পাহাড়ের কারণে কেবল নয়, নগরীর মাছের আড়ৎ গুলোর কারণেও নগরীর পরিবেশ দূষিত হচ্ছে প্রতি নিয়ত। ঢাকা মহানগরে এমন কোন আড়ৎ নেই যার পাশ দিয়ে নাকে রুমাল না চেপে পথচলা যায়। একটি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পাইকারী মৎস্য অবতরন ও পাইকারী মাছ বাজার নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মাছ এখন শুধু নিকারি কৈবত রাজবংশীদের পেশাগত ব্যবসা নয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক এ পেশায় এগিয়ে আসছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পোষাক শিল্পের পরেই মাছের স্থান। পোষাক শিল্প দেশের অভ্যন্তরীন চাহিদা মেটায় না। মাছ অভ্যন্তরীন চাহিদা মিটিয়েও বছরে দেড়হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আনছে।

দেশে মাছ বাজারজাতকরণে সব চাইতে বড় ভূমিকা রাখছেন আড়ৎ মালিকেরা। আর এই আড়ৎ মালিক দের মধ্যে ঢাকা মহানগরীর আড়ৎ ব্যবসায়ীরাই সবচেয়ে বেশী অবদান রাখছেন এই খাতে লক্ষ কোটি টাকা পূঁজি খাটিয়ে। প্রান্তিক চাষী হতে শুরু করে বৃহৎ মাছ চাষী কিংবা ঠেলা জালির জেলে থেকে শুরু করে যান্ত্রিক নৌযানে-মালিক তাদের আহরিত মাছের সবটা সরবরাহের অঙ্গিকারে এই সুবিধা পাচ্ছে। ঢাকা মহানগরীর এক একটি আড়ৎ মালিক এক একটি ব্যাংকের ভূমিকা পালন করছেন। ঋণ গ্রহণ করতে মাছের উৎপাদক, সরবরাহকারীদের আবেদন লিখিত আবেদন করতে হয়না। দলিল দস্তাবেজ জমাও দিতে হয়না। মুখের কথার উপর বিশ্বাস করেই আড়ৎ মালিকেরা মাছ চাষী, আহরক, জেলে এবং সরবরাহকারীকে প্রয়োজনীয় পূজি সরবরাহ করেন। দেশে আড়ৎ ব্যবসায়ীরা না থাকলে সমগ্র মৎস্য খাতে মৎস্য ব্যবসার এত প্রসার ঘটতোনা। মাছের চাহিদা ভিত্তিতে দেশে বেসরকারি খাতে পাঁচ শতাধিক হ্যাচারী নির্মিত হয়েছে। যথেষ্ট সংখ্যক ফিশমিল কারখানা গড়ে উঠেছে। ঢাকার বড় বড় মৎস্য

আড়ৎ মালিকেরা চাহিদা অনুপাতে অঞ্চল ভিত্তিক মাছ সরবরাহ করে সারা দেশে মৎস্য বাজারজাতকরণ খাতেও একটি সমতা রক্ষা করে চলেছেন। বিদেশে রপ্তানী হয় এমন হোয়াইট ফিশের সবটা যোগান দেন বিশেষতঃ ঢাকার আড়ৎ মালিকেরা। ঢাকার আড়ৎ গুলোতে পাঠানো গলদা চিংড়ির পুরোটা তুলে দেওয়া হয় মাছ রপ্তানীকারকদের হাতে। তবু এত কিছুর পরও আড়ৎ ব্যবসায়ী মালিকেরা তাদের ব্যবসায়িক স্থানের নিশ্চয়তা এ যাবতকাল পাননি। অন্যের ভূমিতে ছাপড়া চালার নীচে বসে ভূমি মালিকদের দ্বারা সবসময়ই উৎখাত হয়ে পড়ার হুমকিকে সামনে রেখে চরম অনিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ব্যবসা চালিয়ে আসছেন।

ঢাকা মহানগরীর আড়ৎ মালিকদেরকে যদি সরকারী উদ্যোগে নির্মিত আধুনিক ব্যবস্থা সম্বলিত একটি মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী বিপনন কেন্দ্রে পূনর্বাসিত করা যেত তাহলে ব্যবসায়িক স্থানের নিশ্চয়তার কারণে এখাতে পূঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেত। ফলে দেশে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়াও একই পুকুর জলা বিল খাল দেখিয়ে ঋণ গ্রহীতারা একাধিক আড়ৎ থেকে মোটা অংকের টাকা ঋণ হিসাবে নিয়ে প্রতারনার মাধ্যমে আড়ৎ মালিকদেরকে ভীষন ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে চলেছে সেটিও সম্পূর্ণ রহিত হতো। নগরীর বিভিন্ন বাজারের খুচরা পাইকাররা বাকিতে মাছ কিনে পরদিন বাকি পরিশোধ না করে আবার অন্য আড়ৎ থেকে বাকিতে মাছ নিয়ে দিনের পর দিন আড়ৎ মালিকদের বাকির খাতা মোটা করে আড়ৎ মালিকদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে এসব ক্রিয়া কান্ডও সম্পূর্ন বন্ধ হতো। মাছের প্রি হারভেস্ট অবস্থা দূরীকরণ ছাড়াও নগরবাসীর জন্য সুস্থ সবল মাছ সরবরাহ করা যেত। নগরীর পরিবেশ বিঘ্নিত করার অভিযোগ থেকে আড়ৎ ব্যবসায়ীরা রেহাই পেতেন। অবিক্রিত মাছ গুণগত মান হ্রাস পাওয়ার আগেই বরফজাত করা যেত। রপ্তানী কারকেরা মাছ রপ্তানীর লক্ষ্যে বিভিন্ন আড়ৎ ঘুরে ঘুরে কয়েকদিন সময়ে যে পরিমাণ মাছ সংগ্রহ করতেন তার চেয়ে অধিক পরিমাণ মাছ একই মার্কেট থেকে একদিনেই সংগ্রহ করতে পারতেন। রপ্তানীখাতে মাছের গুণগত মান রক্ষা পেত এবং বিদেশী ক্রেতাদেরকে মাছ ক্রয়ে আগ্রহান্বিত করা সম্ভব হতো। আঞ্চলিক মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী বিপনন কেন্দ্র নির্মাণ কল্পে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নগরীর আরৎ মালিকেরা সম্মিলিতভাবে গত জুনে সরকারের সাথে আলোচনা করে সন্তোষজনক উত্তর পেয়েছেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি নির্ভর করছে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের সদিচ্ছার উপর।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ধারাবাহিক জরীপ ও গবেষণার গুরুত্ব

মোহাম্মদ আলী আজম খান
মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম

বঙ্গোপসাগরে দেশের একান্ত অর্তনৈতিক অঞ্চলে যে চিংড়ি ও মৎস্য ভান্ডার রয়েছে তা'থেকে প্রতি বছর আহরণ এবং রফতানীর মাধ্যমে কয়েকশত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। দেশের ৭১০ কিলোমিটার তটরেখার কাছাকাছি বেইস-লাইন থেকে সাগরে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল এর ফলে ১,৬৪,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা দেশের সামুদ্রিক জলসীমা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত, যা এদেশের মূল ভূখন্ডের আয়তনের চাইতেও বড়। এই জলসীমায় আহরণযোগ্য প্রচুর চিংড়ি ও মৎস্য প্রজাতি ছাড়াও রয়েছে অনাহরিত বিপুল মৎস্য সম্পদ। আহরণযোগ্য ও অনাহরিত সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদকে জরিপ ও গবেষণার মাধ্যমে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হলে এ'খাত থেকে দেশের প্রোটিন খাদ্য ঘাটতির সিংহভাগ পূরণ করেও বর্তমানের চাইতে আরও অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

১. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ

আমাদের সাগরে মৎস্য ও মৎস্য জাতীয় সম্পদগুলির মধ্যে রয়েছে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ, ২৫ প্রজাতির চিংড়ি, ৫ প্রজাতির লবষ্টার, ১৫ প্রজাতির কাঁকড়া, ১২ প্রজাতির শিরোপদী, ৬ প্রজাতির কস্তুরা, ৩০১ প্রজাতির ঝিনুক / শামুক, ৩৩ প্রজাতির সাগর কুসুম, ১১ প্রজাতির তিমি / ডলফিন, ২ প্রজাতির তারামাছ, ৩ প্রজাতির স্পঞ্জ, ৪ প্রজাতির কচ্ছপ, ৫৬ প্রজাতির শৈবাল, ১৩ প্রজাতির প্রবাল এবং সাগর শসা, সজারু, কুমির ইত্যাদি।

১.১ চিংড়ি

প্রাপ্ত বয়স্ক সামুদ্রিক চিংড়ি সাগরে ট্রলার জাল দ্বারা এবং পোনা ও অপ্রাপ্ত চিংড়ি উপকূলীয় ও মোহনা অঞ্চলে বিভিন্ন সনাতনী জাল দ্বারা আহরিত হয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য চিংড়ি প্রজাতি হচ্ছে, - বাগদা, বাঘাতারা, ডোরাকাটা, চাগা, বাঘা চামা, হরিণা, ললিয়া এবং রুডা। উল্লেখিত চিংড়ি প্রজাতির মধ্যে বাগদা চিংড়ির মূল্য স্থানীয় ও আর্ন্তজাতিক বাজারে বেশী থাকায় এর বাণিজ্যিক আহরণে সংশ্লিষ্ট সকলের আগ্রহ বেশী। তবে মোট চিংড়ি উৎপাদনের সর্বাধিক (পরিমাণ শতকরা ৬৫ ভাগ) অবদান রাখে হরিণা চিংড়ি।

১.২ তলদেশীয় (Demersal) মাছ

দেশের সামুদ্রিক জলসীমায় আহরিত মৎস্য প্রজাতির মধ্যে অধিকাংশই তলদেশীয় মাছ। প্রধান আহরিত তলদেশীয় মৎস্য প্রজাতি হচ্ছে, ফলি চান্দা, রুপচান্দা, সাদা দাতিনা, রাঙ্গা চইক্যা, লাউখ্যা, ছুরি, লাল পোয়া, কামিলা এবং কোরাল ইত্যাদি।

১.৩ উপরিস্তরের (Pelagic) মাছ

দেশের সামুদ্রিক জল-সীমায় উপরিস্তরের সামুদ্রিক মৎস্যের উপর এখনও কোনো ব্যাপক জরীপ পরিচালিত হয়নি। তবে বিভিন্ন সময়ে তলদেশীয় মাছ ও চিংড়ি সম্পদ জরিপ কালে এবং বানিজ্যিক ট্রল জালে বাই-ক্যাচ হিসাবে যে'সব উপরিস্তরের সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায়, সেগুলি হচ্ছে, - চার প্রজাতির ম্যাকরাল জাতীয় মাছের মধ্যে প্রধান প্রজাতি সমূহ, যেমন - চাপাকড়ি, মাইট্র্যা ও চম্পা, দশ প্রজাতির টুনা মাছের মধ্যে প্রধান প্রজাতিগুলি যেমন বম মাইট্র্যা ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে চার প্রজাতির সারডিন, আট প্রজাতির ক্লুপিডস এবং তের প্রজাতির হাংগর এবং তের প্রজাতির ক্যারাঞ্জিড।

১.৪ অপ্রচলিত মৎস্য সম্পদ

অন্যান্য অনেক প্রজাতির মৎস্য রয়েছে যা' অপ্রচলিত, যেমন - লবষ্টার (Lobster), শিরোপদী (Cephalopod), কাঁকড়া (Crab), কস্তুরা (Oyster), ঝিনুক (Shellfish/Mussel), সামুদ্রিক শসা (Sea cucumber), শৈবাল (Sea weed) ইত্যাদি। এ' গুলি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে এবং

এর মধ্যে আবার কিছু প্রাণী রয়েছে যেগুলি দেশের অমুসলিম সম্প্রদায় এবং উপজাতিদের জন্য আমিষ জাতীয় খাদ্যের চাহিদা মিটাতে পারে, যেমন- কাঁকড়া, ঝিনুক ইত্যাদি।

২. জরীপের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

দেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মাছ ও চিংড়ি সম্পদের ক্ষেত্র, প্রাচুর্যতা, বিস্তৃতি ও মজুদ সর্ম্পকে তথ্যানুসন্ধানের জন্য ১৯৫৮ ইং সাল থেকে আজ পর্যন্ত আর্ন্তজাতিক, দ্বিপাক্ষিক এবং জাতীয় পর্যায়ে অনেকগুলো জরীপ পরিচালিত হয়। এ'গুলোর অধিকাংশ প্রতিবেদনেই এই এলাকাকে একটি উর্বর মৎস্য ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। তবে বিস্তারিত মজুদ ও সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণযোগ্য ফলন (MSY) নিরুপন কারী জরীপের সংখ্যা মাত্র কয়েকটি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য জরিপগুলোর ফলাফল নিম্নে বর্ণিত হলো:

২.১ তলদেশীয় মাছ সংক্রান্ত জরীপ

ওয়েষ্ট (১৯৭৩) তলদেশীয় মাছের মজুদ (Standing Stock) ২,৬৪,০০০ - ৩,৭৩,০০০ মেট্রিক টন ও সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণযোগ্য ফলণ (MSY) ১,৭৫,০০০ মেট্রিক টন নিরুপন করেন ।

১৯৭৮-৭৯ সালে নরওয়ের গবেষণা জাহাজ ডঃ ফ্রিডজ্বফ নানসেন কর্তৃক সংগ্রহীত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সীথ্রে (১৯৮১) তলদেশীয় মাছের মজুদ ১,৬০,০০০ মেট্রিক টন ও সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণযোগ্য ফলণ ১,০০,০০০ মেট্রিক টন নিরুপন করেন।

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন সংস্থা ও ব্যক্তি মালিকানাধীন ট্রলারবহর থেকে সংগৃহীত উপাত্তের উপর ভিত্তি করে ১৯৮২ সনে পেন তলদেশীয় মাছের মজুদ ৩৯,২০০ - ৫৪,৯০০ মেট্রিক টন ও সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণযোগ্য ফলন ১০,০০০ -১৪,০০০ মেট্রিক টন নির্ণয় করেন।

১৯৮১-৮৩ সালে গবেষণা জাহাজ অনুসন্ধানী কর্তৃক সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে খান ও অন্যান্য (১৯৮৩) তলদেশীয় মাছের মজুদ ১,৫২,০০০ মেট্রিক টন ও সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণযোগ্য ফলন ৪০,০০০ - ৫৫,০০০ মেট্রিক টন নির্ণয় করেন।

১৯৮৪-৮৬ সালে গবেষণা জাহাজ অনুসন্ধানীর মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে ল্যাম্বুফ (১৯৮৭) তলদেশীয় মাছের মজুদ ১০-১০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত ১,৫৭,০০০ মেট্রিক টন ও ১০-২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত ১,৮৮,০০০ মেট্রিক টন এবং সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণযোগ্য ফলন ৪৭,৫০০-৮৮,৫০০ মেট্রিক টন নিরুপন করেন।

উল্লেখিত জরীপগুলির মধ্যে তিনটি জরীপের ফলাফলে যথেষ্ট মিল রয়েছে, যেমন- ১৯৭৮-৭৯ সালে গবেষণা জাহাজ ডঃ ফ্রিডজ্বফ নানসেনের জরীপে ১,৬০,০০০ মেট্রিক টন, ১৯৮১-৮৩ সালে গবেষণা জাহাজ অনুসন্ধানীর জরীপে ১,৫২,০০০ মেট্রিক টন এবং একই জাহাজের ১৯৮৪-৮৬ সালের (জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার পরিচালনায়) জরীপে ১,৫৭,০০০ মেট্রিক টন তলদেশীয় মাছের মজুদ নিরুপন করা হয়েছে। এই জরীপগুলির ৩টি কাছাকাছি ফলাফলের গড়ের ভিত্তিতে তলদেশীয় মাছের মজুদ দাড়ায় ১,৫৬,০০০ মেট্রিক টন। তবে ল্যাম্বুফ (১৯৮৭) কর্তৃক নিরুপিত সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণযোগ্য ফলন ৪৭,৫০০-৮৮,৫০০ মেট্রিক টন নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

২.২ চিংড়ি সংক্রান্ত জরীপ

অদ্যাবধি সামুদ্রিক চিংড়ি সম্পদের মজুদের উপর যে সকল জরীপ প্রতিবেদনের ফলাফল পাওয়া যায় তাতে মজুদ নিরুপনে ব্যাপক পার্থক্য (১০০০-১১,০০০ মেট্রিক টন) পরিলক্ষিত হয়।

১৯৬৮-৭১ ইং সালে সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে ওয়েষ্ট (১৯৭৩) চিংড়ির মজুদ (Standing stock) ১১,০০০ মেট্রিক টন ও সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণযোগ্য ফলন (MSY) ৯,০০০ মেট্রিক টন নিরুপন করেন।

১৯৭৬-৭৭ সালে "মিতা-জাভা" জরীপের মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে রশিদ (১৯৮৩) চিংড়ির মজুদ ২০০০-৪০০০ মেট্রিক টন নির্ণয় করেন।

বানিজ্যিক ট্রলার বহর থেকে সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে পেন (১৯৮৩) চিংড়ির মজুদ ২,০০০-৪,০০০ মেট্রিক টন ও সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণযোগ্য ফলন ২,০০০-৪,০০০ মেট্রিক টন নির্ণয় করেন।

গবেষণা জাহাজ অনুসন্ধানী কর্তৃক সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে হোয়াইট ও খান (১৯৮৫) চিংড়ির মজুদ ৩,০০০-৩,৬০০ মেট্রিক টন নির্ণয় করেন। ভেঙ্গালিন্স

(১৯৮৬) চিংড়ির মজুদ ১,৫৫০ মেট্রিক টন ও সর্বোচ্চ আহরণযোগ্য ফলন ৪০৬০ মেট্রিক টন নির্ণয় করেন।

পেন (১৯৮৩), রশিদ (১৯৮৩) এবং হোয়াইট ও খান (১৯৮৫) কর্তৃক নিরুপিত চিংড়ি মজুদের পরিমাণে সাদৃশ্য থাকায় উক্ত তিনটি ফলাফলের গড়ের ভিত্তিতে সামুদ্রিক চিংড়ির মজুদ দাঁড়ায় ৩১০০ মেট্রিক টন এবং এর ভিত্তিতে সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণ যোগ্য ফলন ৭,০০০-৮,০০০ মেট্রিক টন নির্ণয় করা হয় (খান ও অন্যান্য ১৯৮৯)।

২.৩ উপরিস্তরের মাছ সংক্রান্ত জরীপ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সামুদ্রিক উপরিস্তরের মৎস্য সম্পদের মজুদের পরিমাণ সর্ম্পকে অদ্যাবধি তেমন কোন নির্ভরযোগ্য জরীপ কার্য পরিচালিত হয়নি। তবে ১৯৭৮-৭৯ সালে ডঃ ফ্রিড্জ্ফ নানসেন জাহাজের জরীপে একোয়ষ্টিক পদ্ধতির মাধ্যমে সমুদ্রের উপরিস্তরের মাছের মজুদের পরিমাণ ৬০,০০০-১,২০,০০০ টন নিরুপণ করা হয়। কিন্তু উক্ত পদ্ধতির ব্যবহারিক সীমাবদ্ধতার কারণে উল্লেখিত মজুদের পরিমান নিম্ন-নিরুপিত (Under-estimated) হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বলে ধারনা করা হয়। ইতিপূর্বে তলদেশীয় মাছের উপর যে সমস্ত জরীপ কার্য সম্পন্ন হয়েছে, বিশেষ করে বাংলাদেশ-থাই যৌথ জরীপে বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় উপরিস্তরের মাছের মধ্যে যেমন টুনা ও টুনা জাতীয় মাছের প্রাচুর্যতা বিদ্যমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩। ধারাবাহিক জরীপ ও গবেষণার গুরুত্ব

মৎস্য সম্পদ তৈল বা কয়লার মত খনিজ পদার্থ নয়। ইহা একটি জীবন্ত ও সদা পরিবর্তনশীল নবায়নযোগ্য সম্পদ। তাই, প্রতিটি প্রজন্ম থেকে এমন হারে সম্পদ আহরণ করতে হবে, যাতে করে পরবর্তী প্রজন্মের অস্তিত্ব ও বৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। এই নিরিখে প্রতিটি প্রজন্মের ক্ষেত্রেই মজুদ ও সর্বোচ্চ কি পরিমাণ সম্পদ আহরণ করা যায়, তা নিরুপণ করার জন্য নিয়মিত জরিপ ও গবেষণা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় অপরিকল্পিত আহরণ প্রক্রিয়ার ফলে সাগর মৎস্য শুন্য হয়ে যেতে পারে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, অনিয়মিত কিংবা খন্ডকালীন বা আংশিক জরীপ পরিচালনা করে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদের সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়।

আমাদের দেশে ১৯৭৮ সাল হতে গভীর সমুদ্রে বাণিজ্যিকভাবে চিংড়ি আহরণের সূচনা হওয়ার পর পরই স্থানীয়ভাবে তা প্রসার লাভ করে এবং নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়ে এমন পর্যায়ে পৌছায় যে, ১৯৮৪-৮৫ সালে প্রায় ২৫০টি ট্রলারকে মৎস্য শিকারের অনুমোদন দেয়া হয়। এর মধ্যে প্রায় ৯০টি যথারীতি মৎস্য শিকারে সক্রিয় ছিল ও বাকীগুলি সংস্থাপনের জন্য অপেক্ষমান ছিল। এমতাবস্থায়, মৎস্য অধিদপ্তরের গবেষণা জাহাজ অনুসন্ধানী দ্বারা পরিচালিত জরীপের মাধ্যমে নিরুপিত ফলাফলে মজুদের সাথে ট্রলার বহর কর্তৃক আহরিত মৎস্য সম্পদের অতিরিক্ত গরমিল পরিলক্ষিত হলে মৎস্য শিল্পের ভবিষ্যৎ সর্ম্পকে সংশ্লিষ্ট মহলের উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। এতদসংক্রান্ত সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তীতে ট্রলার সংখ্যা হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে ভারসাম্যতার দিকে ফিরে আসে। অপরিকল্পিতভাবে মৎস্য আহরণের ফলে এরকম ভয়াবহতা বিশ্বের বহু দেশে ঘটেছে। রাতারাতি অর্থবান হবার নেশায় পৃথিবীর বিভিন্ন সাগরকে এমনভাবে উজাড় করে দেয়া হয়েছে যে, পরবর্তী বৎসরে এই সব অঞ্চলে মাছের অপ্রতুলতার কারণে ট্রলিং কার্যক্রম আর লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। তাই নিয়মিত জরীপের মাধ্যমে মজুদ ও আহরণের পরিমাণ নির্ধারণ করতঃ পরিমিতভাবে সম্পদের আহরণ করা দেশ ও জাতির স্বার্থে সমীচীন।

সাগরে বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্য ও চিংড়ি আহরণের জন্য বিভিন্ন ধরণের জাল ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। দেখা যায়, কোন একটি জালে কোন সময় বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও চিংড়ি ধরা পড়ে; অন্য দিকে কোন একটি প্রজাতি বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন গভীরতায় বিভিন্ন জালে ধরা পড়ে। এ'সব কারণে সার্বিভাবে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জটিল। যেহেতু বিভিন্ন প্রজাতির সমন্বয়ে একটি ষ্টক, তাই প্রতিটি প্রজাতি কোন্ বয়সে কোন্ জালে কি হারে ধৃত হচ্ছে তার সঠিক তথ্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে চিংড়ি পোনা জাল হ'তে শুরু করে ট্রলজাল পর্যন্ত সব ধরণের জালকে জরীপের আওতায় আনতে হবে। কেননা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে উপকূলে এবং গভীর সমুদ্রে ব্যবহৃত সকল ধরণের জালের সমষ্টিগত ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। আর এজন্য প্রয়োজন মৎস্য সম্পদের উপর নিয়মিত এবং নিরবিচ্ছিন্ন জরীপ ও গবেষণা।

বাংলাদেশের মৎস্য বিষয়ক তথ্যাদি

রাখাল চন্দ্র কংশ বনিক
নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ূন
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

বাংলাদেশের আর্থ- সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে তথা জিডিপিতে মৎস্য সেক্টরের অবদান প্রায় ৫.৩% যা কৃষি খাতে উৎপাদিত মোট মূল্যের প্রায় ১৮% (১৯৯৭-৯৮)। আমাদের দৈনন্দিন প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৬০ ভাগ যোগান দিচ্ছে মাছ। এ সেক্টরের সাথে সার্বক্ষণিকভাবে ১২ লক্ষ এবং খন্ডকালীনভাবে ১ কোটি ২০ লক্ষ জনগোষ্ঠি সম্পৃক্ত থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করার পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, দেশের জন্য মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, পরিবেশের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি সহ বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুত দারিদ্র বিমোচন কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। দেহের প্রয়োজন মেটাতে যেখানে দৈনিক মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ কমপক্ষে ৩৫ গ্রাম হওয়া দরকার সেখানে বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ২৫ গ্রাম। এদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশ এবং অধিক কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য সেক্টরের প্রবৃদ্ধি অধিক হারে বৃদ্ধির অপার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দারিদ্র বিমোচনে এ সেক্টরটি যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট।

১। বাংলাদেশের জল সম্পদ এবং মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক ক্রমধারার পরিসংখ্যান

১৯৮০ সালের পূর্বে মৎস্য অধিদপ্তরে কোন নির্ভরযোগ্য মৎস্য পরিসংখ্যান ছিল না। ১৯৮০-৮১ সালে FAO/UNDP এর আর্থিক সহযোগিতায় মৎস্য সম্পদ জরিপ পদ্ধতি প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার জলাশয়ের কাঠামো জরিপ করা হয় এবং জলাশয়ের আয়তন নির্ণয় করা হয়। বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এবং এর উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণে সঠিক ও বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন জলাশয়ের কি পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ঘটেছে তা পরিমাপে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক যথা শীঘ্র পুনরায় কাঠামো জরিপ সম্পাদন করা অত্যাবশ্যক। মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক ক্রমধারার পরিসংখ্যান সারণি-ক এবং পুকুর হতে মৎস্য উৎপাদন ক্রমধারার পরিসংখ্যান সারণি-খ তে দেখানো হলো।

২। মাছ/চিংড়ি ও অন্যান্য মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানী

বর্তমানে বাংলাদেশে ১২৩ টি মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা আছে যার মধ্যে মাত্র ৫৯টি সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত এবং সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। প্রক্রিয়াজাতকৃত মৎস্য পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাখার জন্য হেসাপ (HACCP) পদ্ধতি সঠিক ভাবে অনুসারিত না হওয়ায় ই, ইউ (EU) দেশসমূহ কর্তৃক ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ হতে সে সকল দেশে মৎস্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ই, ইউ কর্তৃক বাংলাদেশের মৎস্যজাত পণ্য গ্রহণীয় পর্যায়ে নেয়ার জন্য সরকার তাৎক্ষণিকভাবে কারখানাসমূহ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি কারখানায় সর্বোচ্চ ৪০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করে। ইতিমধ্যে ২৭টি কারখানা তাদের কর্তৃক প্রক্রিয়াজাতকরণকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য ই, ইউ, ভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানির জন্য অনুমোদন লাভ করেছে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মূল্যায়নপূর্বক নিষেধাজ্ঞা পরিহারের জন্য আরো একটি তালিকা বর্তমানে বিবেচনাধীন আছে। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্বেও ১৯৯৭-৯৮ সালের রপ্তানী বাণিজ্যের শতকরা প্রায় ৬ ভাগ (সারণি - গ) আয় হয়েছে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তাণী করে।

বাণিজ্যের শতকরা প্রায় ৬ ভাগ (সারণি - গ) আয় হয়েছে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তাণী করে।

৩। প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম উপায়ে রেণু প্রাপ্তি

মনুষ্য এবং প্রকৃতিগতভাবে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে বাংলাদেশে প্রাকৃতিকভাবে মৎস্য রেণু প্রাপ্তি সবসময়ই অনিশ্চিত। বিগত বছরগুলোতে মৎস্য চাষ কার্যক্রম অতি দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। মৎস্য চাষ অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হওয়ায় মৎস্য রেণু উৎপাদন দ্রুত প্রসারের সাথে সংগতি রেখে দেশে সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার/হ্যাচারি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ব্যাপক সংখ্যক বেসরকারী হ্যাচারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিগত ১৯৯৭-৯৮ সালে সারা দেশে প্রায় ৬৫০ টি বেসরকারী হ্যাচারির মাধ্যমে প্রায় ১,১৪,৪০০ রেণু উৎপাদিত হয় যা বিভিন্ন উৎস্য হতে উৎপাদিত মোট রেণুর শতকরা প্রায় ৯৫.০০ ভাগ (সারণি - ঘ)।

৪। মৎস্য সেক্টরে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মসূচী

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, পুষ্টির যোগান, রপ্তানি বাণিজ্যের ঘাটতি পূরণ, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা সহ দারিদ্র্য বিমোচনে মৎস্য সেক্টরের গুরুত্ব বিবেচনায় পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে এ সেক্টরে সরকারি খাতে ৫৮৬.১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উক্ত মেয়াদের শেষ বছরে অর্থাৎ ২০০১-২০০২ সালে মৎস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২০.৭৫ লক্ষ মেঃ টন ধার্য করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে ১৯৯৮-৯৯ সালের এডিপিতে মৎস্য সেক্টরে মোট ৩০ টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৮৫.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ সালের সংশোধিত এডিপিতে মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনে ১৪ টি বিনিয়োগ (১২ টি চলমান + ২ টি নতুন) এবং ৮টি কারিগরি সহায়তা (৫ টি চলমান + ৩টি নতুন) প্রকল্পের অনুকূলে ৫৩.৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় (সারণি - ঙ)। ১৯৯৯-২০০০ সালের এডিপিতে মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনে চলতি এবং নতুন প্রকল্প মিলিয়ে ১৭ টি বিনিয়োগ এবং ৪টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বছর হতে মৎস্য সেক্টরের অধীন বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের বিপরীতে সংশোধিত এডিপি-তে বরাদ্দকৃত অর্থ এবং ব্যয় সারণি-চ তে দেখানো হয়েছে।

পাংগাস মাছের চাষ

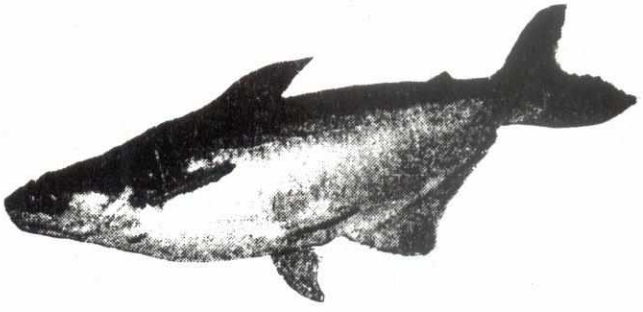

☞ আপনি কি থাই পাংগাস ও রেণু চাষী(?)
☞ আপনার কোন্ প্রকার রেণু ও পোনার এখনই প্রয়োজন(?)
☞ আপনি কি মৎস্য চাষে সফলতা চান(?)
তাহলে আর কোন অপেক্ষা নয়
সত্বর যোগাযোগ করুন

আল-মদিনা মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র

মাথিয়ারা তেমুহনী বাজার, ফেনী-৩৯০০
ফোন ঃ ৭৩৬৬৫ (০৩৩১)
বিঃদ্রঃ ফেনী মহিপাল থেকে ফেনী-মাইজদী সড়কে ২ কিঃ মিঃ পশ্চিমে তেমুহনী বাজার।

সারণি -ক ঃ বাংলাদেশের জলসম্পদ এবং মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক ক্রমধারার পরিসংখ্যান।

উৎপাদন ঃ '০০০মেঃ টন

পরিকল্পনা মেয়াদ	বছর	অভ্যন্তরীণ জলসম্পদ		মোট	সামুদ্রিক জলসম্পদ		মোট	সর্বমোট উৎপাদন	গড় প্রবৃদ্ধির হার (%)
		মুক্ত জলাশয় (৪,০৪৭,৩১৬ হেঃ)	বদ্ধ জলাশয় (২৯২,৩৭৮ হেক্টর)		ট্রলিং শিল্প	আর্টিশনাল ফিশারিজ			
		উৎপাদন	উৎপাদন						
২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদ (১৯৮০-৮৫)	১৯৮০-৮১	-	-	৫২৫	-	-	১২৫	৬৫০	৩.৭০
	১৯৮১-৮২	-	-	৫৫৬	-	-	১৩০	৬৮৬	
	১৯৮২-৮৩	-	-	৫৮৩	-	-	১৪১	৭২৪	
	১৯৮৩-৮৪	৪৭২	১১৭	৫৮৯	১৪	১৫০	১৬৪	৭৫৩	
	১৯৮৪-৮৫	৪৬৩	১২৪	৫৮৭	১২	১৭৫	১৮৭	৭৭৪	
৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদ (১৯৮৫-৯০)	১৯৮৫-৮৬	৪৪২	১৪৫	৫৮৭	১২	১৯৫	২০৭	৭৯৪	২.১৩
	১৯৮৬-৮৭	৪৩১	১৬৬	৫৯৭	১২	২০৫	২১৭	৮১৪	
	১৯৮৭-৮৮	৪২৪	১৭৬	৬০০	১০	২১৭	২২৭	৮২৭	
	১৯৮৮-৮৯	৪২৪	১৮৪	৬০৮	১০	২২৩	২৩৩	৮৪১	
	১৯৮৯-৯০	৪২৪	১৯৩	৬১৭	১১	২২৮	২৩৯	৮৫৬	
৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদ (১৯৯০-৯৫)	১৯৯০-৯১	৪৪৩	২১১	৬৫৪	০৯	২৩৩	২৪২	৮৯৬	৬.৫১
	১৯৯১-৯২	৪৭৯	২২৭	৭০৬	১০	২৩৬	২৪৬	৯৫২	
	১৯৯২-৯৩	৫৩২	২৩৮	৭৭০	১২	২৩৮	২৫০	১০২০	
	১৯৯৩-৯৪	৫৭৩	২৬৪	৮৩৭	১২	২৪১	২৫৩	১০৯০	
	১৯৯৪-৯৫	৫৯১	৩১৭	৯০৮	১২	২৫৩	২৬৫	১১৭৩	
১৯৯৫-৯৭ ইং মেয়াদ	১৯৯৫-৯৬	৬০৯	৩৭৯	৯৮৮	১২	২৫৮	২৭০	১২৫৮	৫.৫৮
	১৯৯৬-৯৭	৬০০	৪৩২	১০৩২	১৪	২৬১	২৭৫	১৩০৭	
৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদ (১৯৯৭-০২ প্রজেক্টেড)	১৯৯৭-৯৮	৬২০	৫৭০	১১৯০	৩৪	২৬৮	৩০২	১৪৯২	৮.৭০
	১৯৯৮-৯৯	৬৩৯	৬৬৮	১৩০৭	৩৯	২৭৬	৩১৫	১৬২২	
	১৯৯৯-০০	৬৫৮	৭৭৮	১৪৩৬	৪৫	২৮৩	৩২৮	১৭৬৪	
	২০০০-০১	-	-	-	-	-	-	-	

উৎস ঃ ফিস ক্যাচ স্টেটিস্টিকস অব বাংলাদেশ/ফিসারি ষ্টেটিসটিকেল ইয়ার বুক অব বাংলাদেশ; এফ, আর, এস, এস, মৎস্য অধিদপ্তর।
বিবিএস- স্টেটিস্টিকেল ইয়ার বুক অব বাংলাদেশ।

সারণি - খ ঃ পুকুর হতে মৎস্য উৎপাদন ক্রমধারার পরিসংখ্যান

পুকুরের বৈশিষ্ট্য	জলায়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (মেট্রিক টন)					(১৯৯৩-৯৪/১৯৯৭-৯৮) গড় প্রবৃদ্ধির হার (%)
		১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	
ক) চাষকৃত পুকুর	৭৬৬৪৩	১৬৭৯৭৩	২১১৫৪৪	২৪২৯০৫	২৬৯৮৭৫	৩৩০৯৭৫	১৮.৬২
খ) চাষযোগ্য পুকুর	৪৪৮১৪	৪১৬৩১	৪২৬১৫	৫৩১৯২	৬৫৩০৪	৭২৮৫৬	১৫.২৮
গ) পতিত/হাঁজামজা পুকুর	২৫৪৩৫	১২৯৩২	১৩১৩২	১১৮৭৭	১৪৮২২	১২৪৮৯	০.৫০
মোট ঃ	১৪৬৮৯০	২২২৫৪২	২৬৭২৮২	৩০৭৯৭৪	৩৫০১০১	৪১৬৩২০	১৬.৯৮

সারণি- গ ঃ বছরওয়ারি মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য সামগ্রী রপ্তানীর মাধ্যমে আয় সংক্রান্ত উপাত্ত

পরিমাণ ঃ মেট্রিক টন
মূল্য ঃ কোটি টাকা

রপ্তানী সামগ্রী	১৯৯৪-৯৫		১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭		১৯৯৭-৯৮		১৯৯৮-৯৯ (এপ্রিল '৯৯ পর্যন্ত)	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমান	মূল্য
১। হিমায়িত চিংড়ি	২৬২৭৭	১০৪৫.৬৭	২৫২২৫	১১০৬.৩৯	২৫৭৪২	১১৮৮.৯১	১৮৬৩০	১১৮১.৪৮	১৫৬০৩	৮৯৯.৮৯
২। হিমায়িত মাছ	৯২৬৭	১৮০.২৬	৮৮২৭	১৭৬.৬২	৮৭৫৪	১৭৬.৭৪	৮৮৩৬	১৫১.৬৬	৫৮৬২	১৪০.৫৭
৩। শুটকি মাছ	৫২১	৮.৩৯	১৮২	৩.০৫	৪২৭	৭.৯২	২৩৩	৩.১১	১৩৭	২.২০
৪। লবণাক্ত মাছ	৬৪৯	১৫.৩৫	৪৩৬	১১.৪৭	৫৬১	১৩.৮১	১১০৬	২৬.৪৩	১১৭২	৩৫.৩১
৫। কচ্ছপ/কাছিম/ কাঁকড়া	৪৭৬০	৪০.৬৭	৪২০৩	৩৯.২০	৫৯৫২	৬১.৪৮	১১৯৮	১৪.৩৪	৪৭৮	৬.২৮
৬। হাঙ্গরের পাখনা ও পোটকা	২১২	১৬.৬০	৫৬	৪.২১	১১৩	৮.৫৫	১৫৫	১০.৭৯	১২২	১২.৬২
মোট রপ্তানী =	৪১৬৮৬	১৩০৬.৯৪	৩৮৯২৯	১৩৪০.৯৪	৪১৫৪৯	১৪৫৭.৪১	৩০১৫৮	১৩৮৭.৮১	২৩৩৬৪	১,০৯৬.৮৭
মোট রপ্তানি আয়ের (%) হার =		৯.৩৮	৮.৪৪		৭.৭৫		৫.৯৩		৫.৩২	

উৎস ঃ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো।

সারণি ঘ ঃ প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপায়ে প্রাপ্ত রেণুর পরিসংখ্যান।

পরিমাণ ঃ কেজি

উৎস	বছর				
	১৯৯৪	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮
ক) প্রাকৃতিক উৎস	৫৮৭২	৯১৪৪	২৩৯৯	২৮২৪	২৮৮৫
খ) কৃত্রিম উৎস (হ্যাচারিতে উৎপাদিত)	-	-	-	-	-
১। সরকারী হ্যাচারি/মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার	২৮৫২	৩০৮২	৩৪৩৮	৩৬৯১	৩৬০০
২। মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট	৩২৮	১৯০	১৭৮	১৯৭	১০০
৩। ব্যক্তি মালিকানাধীন হ্যাচারি (বেসরকারি)	৬৯৩৫৬	৯৭২০৫	১১২৫৯৫	১৩৭০৪২	১১৪৪০০

নোট ঃ ৪-৫ দিন বয়সের ১ কেজি রেণু হতে প্রায় ৪.০ (চার) লক্ষ ধানী পোনা পাওয়া যায়।

উৎস ঃ ফিসারি ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ার বুক অব বাংলাদেশ, মৎস্য অধিদপ্তর।

"অধিক হারে মাছ চাষ-অর্থ দেবে বারো মাস"

মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,

ইন্টারন্যাশনাল এঞ্জেল এসোসিয়েশন (জাপান)।

দেশের মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ও বেকারদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে জাপানের আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল এঞ্জেল এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হলো -

রেনু-পোনা উৎপাদন - এখানে শুধু মাত্র উন্নত ও উপযুক্ত ব্রুড মাছ হইতে রুই, কাতলা, মৃগেল,পাংগাস, গলদা চিংড়ি ও অন্যান্য কার্প জাতীয় মাছের রেনু ও পোনা উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়।

প্রশিক্ষণ - বেকার যুবকদের মাসিক ভাতা প্রদান সহ ছয় মাসের মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, আগ্রহী মাছ চাষীগণকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, লিফলেট ও বই সরবরাহ করা হয়।

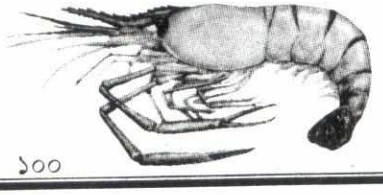

যোগাযোগ ঃ

প্রকল্প ঃ গ্রাম - শরীফপুর, পো ঃ রাজাপুর, সিন্দুরপুর ইউনিয়ন, থানা - দাগনভূঁইয়া, জেলা- ফেণী। ফোন ঃ ০৩৩২৩-৮০০৩।

ঢাকা অফিস ঃ বাড়ি - ৪৬/এ, রোড - ২৩, ব্লক - বি, বনানী, ঢাকা-১২১৩। ফোন ঃ ৬০৩৯২১, ৯৩৫২৪৩৭, ৯৩৩৭৭৯১, ফ্যাক্স-৮৮৮৫৫৬, E-mail : angeldhk@agni.com

সারণি- ঙ ঃ মৎস্য অধিদপ্তরাধীন ১৯৯৮-৯৯ সালের এডিপিতে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (দাতা সংস্থা)	অনুমোদন পর্যায়	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয় (১৯৯৮-৯৯ সালের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ)
সংস্থা ঃ ক)	মৎস্য অধিদপ্তর বিনিয়োগ প্রকল্প চলতি প্রকল্প ঃ			
১।	মৎস্য সম্প্রসারণ প্রকল্প, ময়মনসিংহ (২য় ধাপ-ডানিডা)	অনুঃ	১৯৯২-২০০০	৩৬৭০.০০ (৫০৮.০০)
২।	পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (ডানিডা)	অনুঃ	১৯৯৩-২০০০	২৪২৩.৩৫ (৩২২.০০)
৩।	বৃহত্তর নোয়াখালী জেলায় মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (ডানিডা)	অনুঃ	১৯৯৩-২০০০	৩৭৮০.০০ (২৫৬.০০)
৪।	থানা পর্যায়ে মৎস্য সম্প্রসারণ প্রকল্প (জিওবি)	অনুঃ	১৯৯৪-২০০০	৭১২.০০ (১৫০.০০)
৫।	খাদ্য সহায়তায় সমন্বিত মৎস্যচাষ প্রকল্প (ইউরোপীয় ইউনিয়ন)	অনুঃ	১৯৯৪-১৯৯৯	৬৯১১.০০ (৯০০.০০)
৬।	চিংড়ি অবতরণ কেন্দ্র এবং সার্ভিস সেন্টার স্থাপন (জিওবি)	অনুঃ	১৯৯৫-১৯৯৯	১৬৪৫.১৫ (২৭০.০০)
৭।	উপকূলীয় সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প (জিওবি)	অনুঃ	১৯৯৭-২০০২	৭০০.০০ (১৫০.০০)
৮।	উত্তর- পশ্চিম মৎস্য সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় ধাপ ডি, এফ, আই, ডি)	অনুঃ	১৯৯৫-২০০০	২১২২.৭৩ (৪৪৫.০০)
৯।	গলদা চিংড়ি হ্যাচারি উন্নয়ন ও চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সহায়তা প্রকল্প (জিওর্বি)	অনুঃ	১৯৯৭-২০০২	৫০০.০০ (-)
১০।	বাগদা চিংড়ি হ্যাচারি উন্নয়ন ও চাষ প্রযুক্তি সম্পসারণ সহায়তা প্রকল্প (জিওবি)	অনুঃ	১৯৯৭-২০০২	৭৫০.০০ (-)
১১।	জাতীয় প্যাকেজ কর্মসূচীর মাধ্যমে মৎস্যচাষ উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প (জিওবি)	অনুঃ	১৯৯৭-২০০২	১৪৭৪.০০ (৫.০০)
১২।	খাদ্য সহায়তায় মৎস্য সেক্টরে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী/জিওবি)	অনুঃ	১৯৯৭-২০০০	৪৭২২.০০ (৬০০.০০)
১৩।	নতুন প্রকল্প ঃ চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প (বিশ্ব ব্যাংক/জি,ই,এফ/ডি,এফ,আই, ডি)	অনুঃ	১৯৯৮-২০০৪	৩০০৩৫.০০ (২২.০০)
	ক) মৎস্য অধিদপ্তর অংগ	অনুঃ		২৫১৩৭.০০ (১১.০০)
	খ) পানি উন্নয়ন বোর্ড অংগ পিসিপি	অনুঃ		৪৮৯৮.০০ (১১.০০)
	গ) এলজিইডি অংগ	অনুঃ		-

	ঘ) বি, এফ, আর, আই অংগ	অনুঃ		-
১৪।	মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্প (ইফাদ)	অনুঃ	১৯৯৭-২০০৫	১০৯৩৪.০০ (১০৩০.০০)
	ক) মৎস্য অধিদপ্তর অংগ	অনুঃ		৪৩৩৬.২২ (২৪০.০০)
	খ) এল, জি, ই, ডি অংগ	অনুঃ		৬৫৯৭.৭৮ (৭৯০.০০)
	উপ মোট ঃ মৎস্য অধিদপ্তর			৭০,৩৭৯.৯৩ (৪৯৪২.০০)
খ)	কারিগরি সহায়তা কর্মসূচী চলতি প্রকল্প ঃ			
১।	কমিউনিটি বেইজড ইনল্যান্ড ওপেন ওয়াটার ফিসারিজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ফোর্ড ফাউন্ডেশন)	অনুঃ	১৯৯৫-১৯৯৯	৮৬.২৭ (২৬.০০)
২।	বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (বি, ও, বি, পি/এফ, এ, ও)	অনুঃ	১৯৯৫-১৯৯৯	১৪৭.৫৫ (১১.০০)
৩।	চিংড়ি রোগ নিরাময় ও স্বাস্থ্য সুবিধা ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এফ, এ, ও)	অনুঃ	১৯৯৬-১৯৯৯	১৩৭.৪৮ (৩১.০০)
৪।	মৎস্য প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (ডি, এফ, আই, ডি)	অনুঃ	১৯৯৭-২০০২	২৪৫৮.৫৮ (৩০২.০০)
৫।	ডেভোলাপিং এন এপ্রোপিয়েট ফিশারিজ এক্সটেনশন সিষ্টেম বেইজড অন ইভালুয়েশন অব এক্সিজিটিং অলটারনেটিভ এপ্রোল (ইকলার্ম - ইফাদ)	অনুঃ	১৯৯৭-২০০২	৩৪.০০ (২৫.০০)
	নতুন প্রকল্প ঃ			
৬।	প্রিপারেটরি ফেজ ফর ন্যাশনাল ফিসারিজ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আই, ডি, এ)	অনুঃ	১৯৯৭-১৯৯৯	১৪৪.০০ (১৮.০০)
৭।	বাংলাদেশের মৎস্য ও পশুসম্পদ খাতের বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ (এফ, এ, ও)	অনুঃ	১৯৯৮-১৯৯৯	৩৬.২৪ (৩৬.০০)
৮।	চিংড়ি চাষ উন্নতকরণ কার্যক্রম (ফ্রান্স)	অনুঃ	১৯৯৮-২০০১	৭৮১.০০ (১.০০)
	উপ মোট ঃ মৎস্য অধিদপ্তর			৩৮২৫.১২ (৪৫০.০০)
	মোট (২২টি প্রকল্প ঃ ১৪ টি বিনিয়োগ + ৮টি কারিগরী)			৭৪২০৫.০৫ (৫৩৯২.০০)

সংস্থা ঃ মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

১।	সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন প্রকল্প এলাকায় ও অন্যান্য জলাশয়ে সমন্বিত মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্প (জিওবি)	অনুঃ	১৯৯২-২০০০	৩৫৯৫.০০ (১৮০.০০)
২।	ইনটিগ্রেটেড একুয়াকালচার (ডাক উইড) প্রকল্প (ইউ, এন, সি, ডি, এফ)	অনুঃ	১৯৯৩-১৯৯৯	৬৪৫.৪৮ (২.০০)
	মোট (২ টি প্রকল্প= ১টি বিনিয়োগ + ১টি টি, এ) ঃ			৪২৪০.৪৮ (১৮২.০০)
	সংস্থা ঃ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট (এফ, আর, আই) বিনিয়োগ প্রকল্প (চলতি)			
১।	কৃষি গবেষণা ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের অধীন মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের উন্নয়ন সাধন প্রকল্প (আই, ডি, এ)	অনুঃ	১৯৯৬-২০০১	৪১৪৩.৫৫ (১১৯৮.০০)
২।	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ প্রকল্প (জিওবি)	অনুঃ	১৯৯৭-২০০২	৭৫০.০০ (৫০.০০)
৩।	কারিগরী সহায়তা প্রকল্প (চলতি) বাংলাদেশ ইলিশ মাছ গবেষণা প্রকল্প (অষ্ট্রেলিয়া)	অনুঃ	১৯৯৭-১৯৯৯	১৮১.৪৫ (৯৯.০০)
৪।	বন্যা প্লাবিত অঞ্চলে ধানক্ষেতে মাছ চাষ প্রকল্প (ইকলার্ম)	অনুঃ	১৯৯৭-২০০০	৩৮.৬০ (৩০.০০)
	মোট (৪টি প্রকল্প ঃ ২টি বিনিয়োগ + ২টি·টি, এ) ঃ			৫১১৩.৬০ (১৩৭৭.০০)
	সংস্থা ঃ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন বিনিয়োগ প্রকল্প (চলতি) ঃ			
১।	কাপ্তাই লেকে মৎস্য উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (জিওবি)	অনুঃ	১৯৯৫-২০০০	৯৯৮.০০ (১৯০.০০)
২।	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের কক্সবাজার ও পাথরঘাটা পাইকারি মৎস্য বাজার ও মৎস্য অবতরন কেন্দ্র দুইটি আধুনিকীকরণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (জিওবি)	অনুঃ	১৯৯৬-২০০০	৮২৫.০০ (২০০.০০)

৩।	ঢাকা মহানগরে কেন্দ্রীয় আধুনিক মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ ও বিপনণ সুবিধাদী স্থাপন (জিওবি)	অননুঃ	১৯৯৭-২০০১	৮৪৪৮.০০ (-)
৪।	চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ও কক্সবাজার মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপনণ কেন্দ্র দুইটির বি, এম, আর, ই, করণ (নতুন প্রকল্প, জিওবি)	অননুঃ	১৯৯৭-২০০০	৬২৫.০০ (-)
	মোট (৪টি বিনিয়োগ প্রকল্প) ঃ			১০৮৯৬.০০ (৩৯০.০০)

সারণি - চ ঃ মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে সংশোধিত এডিপিতে বছর ওয়ারী বরাদ্দ এবং ব্যয়ের অগ্রগতি (১৯৯২-৯৩/১১৯৯৮-৯৯)

(লক্ষ টাকা)

আর্থিক বছর	সংশোধিত বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)
১৯৯২-৯৩	৭৭৫৬.০০	৫২৫০.০০	৬৭.৬৯
১৯৯৩-৯৪	৮১৬৯.০০	৬৬৮১.৮১	৮১.৮০
১৯৯৪-৯৫	৯২৫৮.০০	৭১২০.৬২	৭৭.০০
১৯৯৫-৯৬	৭৯৬৯.০০	৫৮৯৫.০০	৭৪.০০
১৯৯৬-৯৭	৪৯৭২.০০	৪৯৬৫.০০	৯৯.৮৫
১৯৯৭-৯৮	৩৫৪৫.০০	৩৪৬০.০০	৯৭.৬০
১৯৯৮-৯৯	৫৩৯২.০০	-	-

প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর

নাম ও পদবী	ফোন নং
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়	
* জনাব আ স ম আবদুর রব মাননীয় মন্ত্রী	৮৬২৪৩০, ৮৬১৫৫৫ (অ) ৮৭২২১১ (বা)
* জনাব মো: মুনীর চৌধুরী মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব	৮৬৩৯৩০ (অ) ৮৬২০৪৪ (বা)
* ডা. আবু মনসুর সাখাওয়াত হোসেন মাননীয় মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	৮৬৪৭০২ (অ) ৮৩৩১৬১ (বা)
* জনাব আমিনুল ইসলাম সিনিয়র তথ্য অফিসার	৮৬২৫১৬ (অ) ৯১২৪০০৪ (বা)
* জনাব আইয়ুব কাদরী সচিব	৮৬৪৭০০ (অ) ৯১২৮১৪২ (বা)
* জনাব মো: মোকাম্মেল হোসেন সচিবের একান্ত সচিব	৮৬১২৫৮ (অ) ৮২২১৬৫ (বা)
* জনাব সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া যুগ্ম-সচিব	৮৬৬২৬৩ (অ) ৮২২২৩২ (বা)
* জনাব ডি.কে চৌধুরী যুগ্ম-সচিব (মৎস্য)	৮৬১৯৭৭ (অ) ৯১২০১৯০ (বা)
* জনাব মো: হাবিবুর রহমান যুগ্ম- প্রধান	৮৬৭৯৬৯ (অ) ৮৩৯৬৫৮ (বা)
* জনাব নূরুল আমিন উপ-সচিব (মৎস্য)	৮৬৯৫৬৫ (অ) ৮৪২৯২০ (বা)
* জনাব হেমায়েত উদ্দিন, উপ-সচিব (সামুদ্রিক মৎস্য)	৮৬৯৫৬৪ (অ) ৮৬৯৩৪৪ (বা)
* জনাব মো: আসাদ উদ্দিন আহমেদ উপ-প্রধান	৮৬৯৫৬৪ (অ) ৮০৬০৫০ (বা)
* প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় সি.জি.এ ভবন, ঢাকা	৪১৭৩৩১ (অ)
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন	
* জনাব মো: আব্দুল মতিন মহাপরিচালক (চ.দা)	৯৫৬২৮৬১ (অ) ৯৩৪৮৮৯৮ (বা)
* জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান পরিচালক (সামুদ্রিক)	৯৫৬১৩৫৫ (অ) ৫০৯০০২ (বা)
* জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯৫৬৯৯৩৪ (অ) ৫০০৩২৫ (বা)
* জনাব সমরেন্দ্র নাথ চৌধুরী প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯৫৬৭২১৬ (অ) ৯১২৯৬৪২ (বা)
* পরিচালক, মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমী সাভার, ঢাকা	৯৫৬০৬৫৩ (অ)
* জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক	৯৫৬১৬৮৫ (অ) ৮১৭৮৫৭ (বা)
* জনাব মোঃ মোজাহার আলী উপ-পরিচালক (প্রশাঃ)	৯৫৬৭২১৭ (অ) ৯০০৪৬২৯ (বা)
* উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা)	৯৫৫৩০৮৮ (অ)
* জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ উপ-পরিচালক, মাননিয়ন্ত্রণ	৯৬৬৬১৭৪ (অ) ৯৩৪৯৫৫৫ (বা)
* জনাব মোঃ মমতাজ হোসেন মিঞা উপ-পরিচালক (এ্যাকুয়াকালচার)	৯৫৬১৫৯২ (অ) ৯১২১৭৩২ (বা)
* জনাব মেছবাহ উদ্দিন আহমেদ উপ-প্রধান (প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়)	৯৫৬১৪৩৭ (অ) ৮২৩৬১২ (বা)
* জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন প্রকল্প পরিচালক (সি.বি.এফ.এম)	৯৫৬০৫২৫ (অ) ৪১২৯২৪ (বা)
* ডঃ মোঃ মমতাজ উদ্দিন উপ-প্রধান	৯৫৬০৫৪৩ (অ) ৯০০৭৯০২ (বা)
* জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম আখন্দ খাদ্য সহায়তায় মৎস্য সেক্টরে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	৯৫৫৫৩৫১ (অ)
* মিসেস ফেরদৌস পারভিন প্রকল্প পরিচালক, এফ.টি.ই.পি-II	৯৫৬৯৯৫৩ (অ) ৮১৬৫২৮ (বা)
* জনাব এস.এম.জহিরুল হক প্রকল্প পরিচালক, এফসিডিআই	৯৫৫৪৮৭৫ (অ) ৯৫৬০৪৭২ (বা)
* জনাব কে.ইউ.এম শহিদুর রহমান উপ-পরিচালক, এফসিডিআই	৯৫৫৪৮৩৬ (অ)
* ডাঃ কিউ.ইউ.এম গোলাম কাদের উপ-পরিচালক, এফসিডিআই	৯৫৫৪৬৯৫ (অ)
* জনাব এ.কে. বর্ম্মন নির্বাহী প্রকৌশলী	৯৫৫৫৩৫১ (অ) ২৩২৯৫৩ (বা)
* জনাব এ.কে.এম ইয়াহিয়া নির্বাহী প্রকৌশলী	৯৫৬৭২১৮ (অ)
* জনাব মো: জাকির হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী, এফসিডিআই	৯৫৫৪৮৬৮ (অ) ৯১২১৮৯৪ (বা)
* জনাব এস.এম নাজমুল ইসলাম সহকারী পরিচালক	৯৫৫৪৭১৭ (অ) ৩২৭৩৮৭ (বা)
* জনাব ওয়াহিদুন্নবী চৌধুরী সহকারী প্রধান	৯৫৫২১৭৯ (অ) ৪১০১৭৩ (বা)
* জনাব রাখাল চন্দ্র কংস বনিক উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯৫৫৪৮৬৭ (অ)
* বেগম আনওয়ারী সহকারী পরিচালক	৯৫৬০৫২৪ (অ) ৮৩৩৩৯৩ (বা)
* জনাব মো: আমিনুল ইসলাম মৎস্য সম্প্রসারণ অফিসার	৯৫৬৯৩২০ (অ)

নাম ও পদবী	ফোন নং
* সহকারী প্রধান (চিংড়ি)	৯৫৬৭২২০ (অ)
* জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম সহকারী পরিচালক (নি.বে)	৯৫৬৬১০৪ (অ)
* বেগম আখতার জাহান চৌধুরী সহকারী পরিচালক (নি.বে)	৯৫৬৫০২১(অ) ৯৬৬২৭৯০ (বা)
* মিসেস ফরিদা বেগম সহকারী পরিচালক (নি.বে)	৯৫৬৯৯৪৩ (অ)
* জনাব রমেশ চন্দ্র মণ্ডল সহকারী পরিচালক (নি.বে)	৯৫৬৯৯৪৫ (অ)
* জনাব মোহাম্মদ আলী মিয়া মূল্যায়ন কর্মকর্তা	৯৫৬০৫১৭ (অ) ৯৩৪২০৩০ (বা)
* জনাব এ.কে.এম বদরুল হাসান উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৯৫৫৫৩৪৯ (অ)

ঢাকা মহানগরী

* প্রকল্প পরিচালক,ইফাদেপ,ধানমন্ডি	৯১২৫৫৭৮ (অ)
* গুলশান লেক / ধানমন্ডি লেক	৬০৭৫৯৮
* ফিল্ড ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট সার্ভিস গুলশান	৮৮২৫৯৮ (অ) ৮৮২৫৮৯ (অ)

বিএফডিসি, মতিঝিল,ঢাকা

* জনাব গোলাম মুতার্জা চেয়ারম্যান	৯৫৬৯০৮৬ (অ) ৮৩৬১১০ (বা)
* পরিচালক (অর্থ) পরিচালক (ক্রয় ও বিপণন)	৯৫৫৩৯৭৫ (অ) ৯৫৬৪০০৭ (অ)

বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট

* ড. এম এ মজিদ মহাপরিচালক	০৯১/৫৪৮৭৪ (অ) ৫৫৪১০ (বা)
* পরিচালক	০৯১/৫৪৪১০(অ), ৫৪২৯২ (বা)
* মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ময়মনসিংহ)	৫৪২২১(অ)
* মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কক্সবাজার)	৩৮৫৫ (অ)
* মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চাঁদপুর)	৩৪০৭ (অ)

মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ

* জনাব মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান উপ-পরিচালক, ঢাকা বিভাগ	৯৫৫০৮২২ (অ) ৯০০৭৮৭৫ (বা)
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঢাকা	৯৫৫৮৮৮৩
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মানিকগঞ্জ	০৬৫১/৩৯১
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুন্সিগঞ্জ	০৬৯১/২৫৯১
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাজীপুর	০৬৮১/২৫২০
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নরসিংদী	০৬২১/২৪১০
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ	০২/৯৭১৬৪৩০
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফরিদপুর	০৬৩১/৩২২৩
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজবাড়ি	০৬৪১/৫৮৩
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মাদারীপুর	০৬৬১/৪৪২
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোপালগঞ্জ	০৪২৩/৪৫৪
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শরীয়তপুর	০৬০১/৬৫৬
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ	০৯১/৫৪৭৪৮
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ	০৯৪১/৪৬৭
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নেত্রকোনা	০৯৫১/৪০৪
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জামালপুর	০৯৮১/৩৬২০
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শেরপুর	০৯৩১/৪৪৭
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টাঙ্গাইল	০৯২১/৩৬৭৮

মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ

* জনাব মোঃ রেজাউল করিম উপপরিচালক (চ.দা.), খুলনা	০৪১/৭৬২৬৩৫
* জনাব মো: আক্তার আলী উপ-পরিচালক, মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ, খুলনা	০৪১/৭২০৬৪৮
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খুলনা	০৪১/৭৬৩০১৬
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাতক্ষীরা	০৪৭১/৩৩১৮
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগেরহাট	০৪০১/২৪৪৫
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, যশোর	০৪২১/৫৭৫২
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঝিনাইদহ	০৪৫১/২৮৫৭
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নড়াইল	০৪৮১/৫১৩
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মাগুরা	০৬১১/২৩৪১
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া	০৭১/৫৪১৮৯
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মেহেরপুর	০৭৯১/৫৪৩
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চুয়াডাঙ্গা	০৭৬১/২৩৮৮

মৎস্য অধিদপ্তর, বরিশাল বিভাগ

* জনাব আব্দুল লতিফ খান উপ-পরিচালক, বরিশাল বিভাগ।	০৪৩১/৫২৭২৭
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বরিশাল।	০৪৩১/৫২৯১৮
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভোলা	০৪৯১/৪০৭
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঝালকাঠি	০৪৯৬/৫৫৮
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বরগুণা	০৪৪৬/৩৯৬
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পটুয়াখালী	০৪৪১/২৫০১
* জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পিরোজপুর	০৪৬১/৫৯৭

নাম ও পদবী	ফোন নং

মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ

*	জনাব মোতাহারুল হক উপ-পরিচালক (ভা.প্রা.), রাজশাহী বিভাগ।	০৭২১/৭৬০১৮৪
*	সহকারী পরিচালক, রাজশাহী বিভাগ	০৭২১/৭৬০১৮৪
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজশাহী	০৭২১/৭৬০২৪৫
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাটোর	০৭৭১/৫৯০
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নওগা	০৭৪১/২৩৮৫
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাপাইনবাবগঞ্জ	০৭৮১/৪৮২
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাবনা	০৭৩১/৬০৬৮
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিরাজগঞ্জ	০৭৫১/৭২১৩৭
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালমনিরহাট	০৫৯১/৩৪৬
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাইবান্ধা	০৫৪১/৬৪৩
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রংপুর	০৫২১/২৯২৯
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুড়িগ্রাম	০৫৮১/৫০১
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নীলফামারী	০৫৫১/৫৭০
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জয়পুরহাট	০৫৭১/২২৪
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বগুড়া	০৫১/৭৩৬৪১
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পঞ্চগড়	০৫৬২/৩৬৯
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঠাকুরগাও	০৫৬১/৩৪৬৩
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দিনাজপুর	০৫৩১/৩২৫৭

মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাগ বিভাগ

*	জনাব মোঃ হাসান মাহমুদ উপ-পরিচালক, চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা।	০৮১/৬১২৭
*	জনাব হারুন-উর রশীদ উপ-পরিচালক (সামুদ্রিক)	(০৩১) ৭২০৮২৪
*	জনাব জিকেএসএম সৈয়দ আমীন উপ-পরিচালক (মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ)	(০৩১) ৬৮২৬০৩
*	সহকারী পরিচালক, চট্টগ্রাম বিভাগ	০৮১/৬৫১১
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুমিল্লা	০৮১/৬১৫১
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বি-বাড়ীয়া	০৮৫১/৫২৫০১
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাঁদপুর	০৮৪১/৩১৬৫
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফেণী	০৩৩১/৭৪০৪৬
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নোয়াখালী	০৩২১/৫৬৮১
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লক্ষীপুর	০৩৮১/৪৬৫
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হবিগঞ্জ	০৮৩১/২৫৪০
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৌলভীবাজার	০৮৬১/৫২৮১৩
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিলেট	০৮২১/৭১৬২৪১
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সুনামগজ্ঞ	০৮৭১/৪৯০
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি	০৩৭১/৭২৬

নাম ও পদবী	ফোন নং

*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বান্দরবন	০৩৬১/৩৩৮
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি	০৩৫১/২৩২৭
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কক্সবাজার	০৩৪১/৩২৬৮
*	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম	০৩১/৭২১৭৩১

মৎস্য বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ

*	মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রায়পুর, লক্ষীপুর	(০৩৮১) ২৩৭, ২৭৮/৩৭, ৩৯
*	মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফরিদপুর	(০৬৩১) ২৪৫৭
*	কেন্দ্রিয় হ্যাচারি, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদাহ	
*	অধ্যক্ষ, মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চাঁদপুর	০৮৪১/৩৪০২
*	ময়মনসিংহ মৎস্য সম্প্রসারণ প্রকল্প মাসকান্দা, ময়মনসিংহ।	(০৯১)৫৫৩১৮ ৫৪৫২২
*	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সামুদ্রিক	(০৩১)৭২৪২০৬ ৭২৪৪৩৮

মৎস্য বীজ খামার ও হ্যাচারি সমূহ

*	সহকারী পরিচালক আইডিএ, কক্সবাজার।	(০৩৪১)৩৮৩৩
*	প্রকল্প ব্যবস্থাপক এডিবি, কক্সবাজার।	০৩৪১/৪৫৪৩
*	খামার ব্যবস্থাপক মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, কিশোরগঞ্জ।	০৯৪১/৩৪৭
*	খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, জাঙ্গালিয়া, কুমিল্লা।	০৮১/৬৫৪২
*	খামার ব্যবস্থাপক মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, কুষ্টিয়া।	০৭১/৫৩২৯৮
*	খামার ব্যবস্থাপক মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, টঙ্গী	৯৮০০২০৭
*	খামার ব্যবস্থাপক মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, পটিয়া, চট্টগ্রাম।	(০৩১)৩০৩৫২৮
*	খামার ব্যবস্থাপক মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, জামালপুর।	০৯৮১/৩৩৫২
*	থানা মৎস্য কর্মকর্তা, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা।	০৭৬১/৩১২৭
*	থানা মৎস্য কর্মকর্তা জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট।	০৫৭১/২৭৭
*	থানা মৎস্য কর্মকর্তা, ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি।	০৪৯৬/৩০৯
*	থানা মৎস্য কর্মকর্তা ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ।	০৪৫১/২৫৮১
*	থানা মৎস্য কর্মকর্তা টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল।	০৯২১/৪০৭১

নাম ও পদবী	ফোন নং
* থানা মৎস্য কর্মকর্তা দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।	০৫৩১/৩৩১৫
* থানা মৎস্য কর্মকর্তা নওগাঁ সদর, নওগাঁ।	০৭৪১/৯৩২৮
* খামার ব্যবস্থাপক নড়াইল সদর, নড়াইল।	০৪৮১/৩৮৯
* থানা মৎস্য কর্মকর্তা নরসিংদী সদর, নরসিংদী।	০৬২১/২৪৫২
* থানা মৎস্য কর্মকর্তা নেত্রকোনা সদর, নেত্রকোনা।	০৯৫১/৩৫৫
* খামার ব্যবস্থাপক নেত্রকোনা সদর, নেত্রকোনা।	০৯৫১/৫০৪
* থানা মৎস্য কর্মকর্তা নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।	০৩২১/৫৬৪৮
* থানা মৎস্য কর্মকর্তা কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।	০৩২২৩/৩৮৪
* খামার ব্যবস্থাপক চৌমুহনী, নোয়াখালী।	০৩২১/৩৯৬৭
* থানা মৎস্য কর্মকর্তা নীলফামারী সদর, নীলফামারী।	০৫৫১/৭৭০
* খামার ব্যবস্থাপক মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, পটুয়াখালী।	০৪৪১/২৪৬৯
* খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, ঈশ্বরদী, পাবনা।	০৭৩২/৪২৭
* খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, ফরিদপুর।	০৬৩১/৩৩২১
* খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, ফেনী।	০৩৩১/৭৪২৩২
* থানা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর, বগুড়া।	০৫১/৪৩৮৬
* খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, বরিশাল।	০৪৩১/৫৩১১৪
* থানা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট।	০৪০১/২৪৪৭
* থানা মৎস্য কর্মকর্তা, মংলা, বাগেরহাট।	০৪৬৫৮/৪০৭
* থানা মৎস্য কর্মকর্তা ব্রাহ্মনবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মনবাড়িয়া।	০৮৫১/৫৩০১৫
* থানা মৎস্য কর্মকর্তা ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ।	০৯১/৫২১৫০
* খামার ব্যবস্থাপক, মাসকান্দা, ময়মনসিংহ।	০৯১/৫৪৩৩৯
* খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, গৌরিপুর, ময়মনসিংহ।	০৯১/৫৫৭২৮

নাম ও পদবী	ফোন নং
* খামার ব্যবস্থাপক মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, শম্ভুগঞ্জ, ময়মনসিংহ।	০৯১/৫৪৩৩৯
* খামার ব্যবস্থাপক মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, মাগুড়া।	০৬১১/৮৫১
* থানা মৎস্য কর্মকর্তা মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ।	০৬৫১/৭৯৩
* খামার ব্যবস্থাপক মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, মৌলভীবাজার।	০৮৬১/৫২২৯২
* খামার ব্যবস্থাপক মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, যশোর।	০৪২১/৪০৪৬
* খামার ব্যবস্থাপক মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, রাজবাড়ী।	০৬৪১/৩৬৪
* থানা মৎস্য কর্মকর্তা সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।	০৪৭১/৩৮৪০
* খামার ব্যবস্থাপক মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, খাদিমনগর, সিলেট।	০৮২১/৭৬০৮৩৬

ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক সংস্থা

* বিশ্ব ব্যাংক	৮৬১০৫৬-৬৮
* এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	৮১৩২৩৫
* ডিএফআইডি	৬১০৬৪৯
* বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী	৮১৬৩৪৪-৮
* এফ এ ও	৮১৮০১৫-৮
* ইউএনডিপি	৮১৮৩০০-০৬
* ইকলার্ম	৮৭৩২৫০
* ফোর্ড ফাউন্ডেশন	৮১৬১৯৩-৫
* ইউরোপীয় কমিশন	৬০৭০১৬
* আইইউসিএন	৯৬৬৪৯৩০
* আই সি ডি ডি আর বি	৬০০১৭১-৭৮
* জাইকা	৮৮৫২৮৮
* ইউএসআইডি	৮৮৪৭০০-২২
* আইএমএফ	৯৫৫০২৭৫
* সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র	৮১৫৩৫৩
* বৃটিশ কাউন্সিল	৫০০১০৭-৯
* আইএমএফ	৯৫৫০৭৫
* ইউএনএফপিএ	৮৬৬৯৩৫
* ইউনিসেফ	৯৩৩৬৭০১-২০
* ইউএনএইচসিআর	৮৮৬৮০২-৮
* বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা	৮৬৪৬৫৩-৫
* মাস	৯৫৬৯৩২০

মৎস্য সপ্তাহ'৯৯ এর কর্মসূচী
(২৫-৩১ জুলাই ১৯৯৯)

তারিখ ও দিন	কর্মসূচী	স্থান	বাস্তবায়নে
উদ্বোধনী দিনের পূর্বের দিন ২৪/০৭/৯৯ শনিবার	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মৎস্য সপ্তাহ'৯৯ উপলক্ষ্যে সাংবাদিক সম্মেলন	ঢাকা	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর
১ম দিন ২৫/০৭/৯৯ রবিবার	উদ্বোধনী দিনে বাংলা ও ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ	ঢাকা	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর
	মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষীদের সমিতি কর্তৃক র‍্যালী অনুষ্ঠান	ঢাকা	মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষী সমিতি, তথ্য দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ'৯৯ এর উদ্বোধন মৎস্য মেলা'৯৯ পরিদর্শন এবং পোনা অবমুক্তি	ঢাকা	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর এবং বি. এফ. ডি.সি
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মৎস্য সেক্টরে গুর ত্বপূর্ন অবদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান	ঢাকা	পুরস্কার প্রদান কমিটি
২য় দিন ২৬/০৭/৯৯ সোমবার	ঢাকার ক্রিসেন্ট লেকে মাননীয় স্পীকার কর্তৃক পোনা অবমুক্ত	ঢাকা	ঢাকা বিভাগীয় ও জেলা মৎস্য দপ্তর, ঢাকা
৩য় দিন ২৭/০৭/৯৯ মঙ্গলবার	সেমিনার	ঢাকা	সেমিনার উপ-কমিটি
৪র্থ দিন ২৮/০৭/৯৯ বুধবার	সেমিনার	রামগতি, লক্ষীপুর	সেমিনার উপ-কমিটি
৫ম দিন ২৯/০৭/৯৯ বৃহসপতিবার	প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, বিশেষ অতিথি, মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডি.এন.ডি খালে পোনা মাছ অবমুক্তি	ঢাকা	ঢাকা বিভাগীয় ও জেলা মৎস্য দপ্তর, ঢাকা
৬ষ্ঠ দিন ৩০/০৭/৯৯ শুক্রবার	মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক গুলশান লেকে পোনা মাছ অবমুক্তি	ঢাকা	ঢাকা বিভাগীয় ও জেলা মৎস্য দপ্তর, ঢাকা
৭ম দিন ৩১/০৭/৯৯ শনিবার	মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক সমাপণী অনুষ্ঠান	ঢাকা	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর
১ম দিন থেকে ৭ম দিন পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে মাছ ও চিংড়ি চাষ বিষয়ে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ। শ্লোগান, ব্যানার, পোষ্টার ও ডিসপ্লে বোর্ড দিয়ে ঢাকার গুর ত্বপূর্ন সড়ক দ্বীপসমূহ সজ্জিতকরণ। প্রত্যহ রেডিও, টিভিতে সপ্তাহব্যাপী মৎস্য বিষয়ক বিশেষ প্রামাণ্য চিত্র প্রচার		ঢাকা	মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্য সপ্তাহ '৯৯ এর উদ্দেশ্য সফল হোক

চিংড়ির হ্যাচারী পরিচালনায় প্রয়োজনীয় আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত রেড-জংগল ব্রাণ্ডের আর্টিমিয়া, আর্টিমিয়া ফ্লেক, এ, পি, স্পাইরোলিনা, ইত্যাদি দ্রুত প্রাপ্তির জন্য যোগাযোগ করুন।

ঢাকা অফিস :

এগ্রোকেয়ার লি:

১২৭/২, শাহ আলীবাগ
মিরপুর-১,
ফোন : ৮০৭১১৯, ৮০১১৫৪
ফ্যাক্স : ৯০০৫৬৮৭
মোবাইল : ০১৭৫২২২৬০

কক্সবাজার অফিস :

এগ্রোকেয়ার লি:

প্রযত্নে : হোটেল সীভিউ লি:
রুম নং-২০১
ফোন : ০৩৪১-৪৪৯১,৩৫১৮